শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

আবুল বারক আলভী

ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ
১, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৭১

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ ওহিদ উল্লাহ্

ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
উদয়ন প্রেস

মুদ্রাকর ঃ
সালেহ্ আহমদ খান
শেলী প্রেস
৮/২, ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা—১

উৎসর্গ

পিতামহের স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

[১৮৮ থেকে ১৯৩ পৃষ্ঠার মধ্যে কয়েক জায়গায় 'যুগদেবতার' স্থলে ভুলক্রমে 'যুগাবতার' হয়েছে। সব যুগাবতারের স্থানে 'যুগদেবতা' পড়তে হবে।]

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় :

শ্রীরামকৃষ্ণ : শিল্পী ও নাট্যরসিক ১—১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় :

গিরিশ-সংবাদ ২০—৪৬

তৃতীয় অধ্যায় :

মঞ্চের রাজা ও মঞ্চের দেবতা ৪৭—৬২

চতুর্থ অধ্যায় :

মঞ্চপৃষ্ঠপোষক রামকৃষ্ণ : প্রতিক্রিয়া ৬৩—৮৬

পঞ্চম অধ্যায় :

রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ও রঙ্গমঞ্চ ৮৭—১০৭

ষষ্ঠ অধ্যায় :

গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চরিত-চিত্র ১০৯—১৪৭

সপ্তম অধ্যায় :

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবনে ও নাটকে : অমৃতলাল : ক্ষীরোদপ্রসাদ : দ্বিজেন্দ্রলাল ১৪৮—১৭৪

অষ্টম অধ্যায় :

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবনে ও নাটকে : অমরেন্দ্রনাথ : মনোমোহন : হারাণচন্দ্র ১৭৫—১৮৬

নবম অধ্যায় :

রামকৃষ্ণ-নাটক : প্রবাহ ১৮৭—২০৩

দশম অধ্যায় :

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিল্পীজগৎ : ২০৪—২৫৩
[বিনোদিনী ২০৪—২০৮ ; তারাসুন্দরী-মণিমালা ২০৮—২১৪ ; হাবুদত্ত-সুরেনদত্ত-পুলিন মিত্র অঘোর পাঠক-আলাউদ্দীন খাঁ-আলি আকবর-রবিশঙ্কর ২১৪—২১৯ ; অপরেশ মুখোপাধ্যায় ২১৯—২২২ ; দানীবাবু ২২২—২২৫ ; নির্মলেন্দু লাহিড়ী-সরযূ-বালা-সন্তোষ সিংহ ২২৫—২৩৩ ; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কানু বন্দ্যোপাধ্যায়-গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৩—২৩৬ ; শিশির কুমার ভাদুড়ী ২৩৭—২৩৮ ; নজরুল-অনিল বাগচী-ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ২৩৮—২৪০ ; পাহাড়ী সান্যাল - শান্তিগুপ্তা - শেফালিকা-কাননদেবী - সুচিত্রা সেন-সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-পূর্ণেন্দু বন্দ্যোধ্যায় ২৪১—২৪৪ ; বহির্বঙ্গে : দিলীপকুমার—সাহুমোদক—হেমন্তকুমার—লতা মঙ্গেশকর—শুভলক্ষ্মী ২৪৫—২৪৮ ; তথ্যপঞ্জী ২৪৯—২৫৩]

একাদশ অধ্যায় :

কস্মৈ দেবায় ২৫৪—২৬৬

পরিশিষ্ট : কিছু অতিরিক্ত সংবাদ ২৬৭—২৮০

নির্দেশিকা ২৮১—২৯২

প্রস্তাবনা

দীর্ঘ সাতবছরের চেষ্টায়, নানাজনের সহায়তায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও রঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থটি শেষ করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছি—কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারি নি। সবচেয়ে বড় ক্ষোভ, এক যুগ আগে যদি তথ্যসংগ্রহের কাজে হাত দেওয়া যেত, তাহলে অনেক প্রবীণ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে তাঁদের অমূল্য স্মৃতিকথা সংগ্রহ করা যেত। আজ সেই সব স্মৃতি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে, বহু কাগজ-পত্র বিনষ্ট হয়ে গেছে। এমন কি, পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বিডন স্ট্রীটের সেই আদি স্টার থিয়েটার, যেটি কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট সেণ্ট্রাল এভিনিউ তৈরী করার জন্যে ধূলিসাৎ করেছিলেন, তার একখানি ছবি বহু চেষ্টা করে কোথাও খুঁজে পাই নি।

এই তথ্যসংগ্রহের কাজ শুরুর একটি ছোট পটভূমিকা আছে। ১৯৫৯ কিংবা ১৯৬০ সালের কথা। 'রঙমহলে' আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্যের একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। শৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় হলেও তাতে কয়েকজন প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ও অভিনেত্রী যোগদান করেছিলেন। সেই সঙ্গে আমরা কয়েকজন অধ্যাপকও ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। অভিনয়-সন্ধ্যায় সকলে যখন সাজপোষাক পরতে ব্যস্ত—আমন্ত্রিত অতিথি সমাগমে প্রেক্ষা-গৃহ প্রায় পূর্ণ—অভিনয় আরম্ভ হবার বিশেষ বিলম্ব নেই। কিন্তু তখনো প্রধান অভি-নেতা কমল মিত্র মহাশয় এসে পৌঁছন নি। সকলেই উদ্বিগ্ন। নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য কিছু পূর্বে হন্তদন্ত হয়ে কমলবাবু এসে পৌঁছলেন—কিন্তু আমাদের প্রত্যাশমত তিনি প্রথমেই সাজঘরে না-ঢুকে চলে গেলেন উৎসের পাশে। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, কমলবাবু ধীরে সুস্থে, বেশ ভক্তিভরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে প্রণাম করছেন। প্রণাম সেরে আবার অত্যন্ত দ্রুত সাজঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সাধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম এর কারণ। উনি জানালেন, শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তারপর থেকে পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁকে রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রণাম না করে কোনো শিল্পী থিয়েটারের কোনো কাজ করে না। কৌতূহল অবসান—সুতরাং এ-নিয়ে বিশেষ আর মাথা ঘামাই নি।

কলেজে শিক্ষকতা শুরু করার আগে থেকেই অভিনয় ও নাটকের প্রতি ঝোঁক ছিল—কিছু কিছু শখের থিয়েটারে অভিনয়ও করেছিলাম। কলেজে প্রবেশ করে

সান্নিধ্য লাভ করলাম ডক্টর সাধন ভট্টাচার্যের। নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ আমাদের মধ্যেও তিনি সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই ক্লাসে নাটক পড়াবার জন্য তাঁর সহকারিত্ব লাভ করলাম। উনি রবীন্দ্রভারতীতে যোগদান করার পর 'গিরিশচন্দ্র' সম্পর্কে গবেষণার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। 'গিরিশচন্দ্র'-এর বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেও নানারকম প্রতিবন্ধকতায় গবেষণার কাজ ততখানি অগ্রসর হয় নি। এমনি সময়ে সাধনবাবু মারা গেলেন—আমার কাজও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সেই লোকান্তরিত শিক্ষকের কাছে একটা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেলাম না। ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু (আমার গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের ও নাটকের প্রতি আগ্রহের কথা উনি জানতেন) 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য আমাকে বলেন। ওঁর যুক্তি ছিল, গিরিশ সম্পর্কে যখন খানিকটা কাজ করেছি তখন সামান্য বিস্তৃতভাবে গিরিশপরিমণ্ডলটি অবলম্বন করে অগ্রসর হলেই কাজ হয়ে যাবে। সেই সময় 'রঙমহলে'র ঘটনা এবং পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের জোরে হয়ত একটু উৎসাহ দেখিয়েছিলাম কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বুঝতে পারলাম চিন্তা না করে শঙ্করীবাবুর কথায় রাজি হয়ে কি বিপদ সৃষ্টি করেছি! শঙ্করীবাবু যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে লেগে থেকে আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেবেনই তা বুঝতে পারি নি। সে যে কী ভীষণ তাগাদা তা বোঝানো কঠিন। এর পর থেকে বলতে গেলে, তিনি আমার ঘাড় ধরে কাজ করিয়েছেন, হাত ধরে লিখিয়েছেন। কতভাবে উৎসাহিত করেছেন, তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, নানারকম নির্দেশ দিয়েছেন—এমন কি প্রয়োজনে লেখা সংশোধন পর্যন্ত করে দিয়েছেন। আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ভালবাসার তুলনা নেই—সেই জোরেই আমাকে দিয়ে বইটি শেষ করাতে পেরেছেন। যদি পাঠক সমাজে বইখানি সমাদৃত হয় তবে তার জন্যে শঙ্করীপ্রসাদের কৃতিত্ব আশি ভাগ আর বইটি অসার্থক হলে আমার অক্ষমতাই তাঁর সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করে দিয়েছে বলে মনে করবো। ঠিক কি ভাবে তাঁকে ধন্যবাদ দেব অথবা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারি নি। অবশ্য শঙ্করীবাবু কোনো স্বার্থবোধের দ্বারা পরিচালিত নন—তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার যথার্থ মূল্যায়নের স্বভাবজাত আনন্দেই এ-কাজ করিয়েছেন—সুতরাং মামুলি পদ্ধতিতে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সেই আনন্দকে আমি খর্ব করতে চাই না।

শঙ্করীবাবুর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমত কাজ শুরু করতে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি উল্টেই বুঝতে পেরেছিলাম কী বিপুল পরিমাণ তথ্য রয়েছে। পুরাতন পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পূর্ণ 'ফাইল' এখন আর পাওয়া সম্ভব

নয় কিন্তু যতখানি আছে তাতেই দেখা যাবে সেকালে নাট্য সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ কতখানি প্রভাব বিস্তৃত করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ ছাড়াও বেলুড়-মঠ গ্রন্থাগার, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার থেকেও বহু সাহায্য পেয়েছি। বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার (সাময়িক পত্র বিভাগ) প্রভৃতিতেও সন্ধান কার্য করেছি। হরীন দত্তের নিজস্ব পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। পুরাতন পত্র-পত্রিকায় তথ্য সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেকাল ও একালের নাট্যকার অভিনেতা-অভি-নেত্রী, পরিচালক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং এই ধারা বর্তমানে কতখানি অব্যাহত তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। এঁদের অভি-জ্ঞতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'টেপ-রেকর্ড' করে নিয়েছি—কেউ কেউ লিখিতভাবেই বিবৃতি দিয়েছেন। গ্রন্থমধ্যে 'টেপ-রেকর্ড' করা বিবৃতিগুলি 'জবানবন্দী' ও লিখিত বিবৃতিগুলি শুধু 'বিবৃতি' বলে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে বিবৃতি তাঁরা স্বহস্তে লিখে দেন নি, সে ক্ষেত্রে অনুলেখকের নামও উল্লেখ করেছি। 'টেপ-রেকর্ড' করা বিবৃতি বা 'জবানবন্দী'গুলি গ্রন্থ প্রকাশের পর এক বছর পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করবো। মুখের কথায় অনেক সময় অসম্পূর্ণ বাক্য বা পুনরাবৃত্তি দেখা যায়—সেই কারণে বক্তব্য যথাযথ রেখে 'জবানবন্দী'গুলি সামান্য সম্পাদনা করতে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম এসেছিলেন প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে। এইকালের মধ্যে সমাজে ও জীবনে বহু ভাঙাগড়া হয়েছে—বাংলার রঙ্গমঞ্চও সেই ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। সেই অগ্রগতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন, এই গ্রন্থে সেটা দেখাবার চেষ্টা করেছি। লোকশিক্ষা বিস্তারে রঙ্গমঞ্চ যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে সে সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতা, সব সমকালীন সামাজিক বিরূপতা সত্ত্বেও, রঙ্গমঞ্চকে যে প্রেরণা দিয়েছিল তার ফলে রঙ্গশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই মর্যাদার ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ রঙ্গশালা জাতীয়তা ও ধর্মবোধ প্রচারে যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে তাকে আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অনেকে মনে করেন ধর্মীয় নাটক কেবল-মাত্র পৌরাণিক ভাব-বিহ্বলতা মাত্র সৃষ্টি করে আমাদের নাট্যসাহিত্যকে দুর্বল করে তুলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বতর ন্যায় সত্যের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পিত কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে এই নাটকগুলির ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়।

এই গ্রন্থের মধ্যে আমি বিশেষভাবে একটি জিনিষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি—আমি রামকৃষ্ণ পূজা দেখাতে বিশেষ উৎসাহী নই কিন্তু সেই পূজার কোনো সামাজিক তাৎপর্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করার প্রয়াস পেয়েছি। রামকৃষ্ণকে পূজা

করা হয়েছে—তিনি রঙ্গমঞ্চকে স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করে কি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে দিয়ে মানবতার কোন্ অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছিল —এই প্রশ্নগুলির বিচার-বিশ্লেষণই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই শ্রমসাধ্য কাজে কতখানি সফল হতে পেরেছি জানি না—কিন্তু সকলের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছি, আমার কাছে তা বিশেষভাবে মূল্যবান! বেলুড় মঠের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, শিল্পী—সকলের কাছ থেকেই উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা লাভ করেছি। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, তবে, বিশেষ করে কয়েকজনের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অনেক সন্ন্যাসীরই সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করছি সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুপ্রাচীন স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজ) অকুণ্ঠ স্নেহপূর্ণ সহযোগিতার কথা। পুরানো দিনের অনেক স্মৃতিকথা তিনি বলেছিলেন, যেগুলি লিখে নেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। তিনি আমাকে যে পরিচিতিপত্র লিখে দেন সেটি নিয়ে বোম্বাইয়ের রামকৃষ্ণ মিশনে উপস্থিত হয়ে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সাহায্যে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগে সমর্থ হয়েছিলাম। তাঁরই সহায়তায় বেলুড়ের মঠ গ্রন্থাগারে তথ্য সন্ধানের সুযোগ পেয়েছিলাম। গ্রন্থাগারিক স্বামী কেশবানন্দ আমার সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন এবং বরানগর মঠে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্রের নাট্য-গ্রন্থাবলীর আলোকচিত্র তুলে দেন স্বামী কল্যাণেশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বর্তমান সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দের অনুমতিক্রমে বেলুড় মঠে গিরিশ স্মৃতি-ফলকের আলোকচিত্রটি গ্রহণ করতে পেরেছি। তাঁরই সম্মতিতে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান গ্রন্থাগার থেকে 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত' দুষ্প্রাপ্য পুস্তকটিও দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের বর্তমান সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁরই রচিত গ্রন্থ, কয়েকখানি 'বিশ্ববাণী' পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া তাঁর জবানবন্দী থেকে অনেক মূল্যবান তথ্যও আমার কাজের সহায়ক হয়েছে।

জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের সুপ্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী পরমেশ্বরানন্দ সারদাদেবীর সেবক ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর এবং মাতৃমন্দিরের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের পত্র থেকেও মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। মাতৃমন্দিরের স্বামী সুষুম্নানন্দও কিছু সংবাদ দিয়ে সহায়তা করেছেন। কাশী সেবাশ্রমের স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দও পত্র মারফত অনেক সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বাংলাদেশ থেকে কিছু বই সংগ্রহ করে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা মিশনের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী উমানন্দ। স্বামীজী পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ পাঠ করে

আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্‌টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এঁদের সকলের কাছেই আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রথমে বিবৃতি ও পরে জবানবন্দীর মাধ্যমে অনেক অজ্ঞাত তথ্য দান করেছেন। প্রয়োজনমত পরামর্শ ও উৎসাহ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। প্রবীন দিলীপকুমার রায় পত্রযোগে আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। গত বৎসর শারদীয়া সংখ্যা উদ্বোধনে এই গ্রন্থের কিছু অংশ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' নামে প্রকাশিত হয়। সেটি পাঠ করে তিনি 'উদ্বোধনে'র সম্পাদক মহারাজের কাছে পত্র দিয়ে প্রবন্ধটির বিশেষ প্রশংসা করেন। নাট্যকারের পুত্রের কাছ থেকে এই অনুমোদন ও প্রশংসা লাভ আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক বলে আমি দাবী করতে পারি।

'রূপমঞ্চ' সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক কালীশ মুখোপাধ্যায় আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করে সর্ববিষয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁরই সাহায্যে রূপমঞ্চের পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি অনেকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, নিজে চলচ্চিত্রের তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংখ্যা 'উদ্বোধনে' বিনোদিনী সংক্রান্ত রচনাটি পাঠ করে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর অনুমোদন আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেছে।

শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ছে সরযূদেবীর কথা। তাঁর চেষ্টাতেই অসুস্থ অহীন্দ্রচৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা-দেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিগোপাল জবানবন্দী ছাড়াও অনেকগুলি আলোক-চিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। 'প্রদীপ অপেরা'র পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক-চিত্রটি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'স্বামীজী' কথাচিত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ছবি পেয়েছি তাঁর পুত্র নটনারায়ণ ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে। 'স্টার' থিয়েটারে প্রণামরত মহেন্দ্রগুপ্তের ছবিটি তুলে দিয়ে সাহায্য করেছেন প্রদীপ দাস এবং দক্ষিণেশ্বরে রবি-শঙ্করের ছবিটি দিয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার অলক মিত্র। এঁদের সকলকেই আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক শিল্পীর বিবৃতি স্বেচ্ছায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন—তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদের চিঠি আলোকচিত্র গ্রহণ ও ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে সহায়তা করেছেন নাট্যকারের পৌত্র পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডক্টর অলক রায় তাঁর সংগ্রহ থেকে কর্ণার্জুন নাটকের শততম রজনীর উপহার পুস্তিকা থেকে আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়ে বদান্যতা প্রকাশ করেছেন। সেকালের পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল

পোস্টারগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের ও 'রঙমহলে'র স্মারক শ্রীমণি চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে। এঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্নেহভাজন প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করেছেন একটি আলোকচিত্র দিয়ে ও অন্যান্য ভাবে।

নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামীর দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলি পেয়েছি তাঁর একমাত্র কন্যা কণকলতা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। নাট্যকারের পুত্র অমিয়কিশোর গোস্বামী ও পৌত্রী বাসন্তী গোস্বামী অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। অমিয়বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সঙ্গে অনেক শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দেন। আর তাঁর পুত্র শ্রীমান অপূর্বকিশোর গোস্বামী এম. এ পাশ করার পর দীর্ঘ দু'বছর ধরে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন, জবানবন্দী ও আলোকচিত্র গ্রহণে সাহায্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমানের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা অতুলনীয়। তাঁর প্রবল আগ্রহ আমার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ স্মরণ করছি।

বোম্বাই অবস্থান-কালে ও অন্যসময়ে কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সুলতা চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

'বিশ্বরূপা' থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী রাসবিহারী সরকার ও 'স্টার' থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী রণজিৎমল কাঙ্কারিয়া আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ সুদেব-ভূষণ ঘোষও আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তা ছাড়া আমার সহকর্মী, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁরা প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছেন, সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দান করেছেন তাঁদের দানও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসী কলেজের ডঃ সুভাষ দত্ত, ডক্টর চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমবল্লভ সেন, অধ্যাপক বীরেন ঘোষ, দিলীপ রায়, ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডক্টর অরুণ বসু, কবি-সাহিত্যিক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ইন্‌স্‌টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের গ্রন্থাগারিক অশোক মুখো-পাধ্যায়, শ্রীমতী গীতা দত্ত, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায় (বালি), দেব-কুমার মুখোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিখিলেশ্বর ভট্টাচার্য, অলক ঘোষাল, বিমল ঘোষ (কাসুন্দিয়া), কৃষ্ণনাথ বসু, শান্তনু চট্টোপাধ্যায় ও প্রণতি চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী গণেশ বসু, রবিধন দত্ত, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক নির্মাল্য

আচার্য।

গ্রন্থখানি রচনাকালে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সহকারীরূপে কাজ করেছেন আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান যতিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা রেণুকা চট্টোপাধ্যায়। তবে তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর প্রশ্ন অবান্তর।

'মণ্ডল বুক হাউসের স্বত্বাধিকারী সুনীল মণ্ডল মাত্র দু'মাসে এই পুস্তকটি মুদ্রণের ও প্রকাশের যে তৎপরতা দেখিয়েছেন আমার কাছে তা অভাবনীয় বলে মনে হয়েছে। বিশেষ করে এই বিদ্যুৎ সঙ্কটের কালে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর যোদ্ধা মনোভাবই পুস্তকটির প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছে। হরীন্দ্রনাথ দত্তের সংগ্রহশালা থেকে তিনিই পোস্টার ইত্যাদির ফটোগুলি তুলে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে আজ বিশেষ করে যাঁর কথা মনে পড়ছে—তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর প্রেরণা প্রতিনিয়তই আমি অনুভব করেছি। সেই নাট্যরসিক অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন নাটক নিয়ে আমি কিছু কাজ করি। আমার দুঃখ তাঁর জীবদ্দশায় আমি সে-কাজ করতে পারি নি। আজ কাজ শেষ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভূমিকায় উল্লিখিত ছাড়াও যাঁরা জবানবন্দী, বিবৃতি বা পত্র মারফত সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি :

স্বামী নির্লেপানন্দ
স্বামী ভুবনানন্দ
অহীন্দ্র চৌধুরী
সন্তোষ সিংহ
জীবেন বসু
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
শেফালিকা (পুতুল)
নীরদাসুন্দরী
নিভাননী দেবী
রজত বসু
মৃণাল মুখোপাধ্যায়
অনিল চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
কাননদেবী
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
মণি শ্রীমাণী
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
তরুণকুমার
প্রতিভা খান্না
ইন্দুবালা
আঙুরবালা
তারকবালা (মিসলাইট)
অরুণ চৌধুরী
নীলরতন ভট্টাচার্য
স্মরদেব রায়
সুবল দত্ত

অনুকূল দত্ত
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
অনিল বাগচি
ফৈমুদ্দিন ডাগর
হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হীরুবাবু)
রাম চৌধুরী
মহেন্দ্র গুপ্ত
দেবনারায়ণ গুপ্ত
মন্মথ রায়
বিধায়ক ভট্টাচার্য
সূর্য দত্ত
মাখন নট্ট
কমলকৃষ্ণ খাঁন
পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মণীন্দ্রনাথ গোস্বামী (প্রদীপ অপেরা)

হরীন্দ্রনাথ দত্ত
কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু)
দুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শঙ্কর নারায়ণ ভট্টাচার্য
জ্যোতির্ময় বসুরায়
সমীরণ গুপ্ত
জনার্দন মুখোপাধ্যায় (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা)

সাহু মোদক
শ্রীমতী সাহু মোদক

[নন্দলাল বসুর 'নৃত্যরত রামকৃষ্ণ' ছবিটি 'উদ্বোধন' পত্রিকা থেকে গৃহীত]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

স্টার থিয়েটারে 'সম্রাট' নাটকের অভিনয়ের পূর্বে প্রণামরত মহেন্দ্রগুপ্ত
(ফটো : প্রদীপ দাস)

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে রবিশংকর (অলক মিত্রের সৌজন্যে)

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ : শিল্পী ও নাট্যরসিক

শৈশব থেকেই গদাধর শিল্পী। মূর্তিগড়া, ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে যেমন, অভিনয়-দক্ষতার মধ্যে দিয়েও তেমনি তার শিল্পবোধ উৎসারিত। সামান্য পুঁথি নকলে লিখন-ভঙ্গিমা ও নকসার সাহায্যে তাকে সজ্জিত করার প্রয়াসেও গদাধরের ভাবুক মন আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। শৈশবের খেয়াল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একদিন শেষ হয় কিন্তু গদাধরের জীবনে এটা সামান্য খেয়ালমাত্র ছিল না—এ তার পরবর্তীকালের সাধক ও আচার্য-জীবনেরই প্রথম উদ্ভাস। অভিনয়-সঙ্গীত-নৃত্য শিল্পের প্রতি বালক গদাধরের আকর্ষণ তার পরবর্তী জীবনে, সেই সূত্রে সমগ্র জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে।

অভিনয় শিল্পের প্রতি গদাধরের এই অনুরাগের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যাত্মজীবনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন :

"প্রোটিয়াসের মতো ছিল তাঁহার আত্মা। তিনি যাহাই দেখিতেন বা কল্পনা করিতেন, তাহাই মুহূর্তে আপনা হইতেই তাঁহার মধ্যে রূপায়িত হইত! এইরূপ রূপগ্রহের শক্তি কম-বেশি সকলের মধ্যেই থাকে। ইহার নিম্নতম প্রকাশ দেখা যায় অভিনয়ের মধ্যে। অভিনেতারা মুখের ভাবভঙ্গি ও মানসিক অভিব্যক্তির অনুকরণ করেন। ইহার উচ্চতম (যদি এই কথা ব্যবহার করা চলে) প্রকাশ হইল ভগবানের মধ্যে—ভগবান যিনি স্বয়ং বিশ্বনাট্যের অভিনয় করেন। রূপগ্রহের এই শক্তি শিল্প ও প্রেমের চিহ্ন। রামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে যে বিস্ময়কর শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা ছিল বিশ্বের সকল সত্তাকে আপন করিয়া লইবার প্রতিভা।" (১)

মাত্র নয় বৎসর বয়সে এই প্রতিভার এক বিচিত্র প্রকাশ দেখা গেল পাইনবাড়িতে শিবরাত্রি উপলক্ষে আয়োজিত যাত্রার আসরে। স্বামী সারদানন্দ সে কাহিনী বর্ণনা করেছেন :

"বালক সেদিন যথারীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু গয়াবিষ্ণু এবং অন্য কয়েকজন বয়স্তও সেদিন উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবমহিমাসূচক

যাত্রার অভিনয় হইবে জানিয়া উহা শুনিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যখন তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল তখন সহসা তাহার বয়স্যগণ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পাইনদের বাটীতে তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে, কারণ যাত্রার দলে যে শিব সাজিত সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্বক্ষণ শিবচিন্তাই করিতে হইবে, উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; অধিকন্তু ঐরূপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত; তাহারা সকলে উপবাসী রহিয়াছে এবং ঐরূপে রাত্রি জাগরণ ব্রত পূর্ণ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা রুদ্রাক্ষ ও বিভূতিভূষিত হইয়া সে শিবের চিন্তায় এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে তাহার কিছুমাত্র বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সে রাত্রির মতো যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।" (২)

ঘটনাটি থেকে দু'টি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এক, গদাধরের অভিনয়ক্ষমতা গ্রামে সকলেই স্বীকার করতেন, দুই, গদাধর প্রচলিত অর্থে অভিনেতা নন, কারণ যে আত্ম-সচেতনতা অভিনয় শিল্পীর পক্ষে আবশ্যিক তা তার হারিয়ে যেত প্রায়ই, ফলে অভিনয় থেমে যেত, কিন্তু সেই সময় দেখা যেত এক অপূর্ব ছবি—কোনো একটা অলৌকিক নাট্যদৃশ্যের দিব্যচিত্র—যেখানে অভিনেয় চরিত্র (গদাধরের ক্ষেত্রে দেবচরিত্র) তার স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে আসরে।

সে যাই হোক, সে রাত্রির মতো যাত্রা বন্ধ হলেও গদাধরের জীবন থেকে অভিনয় কখনো বন্ধ হয় নি। কামারপুকুরে তার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি ছিল লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে দিয়ে যেমন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে তেমনি এর মধ্যে পেয়েছে সে আনন্দউৎসের সন্ধান। হুগলী জেলার ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুরের অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে লোক-শিক্ষার এই বাহনগুলি তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। গ্রামে তখন তিনদল যাত্রা, একদল বাউল, দু'একদল কবি—এ ছাড়া অনেক বৈষ্ণবের বাস। ভাগবতপাঠ, সঙ্কীর্তন, যাত্রা, তর্জা—প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা-না-একটা অনুষ্ঠান। সেই সব অনুষ্ঠানে গদাধর উৎসাহী দর্শক-শ্রোতা। তাদের গান তার কণ্ঠস্থ—তাদের নৃত্যছন্দ গদাধরের পায়ে-পায়ে নিত্যসঙ্গী। অভিনয়ক্ষমতার সঙ্গে ছিল সুকণ্ঠের অধিকার। অন্য পাঁচজন শ্রোতার মতো শুধু কানে শুনেই সে তৃপ্ত হয় নি—প্রকৃত রসবোদ্ধার

অনুভূতিতে সেগুলি গ্রহণ করেছে অন্তরের মধ্যে। যেখানে অসঙ্গতি বা রসাভাস চোখে পড়েছে, সেখানে রসকৌতুকে সেগুলিকে তুলে ধরেছে সকলের কাছে। এ-সব নিয়ে কৌতুক সৃষ্টিতে তার জুড়ি ছিল না। আবার একই-সঙ্গে শ্রোতাদের দিকেও তার নিবিষ্টদৃষ্টি। কীর্তনীয়ার কৃত্রিমতাটুকু তার চোখ এড়াত না, আবার মহিলা-শ্রোতাদের পারস্পরিক ঐশ্বর্যপ্রদর্শনের আগ্রহও তার সকৌতুক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যেত।

গদাধর এইভাবে কেবল অভিনেতাই হয়ে ওঠেন নি—নাট্যরচনা ও পরিচালনার প্রতিভাও তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে। আমরা দেখি, বন্ধুদের অনুরোধে তাদের নিয়ে যাত্রার দল তৈরী করেছেন তিনি। অভিভাবকদের সজাগদৃষ্টি এড়াবার জন্যে মানিকরাজার আমবাগানে যাত্রার আসর বসাবার পরিকল্পনা গদাধরেরই। সেখানে চলত অভিনয়-শিক্ষা এবং গানের রেওয়াজ। বলাবাহুল্য শিক্ষাদানের ভার গদাধরের ওপরে—প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলো তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। সারদানন্দ লিখছেন : "যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভূমিকার কথাসকল উচ্চারণ পূর্বক একাকীই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীগণের মধ্যে কাহাকেও কোনদিন বিমর্ষ দেখিলে সে ঐ সকল যাত্রার সঙের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোনো ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত।" (৩)

উত্তরকালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ :

"একবার নিকটবর্তী কোনো গ্রামে যাত্রাভিনয় হইতেছে শুনিয়া [সারদাদেবী] পরিবারের অন্য এক মহিলার সহিত যাইতে চাহিলে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমতি দিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের মনঃকষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তিনিও দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন তিনি স্বয়ং সমস্ত অভিনয়টি দেখাইবেন। ঐ অভিনয় তিনি একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অপূর্ব স্মৃতিশক্তি ও নাট্যকৌশল-সহায়ে সুরতাল সহকারে তিনি সমস্ত পালাটি এমন সুন্দরভাবে অভিনয় করিলেন যে, মহিলারা যাত্রা না দেখার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধচিত্তে অঙ্গভঙ্গী, বাক্যালাপ ও সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন।" (৪)

স্বামী প্রভানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা" প্রবন্ধে বালক গদাধরের কতকগুলি পুঁথি নকলের কথা বলেছেন। এই পুঁথিগুলির প্রায় সবই যাত্রার পালা :

(১) ১২ বছর ২ মাস বয়সে হরিশ্চন্দ্র পালা ;

(২) সাড়ে ১২ বছর বয়সে মহীরাবণ পালা ;

(৩) ১৩ বছর ৪ মাস বয়সে সুবাহুর পালা। (৫)

এগুলির অনুলিখন গদাধরের যাত্রার কাহিনীর প্রতি অনুরাগ সূচিত করে। প্রভানন্দ জানিয়েছেন, গদাধর পালা নকল করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, কিছু কিছু স্বরচিত জিনিষও যোগ করে দিয়েছেন। এই সংযোজন তাঁর মৌলিক রচনার আগ্রহ ও শক্তিরই প্রকাশ! মানিকরাজার বাগানে তাঁর পরিচালনায় যে-সব পালা অভিনীত হয়েছে তাতে এই মৌলিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত।

নিজ অভিনয়প্রীতি ও অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব উক্তিগুলি বিশেষ মূল্যবান:

(১) [অক্রুর-শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গান শুনে] "আমি এ-সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ-কেউ বলত আমি কালীয়-দমন যাত্রার দলে ছিলাম।" (৬)

(২) "ও দেশে [কামারপুকুরে] ছেলেবেলায় আমায় মেয়েপুরুষ সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম।···কোনোখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শুনাতুম। মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথাসুর নকল করতুম। (৭)

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে মেয়ে-কীর্তনীয়ার হাবভাব নকল করেছেন, তার একটি চমৎকার চিত্র আছে কথামৃতে:

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তগণকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোটখাটটিতে বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায়ের সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া হাতে রঙীন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আসুন!' আবার মাঝে-মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।" (৮)

শুধু কীর্তনীয়া বা অভিনেতা কেন, কোনো মানুষের হাবভাবের অসঙ্গতি—শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ এড়াত না। সেদিনের আসরে আরও কতকগুলি মানুষের ভাবভঙ্গি অভিনয় করে দেখিয়েছেন:

"অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উহুঁ, —এই সব।"

"আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছের দর করে! জপ করতে

করতেই হয়ত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে।"
"কেউ হয়ত গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে-সময় কোথা ভগবান চিন্তা করবে, গল্প করতে বসে গেল! কত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে?' 'অমুকের বড় ব্যামো,' 'অমুক শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছে কিনা,' 'অমুক কনে দেখতে গিছলো, তা দেওয়া থোওয়া সাধআহ্লাদ খুব করবে,' 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটো, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না,' 'এতোদিন আসতে পারিনি মা—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।"
কীর্তনীয়াকে নকল করার প্রসঙ্গ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই শুনতে পাই :
"আমি একজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে কীর্তনীর ঢঙ্ সব দেখিয়েছিলাম। সে বললে 'আপনার এ-সব ঠিক ঠিক। আপনি এ-সব জানলেন কেমন করে?' (৯)
পুরুষ ও নারী—উভয়েরই চরিত্র প্রস্ফুটনে শ্রীরামকৃষ্ণের সমান দক্ষতা। তাঁর মধ্যে দুই সত্তার সহাবস্থানের কথা স্মরণ রাখলে তাঁর নারীচরিত্র চিত্রণের ক্ষমতা অভিনব বলে মনে হবে না। কামারপুকুরে অবস্থানকালে নারীচরিত্রাভিনয়ে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা বহুবারই দেখা গেছে। বিশেষকরে পাইনবাড়ির ঘটনাটি চমকপ্রদ।
দুর্গাদাস পাইনের বড় অহঙ্কার ছিল, তাঁর বাড়ির মেয়েরা এতই পর্দানশীন যে, কোনো বাইরের পুরুষ তাদের কোনোদিন দর্শন পায় নি, পাবেও না। যে গদাধরের সকল বাড়িতে অবাধ গতিবিধি পাইন-অন্তঃপুরে তাঁরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। গদাধর একদিন এই দর্প-চূর্ণ করতে চাইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় কাঁখে চুবড়ি নিয়ে, ঘোমটা টেনে এক তাঁতী স্ত্রীলোক এলো দুর্গাদাসের সদরে। মেয়েটি সুতো বেচতে এসেছিল হাটে, দল ছাড়া হয়ে এখন এতরাত্রে নিজের গ্রামে একা ফিরতে সাহস পাচ্ছে না। রাতটুকু কাটাবার আশ্রয় পেয়ে কাল সকালেই সে চলে যাবে। অসহায় স্ত্রীলোক! দুর্গাদাস ও উপস্থিত প্রবীণ ব্যক্তিরা নানারকম জেরা করলেন—অবশেষে নিঃসন্দেহে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। বৌ-টি অন্তঃপুরে অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েদের সঙ্গে নানা গল্পে বেশ জমিয়ে নিল। এদিকে অনেক রাত হলো—গদাধরের দেখা নেই। বিচলিত মাতা-চন্দ্রমণি গদাধরের দাদাকে পাঠালেন চারদিকে খোঁজ করতে। নাম ধরে ডাকতে ডাকতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করছেন তিনি—সাড়া পাওয়া গেল পাইন-বাড়ির অন্তঃপুর থেকে। তাঁতি বৌ শাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলো হাসতে হাসতে। দুর্গাদাস আর বলবেন কি, তাঁর তখন চক্ষুস্থির! খুসি হয়ে তারিফই করলেন শেষ পর্যন্ত।(১০)
স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন "গদাধর কখন কখন রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়া··· বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরূপে শ্রীমতী রাধারানীর অথবা তাঁহার প্রধানা সখী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা [প্রতিবেশী মহিলারা]

তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাবভাব, কথাবার্তা, চাল-চলন প্রভৃতি অবিকল নারীর ন্যায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না!···রঙ্গপ্রিয় বালক এই সময়ে কোন কোন দিন রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া কক্ষে কলসী ধারণ পূর্বক পুরুষ-দিগের সম্মুখ দিয়ে হালদারপুকুরে জল আনয়নে গমন করিয়াছিল এবং কেহই তাহাকে ঐ বেশে চিনিতে পারে নাই।" (১১)

সাধনা-কালে স্বয়ং মথুরবাবুও স্ত্রীবেশী শ্রীরামকৃষ্ণকে নারী বলেই মনে করেছিলেন। সারদানন্দের সাক্ষ্য থেকেই জানতে পারি :

"ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে একথা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল একথা আমরা ঠাকুর ও হৃদয় উভয়ের নিকট বহুবার শুনিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন কালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেন।" (১২)

পাইন বাড়ি থেকে শুরু করে মথুরবাবুর বিভ্রান্তির ঘটনা পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাঁদের এই বিভ্রম ঘটেছে তাঁরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত এবং ঘটনাগুলি বেশ কিছু সময় ধরেই ঘটেছে। প্রায় ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে থেকে ধরা না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা কেউ তাঁকে চিনতে পারেন নি। এই বিভ্রম সৃষ্টির মূলে রয়েছে তিনটি বিষয়ে দক্ষতা—সাজসজ্জা (make up), কণ্ঠ (voice) এবং ভাবভঙ্গী (gestures)। এক কথায় অভিনয়ের সকল দিকেই তাঁর মুন্সীয়ানা বিস্ময়কর। স্মরণ রাখা দরকার, সাজানো নাট্যমঞ্চের সুবিধা বা কৃত্রিম আলোকসম্পাতের সুবিধা এখানে ছিল না—গোটা ব্যাপারটাই ঘটেছে স্বাভাবিক পরিবেশে, যেখানে বাস্তবানুভূতি আনা ছিল সুকঠিন।

॥ ২ ॥

বালক গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে উত্তরণের পরেও যাত্রা, থিয়েটার, সঙ্কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হন নি বরং তাঁর যোগসূত্র দৃঢ়তর হয়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ সাধনার কালে তিনি কতখানি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক-রক্ষা করে-

ছেন, তা তথ্যযোগে বলা কঠিন, কারণ এইকালের পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনপঞ্জী পাওয়া যায় না। তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে যাত্রা, কথকতা, মাতৃনাম-গানের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ দূরে সরে থেকেছেন, একথা মনে করার কারণ নেই। ৪ জুন ১৮৮৩—ফলহারিনী কালীপূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য বিশ্বাস সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—হ্যাঁ গা কাল যাত্রা হয় নাই ?

ত্রৈলোক্য—হাঁ, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা এবার যা হয়েছে তা হয়েছে। দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়। যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই বরাবর হওয়া ভাল।"(১৩)

মথুরবাবুর সময় থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাত্রাগানেব অব্যাহত ব্যবস্থা ছিল, তা ঐ কথোপকথন থেকে বুঝতে পারি। সাধনার কালেও দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রাগানের সময় তিনি সময় সুযোগ মতো উপস্থিত থাকতেন, এমন অনুমান অসমীচীন নয়। মথুরবাবুর সঙ্গে অন্যত্র যাত্রাগান বা সঙ্গীতাদির আসরে উপস্থিত থাকাও অস্বাভাবিক নয়। নহবৎখানার রসুনচৌকী শুনতে অভ্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনেক উপমার মধ্যে সানাইয়ের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন—বিশেষ করে সাকার-নিরাকার তত্ত্ব বোঝাতে সানাইয়ের একজনের পোঁ ধরা এবং অন্যজনের নানা সুরজাল বিস্তারের উপমাটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। প্রহরে-প্রহরে সানাইয়ের সুরবিস্তার সাধক রামকৃষ্ণকেও আধ্যাত্মিক আনন্দলোকে পৌঁছে দিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাধনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদের স্বল্পতা কিছুটা দূর হয়েছে পরবর্তীকালে গুরু-ভাবে অধিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যখন তাঁকে বেষ্টন করে বসেছেন ভক্তেরা এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল নিয়ে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন। সেগুলি থেকে আমরা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ যেমন পাই (এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করব) তেমনি পাই অপেশাদারী অভিনয়ের আসরে তাঁর উপস্থিতির কথা। শেষোক্ত বিষয়টির আলোচনা আগে করে নেব।

'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্বামী প্রভানন্দের 'কেশবচন্দ্রের নব-বৃন্দাবন নাটক' একটি তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান রচনা। ঐ প্রবন্ধে লেখক নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের New Dispensation পত্রিকার ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ নববৃন্দাবনের অভিনয় দেখেছিলেন ২৫শে জানুয়ারি ১৮৮৩। ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। দ্বিতীয়

নববৃন্দাবন নাটকের ভাবকেন্দ্রে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এমন দাবী অনেকের। সুতরাং এর অভিনয় আসরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নাটকটির সম্পূর্ণ নাম 'নববৃন্দাবন বা ধর্মসমন্বয়' নাম থেকেই নাটকটির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে শুধু 'নববৃন্দাবন' নামেই এটি অধিকতর পরিচিতি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের যোগাযোগের ফলে ধর্মসমন্বয়ের যে আদর্শ কেশবের মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল তারই নাট্যিকরূপ 'নববৃন্দাবন'। নাট্যকার চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও রামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসেছেন—তাঁর ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। (১৫) রামকৃষ্ণ ভাবধারায় নূতন পথের পথিক কেশবচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথ যে নাটক পরিকল্পনা ও রচনা করেছেন তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় চিন্তাই আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ২৯ মার্চ ১৮৮৩ ভক্তদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "কেশব সেনের বাড়ি, ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছিলাম।" ৭ এপ্রিল ১৮৮৩-র দিন পঞ্জীতে শ্রীম উল্লেখ করেছেন "কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন।"

এই দুই দিনের পঞ্জীতেই ২৫ জানুয়ারির অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীম-র সাক্ষ্য থেকে জানা যায় সেদিন তাঁর সঙ্গে "নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন। নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ দিয়াছেন। কেশব পওহারীবাবা সাজিয়াছিলেন।"

সেদিনের অভিনয় সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য :

"কি একটা আনলে ক্রশ (cross) ; আবার জল ছড়াতে লাগলো, বলে শান্তিজল। একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করছে।

"ব্রাহ্মভক্ত—কু-বাবু।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তদের পক্ষে ও-সব সাজাও ভাল নয়। ও সব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে। (১৬)

এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে, এটি ধর্মসম্প্রদায় আয়োজিত এবং সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অভিনীত অধ্যাত্ম নাটক—সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কোনো নাটক নয়। স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা বা অন্য কোনো নাটক দেখার পর শ্রীরামকৃষ্ণ এ ধরনের কোনো মন্তব্য করেন নি। কেশবচন্দ্র ও তাঁর ব্রাহ্ম সমাজের মূলভূমিকার কথা মনে রেখেই নববৃন্দাবন সম্পর্কে এই মন্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন নববৃন্দাবন নাটক দেখতে যান সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ অভিনয় করেছিলেন কিন্তু কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শ্রী-ম সেকথা লেখেন নি। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"স্বামীজী এই নাটকে [নববৃন্দাবন] কোন ভূমিকা নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে চেতনানন্দ লিখেছেন, তিনি যোগীবর অভেদানন্দর ভূমিকায় নামেন। সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে আছে, নরেন্দ্রনাথ একবার ঋত্বিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন (জি. সি. ব্যানার্জির রচনাতেও তা পেয়েছি)। সতীকুমার চেতনানন্দকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিয়েছেন, তিনি লোকমুখে শুনেছেন, স্বামীজী বিবেকের ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত অনুযায়ী স্বামীজী পাহাড়ী-বাবার ভূমিকাতেও নেমেছেন। চেতনানন্দ সৎকথা গ্রন্থ থেকে লাটু মহারাজের অভিনয় দর্শনের স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে আছে স্বামীজী সাধুর (অর্থাৎ অভেদানন্দের) ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সমস্ত উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।" (১৭)

নববৃন্দাবন ১৮৮২ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছুকাল ধরে অভিনীত হয়েছিল এবং স্বামীজী বিভিন্ন অভিনয়ে স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নিশ্চয়—তবে শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন অভিনয় দেখতে যান সেদিন তিনি কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন লাটু মহারাজের একটি স্মৃতিচারণ থেকে তা অস্পষ্টভাবে জানা যায় :

"ব্রাহ্ম সমাজে নাটক হয়েছিল, স্বামীজী শিব সেজেছিলেন। ঠাকুর ঐখানে ছিলেন। স্বামীজীকে ঐ সাজে দেখে নেবে আসতে বললেন। স্বামীজী ইতস্তত করছেন দেখে কেশববাবু বললেন, উনি যখন বলছেন—নেবে এস না।" (১৮)

নববৃন্দাবনে শিবের কোনো ভূমিকা নেই। অনুমান করা যায় যোগীবর অভেদানন্দ চরিত্রকেই লাটু মহারাজ শিব বলে উল্লেখ করেছেন।

ঐদিনেরই (২৯ মার্চ ১৮৮৩) রোজনামচায় কেশবসেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে যাত্রা দেখার কথা আছে :

"আর একদিন নিমাই সন্ন্যাস কেশবের বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলাম। যাত্রাটি কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি।' কেশব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে 'তা হলে ইনি কি হলেন?' আমি বললুম 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।" (১৯)

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়দর্শন সামান্য অবসরবিনোদন মাত্র নয়। নাটকের কল্পিত কাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর চিত্ত প্রসারিত হতে থাকে অনন্তের দিকে কিংবা ডুবে যান তিনি অন্তর্জগতে, তখন উক্ত নাট্য-বিরহিত কথাবার্তা বা ভাবভঙ্গি তাঁকে বিরক্ত বা ক্ষুণ্ণ করে তোলে। একদিনের কথা :

"নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুনতে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বরে। নবীন নিয়োগীর বাড়ী। সেখানকার ছোঁড়াগুলো বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর নিন্দা। ও রকম স্থলে ভাবসম্বরণ হয়ে যায়।" (২০)

কেশবচন্দ্রের বাড়ি নববৃন্দাবন নাটক দর্শন কালে :

"কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটি ৮০০ টাকা মাইনে পায়। সকলে বললে খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত! ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল। এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না। ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, ওটা কি? তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত।" (২১)

শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। দর্শক-আসনের একাংশে যা ঘটছিল তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নাট্যরস।

আর এক যাত্রা দেখার কথা :

"সেবার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে তার দিকে চেয়েছিলাম। আর কারু দিকে তাকাতেও পারলাম না।" (২২)

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, যিনি নীলকণ্ঠ অধিকারী বা নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালা বলে সমধিক পরিচিত, এককালে যাত্রাজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁর জন্ম স্থান বর্ধমান জেলার ধরনীগ্রামে। প্রথমে কিছুকাল গোবিন্দ অধিকারীর দলে থাকার পর সে দল ভেঙে গেলে প্রথম অন্য একটি দলে যোগদান করেন পরে নিজেই স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। ভক্তি রসাত্মক গানে নীলকণ্ঠ সেকালে সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন :

"স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ অধিকারীর যাত্রাও শুনিয়াছি, পালা মানভঞ্জন। স্বয়ং অধিকারী মহাশয় বৃন্দার ভূমিকা অভিনয় করিতেন। তাঁহার সুকণ্ঠে ভক্তিরসাত্মক গভীর ভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীত শুনিয়া বহু সহস্র আধুনিক কৃতবিদ্য দর্শকও আত্মহারা হইয়াছেন এবং অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন।" (২৩)

নীলকণ্ঠ এবং তাঁর যাত্রাগান শ্রীরামকৃষ্ণের কতখানি প্রিয় ছিল তা' বোঝা যায় নীল-

কণ্ঠের গান শোনার জন্য প্রবল ঔৎসুক্য দেখে এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, যদুমল্লিকের বাগানের তত্ত্বাবধায়ক রতন এসেছে নীলকণ্ঠের যাত্রা-গান শোনার আমন্ত্রণ নিয়ে যদুমল্লিকের কাছ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ আগ্রহের সঙ্গেই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, এমন কি সেখানে রাত্রি যাপনের অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছেন :

"আহা! আহা নীলকণ্ঠের কি ভক্তির সহিত গান·····গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়।" (২৭)

পূর্ব থেকেই যে তিনি নীলকণ্ঠের গানের সঙ্গে পরিচিত এবং সে গান শুনেছেন উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়।

৫ অক্টোবর ১৮৮৪ সকালে নবীন নিয়োগীর বাড়ি গানের পর দুপুরে নীলকণ্ঠ এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেই সময় উভয়ের কথোপকথনে যাত্রা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহ এবং তাঁর প্রতি নীলকণ্ঠের শ্রদ্ধার মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন তুমি সকালে অত গাইলে আবাব এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (Honourary)।

নীলকণ্ঠ—কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বুঝেছি, আপনি যা বলবেন।

নীলকণ্ঠ—অমূল্য রতন নিয়ে যাব !!!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে অমূল্যরতন আপনার কাছে। আবার 'ক' য়ে আকার দিলে কি হবে? [পূর্বের একটি কথার উল্লেখ : 'ক'-য়ে আকার দিলে 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে ? 'কা'-এর ওপর আবার আকার দিলে 'কা'-ই থাকে] না হলে তোমার গান অত ভাল লাগে কেন ? রামপ্রসাদ সিদ্ধ তাই তার গান ভাল লাগে।

তোমার গান হবে শুনে আপনি যাচ্ছিলাম—তা নিয়োগীও বলতে এসেছিল।"

নীলকণ্ঠ শুরু করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় একটি গান দিয়ে : 'শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একটি গান শুনতে চেয়েছেন 'আপনার সেই গানটি শুনবো, কল-কাতায় যা শুনেছিলুম।' সম্ভবত এক বৎসর পূর্বে যদুমল্লিকের বাড়ি গানটি শুনে তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছিল, সে-কথা ভক্তদেরও জানিয়েছিলেন। মাষ্টার গানটি স্মরণ করিয়ে দিলেন 'শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায়'। এই গানের সঙ্গে 'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়' ধুয়া ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং নীলকণ্ঠের সঙ্গে নৃত্য শুরু করেছেন। এই গানের পর শ্রীরামকৃষ্ণই গান ধরেছেন 'যাদের হৃদি বলতে নয়ন ঝরে, তারা,

তারা দু'ভাই এসেছে রে !'

আসর ভেঙেছে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সুরের ঘোর কাটে নি—নীলকণ্ঠকে গান শুনিয়েছেন 'গিরি ! গণেশ আমার শুভকারী।' গান শেষ করে "কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন 'আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি এঁদের (যাত্রা-ওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্চি।'

নীলকণ্ঠ—আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হলো।" (২৫)

ধর্মীয় যাত্রা ছাড়াও অন্যভাব ও রসের যাত্রাও দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ২৩ মে ১৮৮৪ ফলহারিণী কালীপূজা উপলক্ষে রাত্রে দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার আসরে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২৪ মে বিদ্যার ভূমিকাভিনেতা এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তার অভিনয়ের প্রশংসা করছেন তিনি :

"তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েছে। কেউ যদি গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি কোন একটা বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করবে।'

বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কী পেলেন তার উত্তর নিজেই দিয়েছেন :

"দেখলাম—তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নাবাযণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।" (২৬)

আমরা দেখি ভক্তদের বাড়ি যখনই উপস্থিত হয়েছেন তখনই কোনো না কোনো সঙ্গীতের ব্যবস্থা হয়েছে। কথামৃতে উল্লিখিত ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত রামদত্ত, অধর সেন, যদু মল্লিক, বলরাম প্রমুখ ভক্তদের গৃহে বহু সঙ্গীতাসর বসেছে। ও-সব আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছেন, মনোহর সাঁইয়ের কীর্তন, বৈরাগীর গান, বৈষ্ণবচরণ কীর্তনীয়ার গান, নরোত্তমের কীর্তন, রাজনারাণের চণ্ডীর গান, কথকতা প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথ, রামলাল প্রমুখ অনেকে প্রায়ই তাঁকে শুনিয়েছেন ভক্তিমূলক সঙ্গীত। এ-সব আসরে তিনি শুধু শ্রোতা নন—ভাবাবেগে প্রায়ই যোগ দিয়েছেন সঙ্গীতে অথবা নৃত্যে।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

(১) সুকণ্ঠের ঈশ্বরদত্ত অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকে সঙ্গীত ও অভিনয় জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকতে চেয়েছেন। তৎকালীন যাত্রাগানে ব্যবহৃত রাগরাগিনী সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও অভিজ্ঞতা তাঁকে রাগসঙ্গীতে নিপুণ করে তুলেছিল। পরবর্তী জীবনেও কতকগুলি রাগরাগিনী তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। [১৩১০ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ প্রেরিত বিবরণীতে দেখা যায় "রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আরত্রিক ও প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য

শেষ করা হইল। জনতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধনী নাম্নী বীণাবাদিকা বীণাহস্তে উপস্থিত হইলেন এবং বীণা বাজাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, যে কয়জন সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলে অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কানাড়া রাগ (**যাহা শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজ শুনিতে ভালবাসিতেন**) বাজাইয়া তিনি সকলকে মোহিত করিলেন।" (২৭)

(২) সঙ্গীত এবং নাট্যাভিনয় তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনেরই অঙ্গস্বরূপ। সাধারণ দর্শক বা শ্রোতার মন নিয়ে তিনি সেগুলি দেখতেন বা শুনতেন না, তাঁব কাছে এ-গুলি ভাবোদ্দীপনা এবং গভীর উপলব্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(৩) লোকচরিত্র ও লোকজীবনকে জানার উপায় রূপেও তিনি সঙ্গীত ও অভিনয়কে গ্রহণ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার প্রকৃষ্টতম পথরূপে অভিনয়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মসাধনা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না বরং লোকজীবনের প্রবহমানধারার সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ এই-সব অনুষ্ঠানের আসর থেকে লাভ করেছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'বাঃ এখান বেশ। এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।" (২৮)

॥ ৩ ॥

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম উপস্থিত হয়ে 'চৈতন্যলীলা' দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গাড়িতে উঠছেন তখন জনৈক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কেমন দেখলেন ?' তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন 'আসল নকল এক দেখলাম।' এ কথার স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে, যা' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার সঙ্গে বিজড়িত। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেব দিক দিয়ে বিচার করলে কথাগুলি অভিনয়ের সপ্রশংস সমালোচনার সংক্ষিপ্ততম নিদর্শন, স্বল্পতম কথায় শিল্পীর উদ্দেশে উচ্চারিত সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। নকলকে আসলরূপে প্রতীত করাই যেখানে অভিনেতার মূল উদ্দেশ্য সেখানে আসল-নকলকে এক করে তোলায় শিল্পীর নৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ প্রকাশ পায়। চৈতন্য-লীলার কলাকুশলীদের এতবড় প্রশংসাবাণী আর কারও কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। কথাগুলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। সেই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণই নানাসময়ে :

"ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্যবস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে

ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।" (২৯)

"শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।"

"যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখা ও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হল।" (৩০)

নাটক, অভিনয়, রূপসজ্জার উপযোগিতা সম্পর্কে এবং মানব মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে এই মন্তব্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্যও যে অভিনয় ও তার বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ তা নানাভাবে বুঝিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পে বা উপদেশে অভিনয়, মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহের রূপকল্প প্রায়ই এসে পড়েছে। থিয়েটার ইত্যাদির উপমা ব্যবহার করে ধর্ম জীবনের অনেক কথা বুঝিয়েছেন—যেসব উপমা একজন শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ব্যবহার করতে পারলেও খুশি হতেন।

ভক্তের প্রশ্ন : ঈশ্বর দর্শন কিরূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ : থিয়েটারে অভিনয় দেখ নাই ? লোক সব পরস্পর কথা বলছে, এমন সময় পর্দা উঠে গেল ; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায় , আর বাহ্যদৃষ্টি থাকে না। এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।

আবার পর্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবাব মানুষ বহির্মুখ হয়।" (৩১)

উপমাটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ :

"থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানারকম গল্প করে—বাড়ির কথা, আপিসের কথা, ইস্কুলের কথা, এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয় সে ঐ নাটকেরই কথা।" (৩২)

এর কয়েকদিন পূর্বে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রহ্লাদচরিত্র নাটক দেখে এসেছেন। ঐকান্তিকতাই যে ঈশ্বরলাভের উপায়, অন্তরের গভীরতা থেকে যেখানে প্রার্থনা উৎসারিত সেখানে যে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের মূল্য সামান্যই—সেই কথা ভক্তদের বোঝাচ্ছেন যাত্রার উপমা দিয়ে :

"যাত্রার দলে দেখো নি, যতক্ষণ খোলে খচমচ শব্দ করছে, 'কৃষ্ণ এস হে' 'কৃষ্ণ এস হে' বলে চিৎকার করে গান করছে, ততক্ষণ কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপও নেই, সে আপনমনে সাজ ঘরে তামাক খাচ্ছে, গল্প করছে কিন্তু যেই সকলে নিস্তব্ধ হল, নারদ অতি মৃদুস্বরে প্রেমভরে—গান ধরলেন—কৃষ্ণ আর থাকতে পারল না, অমনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাড়া-

তাড়ি করে আসরে নেমে পড়লেন। অন্তর রাজ্যেও সেইরূপ জানবে। যতক্ষণ উপাসক 'প্রভু এস হে' বলে চিৎকার করছে ততক্ষণ জেনো প্রভু সেখানে আসেন নি। প্রভু যখন আসবেন উপাসক তখন ভাবে গদগদ হবে তখন আর চিৎকার করতে পারবেন না এবং উপাসক যখন গদগদভাবে ডাকবে প্রভুও তখন বিলম্ব করতে পারবেন না।"(৩৩)

সামঞ্জস্যের উপরই সাংসারিক শান্তি নির্ভর করে, সেই প্রসঙ্গে যাত্রার উপমা :

"ভাইদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। যাত্রাতে দেখ নাই ? চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে যাত্রা ভেঙ্গে যায়।" (৩৪)

বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার চরিত্রাভিনেতাকে ঈশ্বরলাভের পথনির্দেশ :

"তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতিভাব হয়ে যায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মতো হাবভাব সব হয়। সেইরূপ ঈশ্বরকে রাতদিন চিন্তা করলে তারই সত্তা পেয়ে যায়।" (৩৫)

ঈশ্বরের মানবরূপ পরিগ্রহ এবং তাঁর মানবিক আচার আচরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে :

"থিয়েটারে [যে] সাধু সাজে [সে] সাধুর মতো ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মতো ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।"

"একজন বহুরূপী সেজেছে 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, তখন বল্লে 'টাকা দাও'। বাবুরা বললে, 'এই তুমি টাকা নেবে না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ ?' সে বললে 'তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

"তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।" (৩৬)

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে বিজয় গোস্বামীরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য :

"গোবিন্দ অধিকারীর দলে ভাল লোক রাখত না—ভাগ দিতে হবে বলে।" (৩৭)

প্রতিটি সাদৃশ্যকল্পনাই সহজ স্বচ্ছন্দ। অভিনয়ের সাজঘর থেকে প্রেক্ষাগৃহ (বা আসর) পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। অভিনেতা থেকে ঐক্যতানবাদনের দল—সমস্ত details যেন তাঁর নখ দর্পণে।

॥ ৪ ॥

সাধারণ রঙ্গালয় যখন ভদ্রজনের চোখে নরকের নামান্তর তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে রঙ্গজগৎ-কে তিনি ধন্য করেছেন, এমন আত্মম্ভরী চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো করেন নি।

সে যুগে থিয়েটারের গান ভদ্রসমাজে অচল—তিনি কিন্তু সহজভাবেই সেই-গানকে গ্রহণ করেছেন। অন্য পাঁচটা ভক্তিমূলক গানের মতো থিয়েটার যাত্রার গানেরও সমাদর করেছেন—সে গান তাঁর ভাব উদ্দীপনার সহায়ক হয়েছে। চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব চরিতের গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এক শিষ্যা গঙ্গুর মা'র বাড়ি গেছেন—সেখানে কনসার্টের আখড়া। ছেলেরা তাঁকে গান শোনাচ্ছে—গিরিশের নাটকের গান 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী'—শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্রশংস মন্তব্য "আহা কি গান! কেমন বেহালা, কেমন বাজনা!" (৩৮)

বলরাম বসুর বাড়ি গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতিতে চৈতন্যলীলার গান শুনছেন 'কেশব কুরু করুণা দীনে'। গান শুনে বলছেন :

("গিরিশের প্রতি) আহা, বেশ গানটি! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

"একজন ভক্ত—হাঁ উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(গিরিশের প্রতি) এ গানটি খুব উতরেছে।"

তাঁর নির্দেশে গায়ক নিতাইয়ের গান ধরেছে, 'কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,' অবশেষে ধরেছে গৌরাঙ্গের গান 'কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ…" (৩৯)

শ্যামপুকুরে কালীপূজার দিনের বর্ণনা :

"ডাক্তার গিরিশকে বলিতেছেন 'তোমার ঐ গানটি বেশ—বীণের গান—বুদ্ধচরিতের। ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন।

"আমার এই সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার।"

এ গান শেষ করে আবার বুদ্ধদেব চরিতের গান ধরলেন দুজনে :

জুড়াইতে চাই কোথা জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।"

এরপর একে একে চলল চৈতন্যলীলার গান :

'প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই,' 'কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।' (৪০)

থিয়েটারের গান! যে থিয়েটার তখন রুচিবাগীশ উচ্চসমাজের কাছে অপাঙক্তেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই থিয়েটারের গান শুনছেন মুগ্ধচিত্তে—ভক্তদেরও শোনাচ্ছেন। আজন্ম নাট্যরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ এই রসের টানেই একদিন গিয়ে পৌঁছলেন গিরিশ ঘোষের কাছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গিরিশ-সংবাদ

॥ ১ ॥

"গিরিশ ঘোষ ? ওঃ নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই ? সে ত কেরানীগিরি করে। সেক্ষপীয়র আওড়াবে কি করে ? কলাপাতার প্রকাণ্ড ঠোঙ্গায় মুড়ে সাজা পান নিয়ে তাকে রোজ আপিসে যেতে দেখি···। সেক্ষপীয়রের সে কি বোঝে ?" (১)

প্রশ্ন করেছিলেন বঙ্গরঙ্গমঞ্চেরই এক শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক অমৃতলাল বসু। কালক্রমে সেই 'স্নেহের অনুজশিষ্য' অমৃতলালই 'নাট্যরবি-কবি বিশ্বে' বলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। (২)

হাঁ, এই গিরিশ ঘোষই "Father of the native Stage"—আর এক নট-নাট্যকার-পরিচালক অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনি :

"নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ ইহার অন্ন নাটক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহার মজ্জায়-মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the native Stage —ইহার খুড়াজ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবকশূন্য বে-ওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধুলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃতপানে বাঙ্গালায় নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গালার নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।" (৩)

সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি বলেছিলেন "কেবল তাঁহারই কৃপায় নিরক্ষর নির্বোধ আমিও অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি।" (৪)

গিরিশের তিরোভাবের পরে টাউন হলের স্মৃতিসভা। সে সভায় দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিতদের ভিড়। কিন্তু যাঁরা গিরিশচন্দ্রের নিত্যসঙ্গী—সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন চিরদিন, সেইসব অভিনেতা এবং বিশেষ করে অভিনেত্রীদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে ব্যবস্থা হল স্টার থিয়েটারে—সভাপতি অমরেন্দ্র-

নাথ দত্ত। উদ্যোক্তা সমাজবিতাড়িতা অভিনেত্রীর দল—বক্তাও তারাই।

"আমরা পতিতা বটে—সমাজবর্জিতা বটে—কিন্তু আমরা মানুষ। আপনারা না মনে করিতে পারেন কিন্তু সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আপনাদের ন্যায় আমাদেরও আছে"। আর্ত ব্যাকুল ভাষায় বললেন সুশীলাসুন্দরী "তিনি মহাপুরুষ ছিলেন—তিনি আমাদের গুরু, পিতা—শিক্ষাদাতা—তিনি আমাদের হৃদয়ে সামান্য একটু জ্ঞানালোক দিয়াছেন, তিনি আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রমলব্ধ অর্থে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন।" (৪)

আরও অনেকের সঙ্গে নরীসুন্দরী "সেই ধর্মগুরুর দেবচরণে অবনতমস্তকে কোটী কোটী প্রণাম" জানালেন। (৫)

টাউন হলের সাধারণ স্মৃতিসভায় বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল বললেন :

"আমাব মনে হয়—সংসাবের ধূলায়-কাদায় মাখান এই কবি আজকালকার কয়েকজন ব্যোমচারী উড্ডীয়মান কবির ন্যায়—যাঁহারা বহু উচ্চে আকাশে ভাবসংগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে সংসারের লোকগণের উপর প্রতিভার ধারা বর্ষণ কবেন—সাধারণ্যে কবিত্বশক্তির লীলাচাতুর্য প্রকাশ কবেন নাই। গিরিশচন্দ্র এই সংসারের মানুষ—সংসারের ধূলাখেলায় মলিন হইয়াও উন্নতি-সোপানে দিন দিন আরোহণ কবিয়া শেষে বহু উচ্চে উঠিয়াছিলেন এবং উন্নতির চরমসীমায় তাঁহার সেই সংসার ধূলি রাশি সুসংস্কৃত হইয়া সুবর্ণ-কণা বৃষ্টির ন্যায় সংসাববাসিগণেব উপর পতিত হইয়াছিল।" (৬)

'সাহিত্য' সম্পাদক সুবেশ সমাজপতি তাঁর পঠিত প্রবন্ধে বললেন :

"বাণীর বরপুত্র গিবিশের প্রতিভা কপালকুণ্ডলার ন্যায় স্বভাবসুন্দরীর, তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গেব মুকুর, জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাই গিরিশচন্দ্র অনায়াসে অবলীলায় বিশাল পটে স্বর্গের মর্ত্যের ও নরকের,—দেব, মানব ও দানবের বহিঃ প্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।...

"আদি কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের সৃষ্ট চরিত্রে যে প্রতিভা নূতনতার ও মৌলিকতার আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, সাহস ও সাফল্যের আলোচনা করিবার, পরিচয় দিবার শক্তি আমাদের নাই। ভবিষ্যতে কোনও সৌভাগ্যবান শক্তিশালী সমালোচক সে সাধনায় সিদ্ধ হইবেন।" (৭)

ক'বছর পরে বেলুড় মঠে গিরিশ-জন্মোৎসব সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে-উক্তি করেছিলেন, তা বহু উদ্ধৃত, বহু পরিচিত। এ-কালের কোনো কোনো সমালোচক এই উক্তির অংশবিশেষকে অতি-উচ্ছ্বাস বলে মনে করেন। তবে সে যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে দেশবন্ধুর উক্তিটি দেখে নিতে পারি :

"তিন বৎসর পূর্বে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে স্বরাজ ছাড়া কোনো কথা কহিব না, স্বরাজের কার্য ছাড়া অন্য কোনো কার্য করিব না, স্বরাজের চিন্তা ছাড়া অন্য আর কোনো চিন্তা করিব না, স্বরাজের সভা ছাড়া অন্য কোনো সভায় যোগদান করিব না। তবে যদি বলেন, আজ কেন এই সভায় যোগদান করিলাম। ইহার উত্তর—স্বরাজ কাহাকে বলে ? স্ব-রাজ নিজের মূর্তি যাহাতে বিকাশ পায়—তাহাই স্বরাজ।···মহাকবি বলি কাকে ?—যাঁর কবিতায়—যাঁর রচনায়—জাতীয়তা আছে, ধর্ম আছে—তাহাকেই মহাকবি বলি। চণ্ডীদাস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত আমি আমার নারায়ণ পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান ও পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায, পরে রামপ্রসাদে আবার তাহা জাগিযা উঠে—আবার এই গিরিশ ঘোষে তাহা জাগিযা উঠিযাছিল। গিরিশবাবুর কবিতায—গানে—আমরা জাতীযতা পাই—প্রাণ পাই—দেশেব একটা স্বরূপ মূর্তি দেখিতে পাই,—ইহাই তাঁহাব রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কবিতা যাচাই করিতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, জার্মানিতে যাইতে হইবে না। তাঁহার কবিতায বিলাতী ভাব নাই, ভাব ধাব করিতে তাঁহাকে বিদেশে যাইতে হয নাই। গিরিশচন্দ্র খাঁটি দেশী কবি, তিনি দেশীয় ভাবে দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন—দেশের প্রাণের কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মহাকবি—দেশেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এমন একদিন আসিবে, যেদিন সমস্ত জগৎ ভারতেব দ্বারে আসিযা নতজানু হইযা ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক আলোচনা করিবে, তখন গিবিশচন্দ্র স্বরূপ-মূর্তিতে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন এবং তখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন—গিরিশচন্দ্র কত বড।" (৮)

গিরিশ-প্রসঙ্গে ভাবোচ্ছ্বাসের অপরাধ কেবল বাঙালী চিত্তরঞ্জনের নয়। এই বক্তৃতার বেশ কয়েক বছর আগে এক বিদেশী মহিলা শ্রীমতী গ্রে হ্যালক বেলুড় মঠের এক উৎসবে এসেছিলেন—সঙ্গে আমেরিকাবাসী এক চিকিৎসক। উৎসব অনুষ্ঠানেব বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করতে করতে অকস্মাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটি গাছের তলায় কিছু মানুষের জটলা—কেন্দ্রে রয়েছেন একজন যাঁকে দেখলে সহজেই সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বলে চিনতে ভুল হয় না। তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে শ্রীমতী হ্যালক জানতে পারলেন ইনিই বাঙালী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তারপর পরিচয় হল তাঁর সঙ্গে। শ্রীমতী হ্যালক লিখেছেন :

"দূরদেশ পর্যটককে প্রায়শই প্রশ্ন করা হয়, সেখানকার কোন জিনিষটি তাঁর মনের ওপর সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করেছে ! আমার দেখা ভারতবর্ষে—যিনি আমাকে

সর্বাপেক্ষা অধিক অভিভূত করেছেন, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। আমি জীবনে যাঁদের সাক্ষাৎলাভ করেছি তাঁদের মধ্যে তিনিই মহত্তম। তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনুধাবন করতে সাহায্য করেছেন যে, যা ঘটে তার মূল্য সামান্যই কিন্তু যা ঘটে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যই অপরিসীম।" (৯)

শ্রীমতী হ্যালক শুধু শিক্ষাদাতা গিরিশচন্দ্র সম্পর্কেই আপন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নি। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন কানে হয়ত স্পর্ধার মতো শোনাবে :

"গত ১৯১২—ফেব্রুয়ারিতে লোকান্তরিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একজন হিন্দু শিষ্য এবং বেদান্তের প্রবক্তা। এই বেদান্তের ধর্ম ও দর্শন ভারতবর্ষের মতই সুপ্রাচীন। তাঁব চিত্তাকর্ষক নাটকে তিনি এই বেদান্তকেই রূপ দিয়েছেন। আমি যতদূব জানি, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের কোনো [ইংরেজি] অনুবাদ হয় নি। আমার বিশ্বাস, অনুবাদ হলে তাঁর নাম 'টেগোরে'ব চেযেও অধিকতর সুপরিচিত হত।" (১০)

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ক্রাইন আই. সি. এস. বডলাটের কাউন্সিলে C.I.E খেতাবেব জন্যে গিরিশের নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ক্রাইন তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন How little the world knows of its greatest men' ! (১১)

কিন্তু এ-সব অনেক পরের কথা। বুক-কীপার গিরিশচন্দ্র যিনি নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করবেন শুনে অমৃতলাল হতাশ হয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু সংবাদ প্রয়োজন। ১৮৭২ সাল এবং তাব পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্থাপনা ও পুষ্টিসাধনে কি ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন—সমসাময়িক দৃষ্টিতে তাঁব কি মূল্য নিরূপিত হয়েছিল সেটা অবশ্যই প্রথম দেখা উচিত। আমাদের পববর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য কিছু ঐতিহাসিক তথ্যসমাবেশেব প্রয়োজন আছে।

॥ ২ ॥

নবগোপাল মিত্রের পরামর্শে বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের নাম পালটে হল ন্যাশন্যাল থিয়েটার। বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের সঙ্গে গিরিশের যোগ অনেকদিনের। এবার টিকিট বিক্রী করে অভিনয় প্রদর্শনের প্রস্তাব উঠল। গিরিশচন্দ্র এর ঘোর বিরোধী—নামে ন্যাশান্যাল থিয়েটার কিন্তু জাতীয় নাট্যশালা হবার যোগ্যতা কিছুমাত্র নেই সুতরাং টিকিট বিক্রী করলে বিদেশীদের কাছে যেমন হাস্যাস্পদ হতে হবে, তেমনি দেশের মানুষ যখন পয়সা দিয়ে অভিনয় দেখতে আসবে, তারাও ছেড়ে

কথা কইবে না। তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়িতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হল ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২। গিরিশচন্দ্র দল ছাড়লেন—ন্যাশান্যাল থিয়েটারের কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক গানও রচনা করলেন। একমাস পরেই নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গশালায় শুরু হল দলাদলি—ভাঙাভাঙি। দল ভাঙল—কিন্তু থিয়েটার বন্ধ হল না। মাস তিনেক পরে যখন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' শুরু হল তখন দেখি গিরিশ-চন্দ্র ন্যাশান্যালে যোগদান করেছেন। হ্যাণ্ডবিলে-পোস্টারে গিরিশের নাম ঘোষিত হল 'বিশিষ্ট অপেশাদার অভিনেতা, (A distinguished amateur) বলে। গিরিশ-চন্দ্র তখনো অফিসে কাজ করেন কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যে অভিনেতা হিসাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটারে তাঁকে যে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—উক্ত বিজ্ঞাপন থেকেই তা বোঝা যায়। নিজ প্রতিভার অধিকারেই তিনি সাধারণ রঙ্গশালায় প্রবেশ মাত্রে শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যশিক্ষক। ১৮৭৩ থেকে ১৯১২ সালে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে, প্রায় চল্লিশ বৎসর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তিনিই প্রাণপুরুষ।

সঙ্গীতকার, নট ও নাট্যশিক্ষক গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করলেন বটে কিন্তু দেখা গেল মঞ্চকে দেবার মতো নাটকের পুঁজি বাংলায় নেই। অভিনয়ের উপযোগী যে ক'খানা নাটক আছে, তা হাতের মুঠোয় ধরে—অল্পদিনের মধ্যে সে-সব নাটকের অভিনয় একে একে শেষ হয়ে গেল। এবার গিরিশ নতুন দায় ঘাড়ে তুলে নিলেন—শুরু করলেন উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে। সেবার কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপের অভিনয় আসরে এক চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে দিয়ে গিরিশের প্রতিভার একটা দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ১৮৭৩, ১০ মে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে (ন্যাশন্যাল থিয়েটার তখন সেইখানে) বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার অভিনয়। সাজ পোষাক রঙ-চঙ সব সাঙ্গ কিন্তু নাটকের পাণ্ডুলিপি উধাও। কিন্তু সহজে দমবার পাত্র গিরিশচন্দ্র নন—রাজবাড়ির গ্রন্থাগার থেকে তখনই উপন্যাসখানা আনিয়ে নিয়ে নিজে নিলেন প্রম্প-টারের ভূমিকা। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে নাট্যরূপ দিয়ে চললেন। নির্বিঘ্নে অভিনয় শেষ হল।

বাগবাজারের ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়ে নতুন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৭৪ সালে। গিরিশের তখন কোনো রঙ্গালয়ের সঙ্গেই বিশেষ যোগ নেই। গ্রেট ন্যাশন্যালের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্কিমের 'মৃণালিনী-'র নাট্যরূপ দিলেন, নিজে 'পশুপতি'র ভূমিকাও গ্রহণ করলেন—প্রথম অভিনয় হল ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪। এই গ্রেট ন্যাশন্যালের মালিকানা শেষ পর্যন্ত এলো গিরিশের হাতে ১৮৭৭ জুলাই মাসে। ঐ বছর গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশন্যালের নাম পালটে রাখলেন ন্যাশন্যাল থিয়েটার। এখানে তাঁর প্রথম মৌলিক গীতিনাট্য 'আগমনী' অভিনীত হল ঐ বছর সেপ্টেম্বর

মাসে। সাফল্যের স্বাদ পেয়ে চারদিন পরেই আবার নতুন গীতিনাট্য 'অকাল বোধন' মঞ্চস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর থিয়েটারের মালিকানার আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মাত্র মাসকয়েক পরেই ভাই অতুলকৃষ্ণের পরামর্শে তিনি মালিকানা পরিত্যাগ করলেন শ্যালক দ্বারকানাথ দেবের অনুকূলে। বাকী জীবনে আর কখনও থিয়েটারের মালিক হন নি।

প্রচলিত নাটক শেষ—প্রখ্যাত উপন্যাসগুলোর নাট্যরূপও নিঃশেষিত। মাঝে মাঝে দু'একখানা গীতিনাট্য লিখে মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও বাতুলতা। কাহিনী কাব্যের নাট্যরূপ দিয়ে কিছুকাল চলল—'মেঘনাদ বধ কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধের'-ও নাট্যরূপ দেওয়া হয়ে গেছে। পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় দেখে কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন "আপনি ধারাপাতকেও নাটক করতে পারেন।" কিন্তু ধারাপাত পর্যন্ত পৌঁছলেও নাটকের অভাব মিটত না। ১৮৮১ পর্যন্ত এই ভাবেই চলল—কিন্তু স্থায়ী সমাধানের পথ কিছু পাওয়া গেল না। নতুন নাট্যকার চাই, যিনি মঞ্চ-গরুড়ের ক্ষুধা মেটাতে পারবেন, যিনি কবি-যশের দিকে না তাকিয়ে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে আত্মাহুতি দিতে পারবেন মঞ্চ দেবতার কাছে। কিন্তু কোথায় সেই স্বার্থত্যাগী প্রতিভা যিনি বাংলাদেশের নাট্যশিল্পকে বাঁচাবার জন্যে নিজের কথা ভুলতে পারবেন? যিনি মাত্র একরাত্রের মধ্যে একটি নাটক লিখে দিতে পারবেন? অর্থসঞ্চয় দূরে থাক—যিনি আপন প্রাপ্য বোনাসের ২০ হাজার টাকা থেকে ১৬ হাজার টাকা হাসিমুখে রঙ্গমঞ্চ তৈরীর জন্যে দান করতে পারবেন?

সে একমাত্র গিরিশচন্দ্র। প্রতাপচাঁদ জহুরী ন্যাশন্যাল নিলামে কিনে নিলেন ১৮৮০ সালে। গিরিশ তখন পার্কার কোম্পানীতে ১৫০ টাকা মাস মাইনের বুক কীপার। সে চাকরী প্রতাপচাঁদের অনুরোধে এক কথায় ছেড়ে দিয়ে ১০০ টাকা মাইনেতে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করলেন নট—নাট্যকার নাট্যাধ্যক্ষরূপে। অনিশ্চয়তার পথে শুরু হল তাঁর যাত্রা। ১৮৮১ সালের ১ জানুয়ারিতে প্রতাপচাঁদের ন্যাশন্যাল খোলা হল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' নাটক নিয়ে। এই ১৮৮১ সালেই নাটক ও গীতিনাট্য মিলিয়ে সর্বশুদ্ধ ৮ খানি স্ব-রচনা গিরিশ উপহার দিলেন বাংলাদেশের দর্শককে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গিরিশের প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক 'আনন্দ রহো'-র পরেই রামায়ণ মহাভারত আশ্রিত তিনখানি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক—রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ। মাত্র পাঁচমাসে তিনখানি নাটক রচিত হয়ে মঞ্চস্থ হল।

এই চট-জলদি নাটক লিখেও সুধীমণ্ডলীর কাছে তিনি খ্যাতি কম পান নি।

'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধে'র সমালোচনায় ভারতী (১২৮৮ মাঘ) পত্রিকা লিখেছে

(অমরেন্দ্রনাথ রায়ের মতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমালোচনা লিখেছিলেন) :

"কি তাঁহার 'রাবণবধ' আর কি তাঁহার 'অভিমন্যুবধ'—উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। একখণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক প্রবেশই করিতে পারে না কিন্তু একখণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নহে, আবার স্ফাটিক্যগুণে সেই কিরণ সহস্রবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক খণ্ড—এবং তাঁহার 'অভিমন্যুবধ' ও 'রাবণবধ' প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মি-পুঞ্জ।"

ঐ 'ভারতী'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল (ফাল্গুন ১২৮৮) 'সীতার বনবাসে'র সমালোচনা :

"গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেকস্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক রচনার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন কেন, এ প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন "ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশ-বাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশঃ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। **দেখিতে দেখিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা নাট্য-সাহিত্য একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্যসেবার অন্যপন্থা অবলম্বন করিলাম।**" (১২)

গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত নাট্যসংলাপের উপযোগী অমিত্রাক্ষর ছন্দ (যা সাধারণভাবে 'গৈরিশ-ছন্দ' নামে পরিচিত) সম্পর্কে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য (১২৮৮, মাঘ) :

"আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

ন্যাশন্যাল থিয়েটার থেকে গ্রেট ন্যাশন্যাল, হিন্দু ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটার—একে একে অনেকগুলি থিয়েটার স্থাপিত হয়েছে। কালক্রমে অনেকগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে

কিন্তু একাধিক মঞ্চে অভিনয় ক্রমশঃ স্থায়ী হয়েছে। তখন প্রচলিত সকল মঞ্চেরই লক্ষ্য গিরিশচন্দ্র। একই সঙ্গে একাধিক মঞ্চে তাঁর নাটকের অভিনয় চলেছে—এমন কি একই নাটকের একসঙ্গে একাধিক মঞ্চে অভিনয়ও হয়েছে। গিরিশের প্রভাব, তার নাটকের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়রীতির মধ্যেও কলকাতা শহরকে আচ্ছন্ন করেছে।

ক্লাসিক থিয়েটারের অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে গিরিশের সামান্য কারণে মনোমালিন্য ঘটে গেল (এপ্রিল, ১৯০০)। গিরিশ ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় চলে গেলেন। শুরু হল হ্যাণ্ডবিল, পোস্টারে লড়াই। গিরিশচন্দ্রকে নানাভাবে অপদস্থ করলেন অমরেন্দ্রনাথ হ্যাণ্ডবিলের তীব্র কটু ভাষায়। সেই অমরেন্দ্রনাথই এসেছেন কয়েকমাস পরে (নভেম্বর) গিরিশচন্দ্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে—তাঁকে ক্লাসিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ক্লাসিকের পোস্টারে অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন :

"নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে নটকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্তবাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদেব সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটি স্থায়ী বঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই—গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত। তাহাব মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুব সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম।—বডই সুখের বিষয়, সমস্ত মালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার স্নেহময় কোলে আবাব তিনি টানিয়া লইয়াছেন।"(১৩)

স্টার ও মিনার্ভায় ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে—দু'জায়গাতেই অভিনীত হচ্ছে গিরিশ-চন্দ্রের 'প্রফুল্ল'। অমৃত মিত্র স্টারে যোগেশের ভূমিকায় নামছেন—এই ভূমিকায় তাঁর খুব নাম। গিরিশচন্দ্র নিজেকে উজাড করে দিয়ে অমৃত মিত্রকে শিখিয়েছেন। মিনার্ভায় বাধ্য হয়ে নামতে হল স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে। স্টার থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে চ্যালেঞ্জের স্পর্ধা "তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়!" কিন্তু সে স্পর্ধার মধ্যেও স্বীকৃতির শিষ্টতা—গিরিশ, তুমিই শিখিয়েছ!

একটা বিচিত্র ঘটনার কথা বলি। একবার কবি নবীনচন্দ্র সেনের রাণাঘাটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে গেছেন। নবীনচন্দ্রের পুত্র নির্মল রবীন্দ্রনাথকে একখানি গান গেয়ে শোনাল। নবীনচন্দ্র গিরিশের গুণগ্রাহী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন "কেমন? গানটি বড সুন্দর না?" রবীন্দ্রনাথ সরাসরি উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন "গানটি কার?" সোৎসাহে নবীনচন্দ্র বললেন "গিরিশের"। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বললেন "শুনেছি লোকটা বেশ গান বাঁধতে পারে।"

ঘটনাটি স্বয়ং নবীনচন্দ্র একটি চিঠিতে গিরিশকে জানিয়ে ছিলেন। (১৪)

গিরিশ-প্রতিভা যখন সারা বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত, এমন কি ঠাকুর-বাড়ির অঙ্গন থেকেও

স্বীকৃতির নানা স্বর শোনা যাচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথ শুধু গানের বাঁধনদার হিসাবেই তাঁর নাম শুনেছেন, এটা আশ্চর্যজনক বলে বোধহয়। আর গিরিশচন্দ্রের গান তো তখন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। যাঁদের গিরিশের নাটক দেখারও সুযোগ হয় নি তারাও গুন গুন করে "কেশব কুরু করুণা দীনে" কিংবা "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে" কিংবা "রাম রহিম না যুদা করো ভাই"। বাংলা দেশের পল্লীতে ভিখারীরা পর্যন্ত এ-সব গান গেয়ে ভিক্ষা করেছে। রামপ্রসাদের পর লোকজীবনের ওপর এতোখানি প্রভাব বিস্তার খুব কম কবিই তখন করতে পেরেছেন। অথচ তখনো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে গ্রামোফোন চালু হয় নি, ছায়াচিত্র-রেডিও তো দূর অস্ত। পরবর্তীকালেও অবশ্য গ্রামোফোনে, ছায়াচিত্রে গিরিশের গান অপাঙ্‌ক্তেয় থেকে গেছে। কেন, সে-ইতিহাস সুন্দর নয়। তা অনেকটা খুলে লিখেছেন একালের এক প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র—"উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারা ভারি আশ্চর্য। এ যুগে এত তর্কবিতর্ক, সূক্ষ্ম বিচার হয়েছে, কিন্তু ফলে হলো কি? জীবন ধারায় একটা কৃত্রিমতা এসে গেল। খুব একটা সাজানো গোছানো ব্যাপার যেন সমাজের উন্নত শ্রেণীকে কেমন আলাদা করে রাখল। কথাবার্তা, চাল-চলন, গানবাজনা সবেতেই একটা নির্দিষ্ট ফরমুলা কাজ করেছে। সাধারণ আর পাঁচ-জন থেকে গা বাঁচিয়ে চলাটাই যেন ছিল সুস্থ জীবনের লক্ষ্য।" কিন্তু তা সত্ত্বেও যাদের থেকে গা বাঁচিয়ে চলার প্রয়াস, তাদের প্রভাব এড়ানো যায় নি কিন্তু তার মধ্যে রয়ে গেছে এক দুঃখজনক ইতিহাস। শ্রীমিত্র লিখেছেন,

"এই প্রচলিত সঙ্গীতের মধ্যেই তো আসল জিনিষ ছিল।...সুতরাং কৃতবিদ্য সমাজ একটি চমৎকার কাজ করলেন (এঁরা অবশ্য নানাক্ষেত্রে এ অভ্যাসটি বজায় রেখেছেন) অর্থাৎ সেই সব গানের সুর এবং সৌষ্ঠব নিজেদের গানে এনে বসিয়ে দিলেন এবং ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ করলেন না।...অনেক ভাল ভাল উচ্চাঙ্গ কাব্যসঙ্গীত ব্যবচ্ছেদ করলে বেরিয়ে যাবে সেই নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, দাশরথি রায়, রামবসু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি।" (১৫)

গিরিশচন্দ্র শুধু গানের বাঁধনদার ছিলেন না—নাটকের ভাব-অনুযায়ী তাঁর গানের সুর সৃষ্টিতে তাঁর নিজের হাত ছিল অনেকখানি। নিজে গান গাইতেও পারতেন (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে তাঁর গান গাওয়ার কথা উল্লেখ করেছি)। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র পরবর্তীকালের সঙ্গীত শিল্পীদের ওপর গিরিশের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "গিরিশচন্দ্রের গানে প্রযুক্ত এই সব নানারীতির একটা খুব বড় প্রভাব আমাদের অন্যান্য গানে পড়েছে এবং সেটা কেবলমাত্র অপরাপর নাটকের গানেই নয় সাধারণভাবেই আমাদের সঙ্গীতের ওপর পড়েছে। সেকালের ওস্তাদরাও

গিরিশচন্দ্রের গান গাইতেন এবং নাটকের জন্য যেটুকু বাঁচিয়ে সুর দেওয়া হয়েছিল তাদের গানে তারা সেটুকু ঢেলে দিতেন। এইভাবে গিরিশচন্দ্রের বহু গান রীতিমতো ওস্তাদি সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল।"(১৬)

এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করা যায় যে রঙ্গালয় থেকে যাঁরা গা বাঁচিয়ে দূরে থেকেছেন তাঁরাও গিরিশচন্দ্রকে অস্বীকার করতে পারেন নি—শুধু রঙ্গালয় নয়, সমগ্র রঙ্গজগতের ওপরই তাঁর প্রভুত্ব।

অপর একটি প্রবন্ধে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন : "গিরিশচন্দ্রের গানে এমন বহু সুর আছে, যাতে কথা পালটে দিলে রবীন্দ্র সঙ্গীতেব সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখা যাবে।" এর প্রকৃত কাবণ কি, সে সম্পর্কে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি—অভিমত প্রকাশের ভাব ছেড়ে দিয়েছেন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদের হাতে: "অবশ্য এ লেখকের জানা নেই গিবিশচন্দ্রের গান রবীন্দ্রনাথ শুনতেন কিনা এবং তাঁর কোনও কোনও গান তাঁর ভালো লেগেছিল কিনা। রবীন্দ্রজীবনী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরাই এ সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।"(১৭)

এ-যুগে আমরা গিরিশ-প্রতিভা বিচার করতে বসে অনেক সময় তাঁকে তাঁর সময়ের চৌহদ্দি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিই। দর্শকের রুচির কাছে তাঁর "হাত-পা বাঁধা" ছিল, সেজন্য গিরিশের নিজেরই কিছু কম ক্ষোভ ছিল না। যে দর্শক সমাজ বাংলাব রঙ্গমঞ্চের শৈশবে আনুকূল্য দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদের মানসিকগঠন নাটক বিচারের বাইরে থাকা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার নাটকের যদি অভিনয় হয় তো হইতে পারে, না হয় তো অভিনয়ের পোড়া কপাল।"(১৮) কিন্তু এ-কথাটা একান্তই রবীন্দ্রনাথের, নচেৎ নাটকের প্রধান স্বীকৃত গুণ তার অভিনয়তা, দর্শক ও অভিনেতা উভয়ের যোগে নাটকের সিদ্ধি। যেখানে মঞ্চের স্থায়িত্বেব কথা চিন্তা করে গিরিশ নাটক রচনা শুরু করেছেন সেখানে রাতারাতি দর্শককে তাচ্ছিল্য করলে রঙ্গমঞ্চেরই কপাল পুড়ত। গিরিশচন্দ্রকে "যাত্রা, কথকতা, হাফ-আখড়াইয়ের শ্রোতাদের দেখে নাটক লিখতে হতো।"(১৯) কারণ রঙ্গমঞ্চে তাদের আগমনের সুনিশ্চিতিতেই ছিল নাট্যকারের বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়। নাট্যকারের লেখনী নিয়ন্ত্রণ করত যে দর্শক, তারা কেমন ছিল?

মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হল, রাত ১টার পর আর অভিনয় চলবে না। কিন্তু বাঙালী দর্শক সারাদিন অফিস-আদালত সেরে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ৯'টার সময় এসে পৌছবেন থিয়েটারে। মাত্র চার ঘণ্টায়। (তখনো ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ বা সময় সংক্ষেপে আধুনিক কলাকৌশল জয়লাভ করে নি) কাহিনী বুঝে নাট্যরস গ্রহণের ক্ষমতা তখনকার দর্শকের ছিল না। গিরিশের মুখেই শুনি তাঁর সমস্যার কথা:

"পণ্ডিত প্রবর [সমালোচকশ্রেণী] বুঝেন না যে বাঙ্গালী দর্শকের জন্য বাঙ্গালা নাটক লিখিত হইয়াছে। [তাঁহারা] শেক্সপিয়রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু বুঝেন না যে, যদি শেক্সপিয়ার স্বয়ং বাঙ্গালায় আসিয়া নাটক লেখেন তাহা বাঙ্গালী দর্শকের বোধগম্য হইবে না। সমালোচক না হয় বুঝিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর দর্শক তাহা পয়সা দিয়া দেখিতে আসিবে না। আমার এ কথাটি আনুমাণিক নয়। যখন মিনার্ভায় ম্যাকবেথ অভিনীত হয়, দুই চারি রজনীর পর রঙ্গালয় প্রায় দর্শকশূন্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম যে সকল দর্শক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাদের সাক্ষাতে বলেন 'আমি প্রায় দশ বৎসর থিয়েটার দেখিতেছি কিন্তু এমন ঠকন কখনও ঠকি নাই।' তাহার পর 'আবুহোসেন' হওয়ায় অনেকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।"(২০)

মাত্র চার ঘণ্টায় নাট্যকাহিনী দর্শকদের বুঝিযে দেওয়া কতখানি দুঃসাধ্য ছিল তা গিরিশচন্দ্র জানতেন বলেই তাঁকে মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরোধিতা করতে হয়েছে। বিদেশী দর্শকের কাছে সূক্ষ্ম সংযত শিল্পরূপ সহজে গ্রহণীয় কিন্তু বাঙ্গালী দর্শকের মন ততখানি গড়ে ওঠে নি—এ সত্য গিরিশচন্দ্রকে ঠেকে শিখতে হয়েছে। ম্যাকবেথ অনুবাদ ও অভিনয়ের (যা সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন কবেছিল) 'পাপের আবুহোসেনী প্রায়শ্চিত্ত' করতে হয়েছে।

কখনো-কখনো পরবর্তী নাটক পর্যন্ত অপেক্ষা না করে পরবর্তী অভিনয়েই নতুন সংযোজনারও প্রয়োজন দেখা গেছে—দর্শকের অভিমত অনুসারে। 'রাবণ-বধে'র একটি দৃশ্যে, রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষার আদেশ দিয়েছেন, লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত কবে রামচন্দ্রকে সংবাদ দিচ্ছেন—পাশে দাঁড়িযে আছেন সীতা। লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ করছেন না দেখে সীতা লক্ষ্মণকে প্রশ্ন করলেন :

"কেন রে লক্ষ্মণ, তুমি না সম্ভাষ মোরে ?

উত্তরে লক্ষ্মণ নত নেত্রে উত্তর দিলেন :

"জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে লক্ষ্মণের বেদনা এবং নাটকীয় সংযম উভয়ই রক্ষিত কিন্তু দর্শকেব কাছে তা' গ্রহণ-যোগ্য হল না।

সমালোচনার গুঞ্জন গিরিশের কানে পৌঁছল। বাধ্য হয়ে পরবর্তী অভিনয়ে তিনি যোগ করলেন লক্ষ্মণের আঠারো পঙ্‌ক্তির একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি। তৃপ্ত দর্শকের করতালিতে সেদিন রঙ্গমঞ্চ মুখরিত। (২১)

এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই গিরিশকে একটা আপোষের পথ ধরে চলতে হয়েছে। মঞ্চকে গৌরবময় মৃত্যুর সুযোগ না দিয়ে তাকে দীর্ঘজীবী করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য সেখানে এই বোঝাপড়ার মনোভাব ভিন্ন আর পথ ছিল না।

আমরা এক শতাব্দী দূরে বসে গিরিশচন্দ্রকে বিশ্লেষণ করবার সময় তাঁর কালের কথা ভুলে যাই, কিন্তু তার কাছের মানুষ কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কাছে ধরা পড়েছিল তাঁর যুগস্রষ্টার ভূমিকাব রূপ, সেই সঙ্গে যুগের কাছে তাঁব আত্মবলিদান। নবীনচন্দ্র গিরিশকে লিখেছিলেন "তুমি পীঠস্থান কলিকাতায় এক জীবন বলিদান দিলে। কিন্তু কলিকাতার অল্পলোকেই বোধহয় তোমাকে চিনে ও আমার মত তোমায় শ্রদ্ধা করে।"(২২) গিরিশের প্রতিভা বুঝেছিলেন বলেই এই নবীনচন্দ্রই চেয়েছিলেন গিরিশ-চন্দ্রকে দিয়ে, দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরীবিভ্রাট, উকিলি-ডাক্তারি বিভ্রাট, বিচার বিভ্রাট, উপাধিব্যাধি' সব বিষয়েব আদর্শ ধরে এবং দেশোদ্ধাবেব উপায় দেখিয়ে comico-tragic নাটক লিখিয়ে নেবেন—যে নাটক হবে গিরিশচন্দ্রের 'নাটকমন্দিরের সুদর্শন চূড়া স্বরূপ'। 'সাতদিনে নাটক প্রসব ক'রে যেভাবে গিরিশচন্দ্র নিজেকে ধ্বংস করেছেন তা থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁব প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশ ঘটানোই ছিল নবীন চন্দ্রের উদ্দেশ্য।(২৩)

১৮৭২ থেকে ৫০ বৎসর—এই সময়টিকে কেউ কেউ সাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এ যুগে যত বেশী নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে এবং জনচিত্তের উপর যে প্রভাব বিস্তাব করেছে সাহিত্যেব অপর কোনো শাখা ঠিক ততখানি সাফল্য দাবী করতে পাবে না। শুধু সংখ্যার দিক দিয়েই নয়, এ যুগে নাটকেব বৈচিত্র্যের দিক থেকেও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। জাতীয় ভাবধারার প্রকাশ ও প্রচারের বাহন হিসাবে নাটকের ও মঞ্চের দান সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক। সরকারী আদেশে যত নাটক বাজেয়াপ্ত হয়েছে, বাজেয়াপ্ত উপন্যাস-কাব্য-প্রবন্ধ-সব মিলিয়ে সম সংখ্যায় পৌছয় নি। সর্বোপরি দেখা গিয়েছিল—নাটকে ভক্তিবাদ ও পুরাণাশ্রিত কাহিনীর সংখ্যা-ধিক্য। এটি ত্রুটি নয়, গৌবব। এই পৌরাণিক ভক্তিবাদে মহান হৃদয়বত্তা, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ, সমুচ্চ নৈতিকতার জয়ঘোষণা ছিল। এর মধ্য দিয়ে যুগচিত্তের সম্যক প্রতিফলন ঘটেছে। যে সময় বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদকে আশ্রয় করে উপন্যাস লিখেছেন, সে সময় নাটকে তাব আত্ম-প্রকাশ স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত।

নাটকের সেই স্বর্ণযুগের স্বর্ণসিংহাসনে গিরিশ তখন রাজচক্রবর্তী। এ যুগের আর এক নাম গিরিশযুগ। সমসাময়িক মঞ্চসেবীর কাছে তিনি—পিতা এবং গুরু। মঞ্চের সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে না এসেও যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদেরও তিনি পথপ্রদর্শক। দ্বিজেন্দ্র-লালের মতো পাশ্চাত্যশিক্ষা ও রীতিতে সুনিপুণ নাট্যকার তাঁকে বলেছেন "আপনিই তো এ বিষয়ে [নাটক রচনায়] আমাদের গুরু। বাস্তবিক আপনাকে অনুসরণ করেই

তো আমরা এই যা দু'চারখানা নাটক লিখতে শিখেছি।"

॥ ৩ ॥

স্বর্ণসিংহাসন ! কতটুকু মর্যাদা ছিল তাঁর ?

গিরিশের খ্যাতি তাঁকে যত অর্থ বা গৌরব এনে দিক না কেন কোনো সামাজিক সম্মানের জয়টীকা ললাটে পরিয়ে দেয় নি। বেঙ্গল থিয়েটারে যেদিন প্রথম নারী-শিল্পী নিয়ে অভিনয় শুরু হয়েছিল, নীতিবাগীশদের মতে বাংলা মঞ্চের পঞ্জিকায় সেটি অশুভ দিন। শিক্ষিত-সমাজ নীতি ও রুচির তাগিদে সেদিন বাংলামঞ্চের কপালে কালিমা লেপন করে তার প্রাণদণ্ডের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তথা তাবৎ শিল্পী সম্প্রদায় সমস্ত সামাজিক কৌলীন্য হারিয়ে অছুৎ হয়ে গেছেন। বারবণিতা সম্প্রদায় এতদিন ছিল লোকচক্ষের অগোচর এবং শিক্ষিত-সুজনদের অনেকেরই গোপন ভোজের বস্তু—তাদের জীবনসমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় নি ; কিন্তু যে মুহূর্তে তারা মঞ্চ-পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সেই মুহূর্তেই সমাজে জাগল আলোড়ন—তারা হয়ে দাঁড়াল আক্রমণের লক্ষ্য—এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে যাঁরা অভিনয়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন তাঁরা সামাজিক সম্ভ্রম হারিয়ে পতিত শ্রেণীতে পরিণত হলেন। শিল্পী হিসাবে এঁদের শক্তিমত্তা, নাট্য-কার হিসাবে এ দের সাহিত্যকর্ম ব্যক্তি হিসাবে এঁদের ত্যাগ ও অধ্যবসায় মূল্যহীন হয়ে গেল। গিরিশ তিরোভাবের পর 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন "সম্প্রতি বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্যিকের দেহান্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারেও কখন যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।"(২৪)

১২৮১ সালের ১ পৌষ কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচারে' একটি সাপ্তাহিক সংবাদ: "যাত্রার পরিবর্তে নাটক অভিনীত হইতে দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এতদিনের পর বিশুদ্ধ আমোদ আস্বাদ করিবার উপায় হইল। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল। বেশ্যাদ্বারা অভিনয় করাইলে, নাট্যমন্দির আর বিশুদ্ধ আমোদের স্থল রহিল না।···বেশ্যার অভিনয়ে দুইটি দোষ। যে সকল পুরুষ বেশ্যার সঙ্গে অভিনয় করেন তাঁহাদের চরিত্র ভাল রাখা কঠিন। দ্বিতীয়ত যাঁরা বেশ্যার অভিনয় দেখেন তাঁহাদেরও মন কলঙ্কিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। সুতরাং বেশ্যার অভিনয় অবাধে প্রচলিত হইলে ভারতের আর একটি সর্বনাশের দ্বার খোলা হইবে। ভারতের মঙ্গলের জন্য যাঁরা অর্থ

দিয়া, শরীর দিয়া,প্রাণ দিয়াযত্ন করেন তাঁরা কি এই বেশ্যার অভিনয় প্রচলিত হইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? যে ভারতেব প্রাচীন আচার্যেরা 'মাতৃবৎ পরদারেষু' এই উন্নতনীতি ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ভারত সন্তানেরা কি বেশ্যা লইয়া আমোদ করিবেন ? শুনিলাম কতকগুলি সুশিক্ষিত লোক নাকি বেশ্যার অভিনয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। যে সুশিক্ষার ফল বেশ্যার আমোদ, সে সুশিক্ষার মুখে আগুন। যদি ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকেরা বেশ্যার অভিনয় দেখে, তাহা হইলে তাদের যে কি সর্বনাশ হইবে তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। এ সকল কথা কি মনে পড়ে নাই ? ভারতের অস্থিচর্মসার এ অবস্থায় নির্দয়রূপে ভারতমাতার মর্মে আর আঘাত করিও না, যথেষ্ট হয়েছে। ভাই সকল ক্ষান্ত হও, তোমাদের পায়ে পড়ি। দেশ ডোবে, আর কুনীতি বিস্তার করিও না।'

তার আগে বৈশাখ ২৩, ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এক অভিনেতার বিবাহ সংক্রান্ত খবর। এক ডেপুটি কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল থিয়েটারের অভিনেতার সঙ্গে। কন্যা স্বয়ং ঐ-বিবাহে আপত্তি জানিয়েছে, পাত্র মদ্যপায়ী এবং অভিনেতা বলে। বিবাহ ভেঙে যায়। সমাচারের মন্তব্য "এ সংবাদটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত ডেপুটীবাবুকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিলাম। কৃতবিদ্যগণ ইহার অনুকরণ করেন এই আমাদের প্রার্থনা।

একই কাগজে ১২ ফাল্গুন ১২৮১ সংখ্যায় থিয়েটারের অভিনেত্রী সুকুমারীর (গোলাপসুন্দরী) সঙ্গে অভিনেতা গোষ্ঠবিহারীর বিবাহ সংক্রান্ত দীর্ঘ মন্তব্য করা হয়।

এই সব সংবাদ ও মন্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় অভিনেত্রীদের সংস্পর্শে আসার ফলে অভিনেতাদেব সামাজিক জীবন কিভাবে নষ্ট হতে বসেছিল। প্রসঙ্গত অহীন্দ্র চৌধুরীর একটি অভিজ্ঞতা ও ক্ষোভের কথা শুনিয়ে দিই :

ঘটনাটা হল, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেছেন —শ্রীমতীর ভূমিকায় নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী। অহীনবাবু এবং আরও কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী সে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। গৌরীদেবীর নৃত্যরীতি সে-কালের মঞ্চের নৃত্যরীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নীহারবালাও অহীনবাবুদের সঙ্গে ছিলেন—তিনি একবার দেখেই সে নাচ তুলে নিলেন। তখন ওঁদের খেয়াল চাপল, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও ঐ নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীনবাবু গেলেন কবির কাছে, অনুমতির জন্যে আর্জি নিয়ে। অহীনবাবু লিখেছেন :

"[কবি] কথাপ্রসঙ্গে বললেন 'তোমাদের অসুবিধে মেয়েদের নিয়ে।' একথা উনি নাকি প্রবোধবাবুকে আগেও বলেছিলেন। কথাটা ঠিক বুঝলুম না। বার দু'য়েক বললেন। আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের মেয়েদের নিয়ে অসুবিধেটা কী ? যা-ই

শেখানো যাক না কেন, আমাদের মেয়েরা তো চটপট তুলে নিতে পারে! তবে আর অসুবিধে কীসের? মনে মনে পর্যালোচনা করে পরে বুঝেছিলাম কথাটার তাৎপর্য। যে শ্রেণী থেকে আমরা অভিনেত্রী সংগ্রহ করি, সেটি ছিল সমাজের দিক থেকে অপাঙক্তেয়। সেদিন ওঁর কাছ থেকে বাড়ি ফিরে আসবার পথে এই কথাই মনে আলোড়ন তুলেছিল—বাংলা থিয়েটারের সামাজিক মর্যাদাই যে শুধু নটীকুলের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা নয়, সংস্পর্শে থাকার দরুণ বাংলার দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ—এঁদের প্রত্যক্ষ করস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ, নটী নাহলে বাঙলা থিয়েটার দাঁড়াতই না।" (২৫)

॥ ৪ ॥

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সেই শৈশবে যখন অখ্যাতি ও অবজ্ঞার বোঝা মাথায় নিয়ে অপাঙক্তেয় শিল্পীকুল নতুন নতুন নাটকের অভিনয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চের স্থায়িত্ব বিধানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় নিরত, তখনই খাস কলকাতার সামান্য কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির বাগানে (তখন এই নামেই পরিচিত) আর এক নাটক চলেছে অব্যাহতগতিতে। সেখানে আসছেন পৌত্তলিক সনাতনপন্থীরা, আসছেন নিরাকার ব্রহ্মউপাসক নব্যপন্থীরা, এমন কি উনিশ শতকী কালাপাহাড়রাও। এই নাটকের সঙ্গে একদিন জড়িয়ে পড়লেন গিরিশচন্দ্র—যিনি সেকালের কাপ্তেনী থিয়েটারের গুরু, কাপ্তেনীরও গুরু। কেমন করে সে যোগাযোগ ঘটল সেটা জানার আগে মঞ্চজীবনের নেপথ্যে গিরিশের ব্যক্তিজীবনটাকে একবার দেখে নিলে ভাল হয়।

১৮৪৪ সালে নব্যবাংলার মনোরাজ্যের দখলদার যখন ইয়ংবেঙ্গল, ঈশ্বরগুপ্ত যখন বাংলা সাহিত্যের 'হর্তাকর্তা বিধাতা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী আন্দোলন যখন সবে শুরু হয়েছে (তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত—পত্রিকাও প্রকাশিত), যখন সমাজের মধ্যে চলেছে ভাঙাগড়ার ইতিহাস—তখন গিরিশচন্দ্রের জন্ম। বঙ্কিম তখনো বঙ্কিম হয়ে ওঠেন নি, কবি-মধুসূদনও অপ্রকট। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগর নতুন ভাবধারা প্রবর্তনায় ব্যগ্র—যুগচেতনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেশের সামনে নতুন আদর্শ উপস্থিত করতে চেষ্টা করছেন তাঁরা। দেবেন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কিন্তু ক্ষয়িত হিন্দু-চেতনার উন্মেষ তাঁরও আকাঙ্ক্ষিত। দেবেন্দ্রনাথ বসু এ যুগকে বলেছেন "আলোক ও অন্ধকারের মধ্যযুগ—একদিকে পুরাতন অবসিত প্রায়, অন্যদিকে নতুন যুগের অভ্যুদয়।" কিন্তু নতুন যুগের লক্ষণগুলো তখনো

স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। আখড়াই-হাফ-আখড়াইয়ের সমাদর—তার বাঁধনদারদের খাতির কবিযশঃ প্রার্থীর ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে। কিশোর গিরিশের মনেও একদিন এ ঈর্ষা জেগেছিল—আখড়াইয়ের মজলিশে ঈশ্বরগুপ্তের রাজ-অভ্যর্থনা দেখে। স্থির করে-ছিলেন, ঈশ্বরগুপ্তের মতো বাঁধনদার হবেন।

পারিবারিক পরিবেশ সর্বদাই গিরিশের প্রতিকূল। বাল্যে মাতৃস্তন্য ও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত। অষ্টমগর্ভের সন্তান গিরিশকে মা কোনোদিন আদর করেন নি—বিসদৃশভাবে তাড়নাই করেছেন। কারণটা বড় ট্র্যাজিক। গিরিশের পূর্বে তিনি একটি সন্তানকে হারিয়েছেন, যার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল প্রবল। সেই সন্তানকে হারিয়ে তাঁর মনের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া—নতুন করে আর একটি সন্তানকে নিজের স্নেহের বিষে হত্যা কর-বেন না—ভয় ছিল, হয়ত তাঁর ভালবাসা এ সন্তানটিকেও তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবে। তাই মাতৃস্নেহের ব্যগ্র-দু'বাহুকে তিনি অশেষ যন্ত্রণায় বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু মাতৃস্নেহবিচ্যুত গিরিশ তাঁব মায়ের মনের খবর জানতেন না—তাঁর অন্তরে জমে উঠেছিল তীব্র ক্ষোভ। একদিন গিরিশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন পাশের ঘরে, সে সময়ও মা স্নেহস্পর্শ নিয়ে উপস্থিত হন নি। গিরিশ সহসা শুনতে পেলেন পাশের ঘরে মায়ের কণ্ঠ—স্বামী নীলকমলকে তিনি অনুরোধ করছেন, 'ওগো যেমন করে হোক, যে কোনো চিকিৎসায় ছেলেকে সারিয়ে তোলো'। সেই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে মাকে চিন-লেন বালক গিরিশ, অন্তর ভরে উঠল গভীর আনন্দে।

কিন্তু সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি—কিছুকাল পরে, গিরিশের বয়স যখন এগারো তখনই তিনি হারালেন মাকে।

শৈশবে মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত গিরিশের অভাব অনেকখানি দূর করেছিলেন তাঁর বাবা। আবার, মায়ের মৃত্যুর পর মা-মরা ছেলেকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে হয়ত তার ভবিষ্যৎ অধোগতির পথ সুমসৃণ করেছিলেন তিনিই। কিন্তু পিতৃস্নেহের সঙ্গে যেটুকু শাসনের বাঁধন ছিল সেটুকুও ঘুচে গেল চৌদ্দ বছর বয়সে। যখন পিতাকেও হারালেন। আর ভয় করবার কেউ নেই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা এ-অবস্থায় খুব বেশি এগোয় নি। প্রথম পাঠশালায়, পাঠ শেষ করে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দু'বছর। এর পর হেয়ার স্কুলে পড়তে পড়তে পিতৃবিয়োগ এবং হেয়ারস্কুল পর্ব শেষ। হালচাল দেখে অভিভাবিকা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ১৫ বছর বয়সেই নবীন সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাতে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। বিয়ের পর ১৮৬০-এ আবার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হলেন কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হল না! ১৮৬১-তে পাইকপাড়া গভর্ণমেণ্ট এডেড স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়ে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে দিলেন।

এই বয়সেই গিরিশচন্দ্র অধোগতির পথ ধরে অনেকখানি এগিয়েছেন। তাঁর একটি সঙ্গীতে স্ত্রী প্রমোদিনীর দিন যাপনের একটা আভাস আছে—সে চিত্র অন্তত গিরিশ-চন্দ্রের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক নয় :

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে
সুখ অনুগামী দুখ গোলাপে কণ্টক মিলে।
শশীপ্রেমে কুমুদিনী প্রমোদিনী উন্মাদিনী
তথাপি সে একাকিনী কত নিশি ভাসে জলে॥ (২১)

প্রণয়সুখবঞ্চিতা প্রমোদিনীকে যখন হয়ত নিঃসঙ্গ বহুরাত্রি জাগরণের বেদনা বহন করতে হয়েছে তখন গিরিশচন্দ্র ইয়ারবকসী নিয়ে নিত্যনতুন আনন্দের গোলক-ধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই আনন্দ সন্ধানেই বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার। অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ এইখানেই। তার আগে যাত্রাদলে কিছু কিছু গান বেঁধে দিয়েছেন—সেই যাত্রাদল থেকে অভিনেতা সংগ্রহ করে বাগবাজার এ্যামে-চার থিয়েটার। এদের প্রথম নাটক সধবার একাদশীতেই :

"মদমত্ত পদ টলে নিমেদত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নবনট-গুরু তার।"

১৮৭৪ থেকে গিরিশের জীবনে নূতনতর বিপর্যয়ের সূত্রপাত। প্রমোদিনী মারা গেলেন এই সময়ে। স্ত্রীর মৃত্যু গিরিশের মনে অনুশোচনার আগুন জ্বালিয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ এই সময়ে কতকগুলি কবিতাতে তাঁকে অন্তরবেদনা প্রকাশ করতে দেখি। স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, অতীত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁকে সাময়িক অনুশোচনায় বিদ্ধ করলেও তাঁর কোনো স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে নি। পিচ্ছিল পথ থেকে দূরে সরে যাবার শক্তি আসে নি, আর যে নাস্তিকতার স্পর্ধায় উল্লসিত ছিলেন তার থেকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৌঁছবার মতো চেতনাও গড়ে ওঠে নি। ১৮৭৭-এ গিরিশ দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। এর ছ'মাস পরেই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে এক অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় জীবনলাভ। কলেরায় আক্রান্ত গিরিশচন্দ্রের বাঁচার আশা বিশেষ ছিল না। আচ্ছন্নচেতনায় এক নারীমূর্তি তাঁর মুখে প্রসাদ দিয়ে বললেন, 'তুমি ভাল হয়েছ, আর ভয় নেই'। চেতনা ফিরে পেয়ে গিরিশচন্দ্র পড়লেন সংশয়ে। অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় তাঁর কোনোদিনই বিশ্বাস ছিল না—কিন্তু মুখে তখনো টাটকা প্রসাদের স্বাদ। তাঁর নাস্তিকতা বড় রকমের নাড়া খেয়ে দুলে উঠল। গিরিশ সে যাত্রা বেঁচে উঠলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য গিরিশের তখন চতুর্দিকে অশান্তি। মনোবল ভেঙে পড়েছে—অর্থাভাব প্রবল —বন্ধুর দল হয়েছে শত্রু। যে গিরিশ এতদিন এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এসেছেন

"জড়বাদীরা বিদ্বান—বিজ্ঞ; তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ধর্মের আন্দোলন বৃথা" সেই তিনি এখন কোনো এক প্রত্যয়ের আশ্রয়ের জন্য অন্তরে আকুল। দেবতায় বিশ্বাস এসেছে। তারকনাথের কাছে প্রার্থনা করে ফল পেয়েছেন, মনে করেছেন 'দেবতা মিথ্যা নয়', তবু সংশয়ের জাল সম্পূর্ণ কাটে নি, অন্ততঃ ধার্মিক বা সাধক মানুষের সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা ঔদাসীন্য আছে আগের মতোই। দু'চারবার ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেছেন কিন্তু তাতে ফলোদয় হয় নি। এই সময় ইণ্ডিয়ান মিররে খবর বেরিয়েছিল, দক্ষিণেশ্বরে কে নাকি এক পরমহংস আছেন তাঁর কাছে কেশব সেনেরা যাতায়াত করেন। গিরিশ ভেবেছিলেন "ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে"। গিরিশের ও-সব নিয়ে বিশেষ উৎসাহ আসে নি।

সেই পরমহংসই এসেছেন বোসপাড়ায়—গিরিশের বাড়ির কাছে, দীননাথ বসুর বাড়িতে। পরমহংসের খ্যাতি ইতিমধ্যে বেড়েছে। সুতরাং "দেখাই যাক না" কৌতূহল নিয়ে গিরিশ উপস্থিত হলেন সেখানে এবং হতাশ হলেন। দেখলেন, এক আধবুড়ো মানুষ—না গেরুয়া, না জটা, না কিছু। কি যেন বলছেন—ভক্তেরা খুব আগ্রহ নিয়ে আনন্দ করে শুনছে। তখন সন্ধ্যা—সেজ-বাতি জ্বালানো হয়েছে ঘরে। মাঝে মাঝে সেই পরমহংসটি জিজ্ঞাসা করছেন 'সন্ধ্যা হয়েছে?' একই প্রশ্ন বার বার। এ আবার কি? চোখের সামনে বাতি জ্বলছে—দেখতেও পাচ্ছেন! এক রকম হাসি চেপেই গিরিশ ফিরে গেলেন। (২৭)

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। সেই পরমহংস আবার আসছেন বলরাম বসুর বাড়িতে। বলরামবাবু পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছেন—গিরিশচন্দ্রও বাদ যান নি। নিমন্ত্রণ যখন হয়েছে, সেটা রক্ষা করতে একবার যেতে হয়! গিয়ে দেখলেন, বিধু কীর্তনী গান শোনাতে এসেছে—লোকজন অনেক জড়ো হয়েছে—পরমহংসটিও এসেছেন সকলকে হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করেছেন। একটু চমকে গেলেন গিরিশ— গুরু, পরমহংস—এঁরা তো লোকের প্রণামটাই নেন কিন্তু ইনি যেন সকলের কাছে দীনভাবে নত। বিধু কীর্তনীর সঙ্গে রসিকতা করে কি বলছেন—গিরিশের পাশ থেকে তাঁর এক বন্ধু কানে-কানে বললেন 'বিধু বোধহয় ওঁর পূর্ব-আলাপী, তাই তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।' গিরিশ আমল দিলেন না ও-কথায় কিন্তু দেখারও ইতি হল, কারণ অমৃতবাজার সম্পাদক শিশির ঘোষ তাঁর হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন—"আর কি দেখবে হে?" (২৮)

গিরিশের কিন্তু আরও দেখার ইচ্ছা ছিল। একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেদিন ফিরে গেলেন।

॥ ৫ ॥

সেদিন ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪।

হাতিবাগানের মহেন্দ্র মুখুজ্যের ময়দাকল থেকে একটা ঠিকে ঘোড়ার গাড়ি বিডন স্ট্রিট ধরে এগিয়ে গিয়ে স্টার থিয়েটারের সামনেএসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন অ-গোছালো পোষাক, পাগলাটে চেহারার একটি আধবুড়ো মানুষ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সেই মুহূর্তটি যে অনন্য, কে জানত! কে জানত—বিহ্বল হাসিতে, এলো-মেলো পোষাকে সেদিন রঙ্গমঞ্চে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দেবতারই আবির্ভাব হল!

থিয়েটারের কম্পাউণ্ডে পায়চারি করছিলেন গিরিশচন্দ্র। মহেন্দ্র মুখুজ্যে তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন "দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমহংসদেব এসেছেন 'চৈতন্যলীলা' দেখতে —তাঁর টিকিট লাগবে কি?" একটু চিন্তা করে গিরিশ জানালেন "ওঁর টিকিট লাগবে না, তবে সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের লাগবে।" সাধারণ ভদ্রতায় তিনি এগিয়ে এলেন সম্বর্ধনা জানাতে। ততক্ষণে গাড়ি থেকে খানিকটা এগিয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সঙ্গের একজন ভক্ত দূর থেকে গিরিশকে দেখিয়ে তাঁর পরিচয় দিতেই গিরিশের উদ্দেশে হাত জোড় করে মাথা নিচু করে নমস্কার জানালেন রামকৃষ্ণ। গিরিশ প্রত্যভিবাদন করতেই তিনি আবার নমস্কার করলেন—চলল নমস্কার-প্রতিযোগিতা। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল গিরিশকেই। একটি নমস্কারের ঋণ নিয়েই সেদিন গিরিশ বাড়ি ফিরে গেলেন। যাবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে বক্সে বসিয়ে একজন পাখাওয়ালাকে নিয়োগ করে গেলেন। সেদিন যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখেছেন এবং তারপরে যা হয়েছে (বিনোদিনীকে আশীর্বাদ ইত্যাদি)—সকল সময়ই কিন্তু গিরিশ অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস ও আশ্রয়ের দাক্ষিণ্যে গ্রহণ করলেন গুণীজন-পরিত্যক্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চকে এবং সমাজ-নিন্দিত নটগুরুকে।

চৈতন্যলীলা অভিনয় দেখার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবভঙ্গি ও আচরণাদির কথা শ্রী-ম বিশদভাবেই বলেছেন। অভিনয়ের পরে সেদিন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে ঘটনার কথা বিনোদিনী নিজেই লিখেছেন: "সেই পরমপূজনীয় দেবতা চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন! অভিনয় কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণদর্শনের জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণসমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্নবদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন 'হরি গুরু, গুরু হরি' বল মা 'হরি গুরু, গুরু হরি।' তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া, আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে 'মা তোমার চৈতন্য হউক।"(২৯)

চৈতন্যলীলা অভিনয়ের পরে নেপথ্যগৃহে সেদিন যা হয়েছিল, তা পৃথিবীর সর্বোত্তম দিব্য নাটকের একটি দৃশ্য ভিন্ন আর কিছু নয়। সে সম্পর্কে অন্য দু'একটি বিবরণ সংগ্রহ করেছি। আইনজীবী কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু) বিনোদিনীর একটি মামলা পরিচালনার ব্যাপারে একসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। বিনোদিনী তখন বৃদ্ধা। নাটুবাবুকে বিনোদিনী বলেন, অভিনয়ের শেষ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁকে স্টেজে নিয়ে যাবার জন্য বার-বার বলতে থাকেন। এই অবস্থায় অভিনয় শেষ হয়। বিনোদিনী অফিসঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপী বিনোদিনীর পায়ের উপর পড়েন।(৩০) দ্বিতীয় বিবরণে জানতে পারি, পায়ে-পড়ার পূর্বেই ভক্তেরা তাঁকে ধরে ফেলেন। স্বামী অভেদানন্দ (তখন কালীপ্রসাদ) সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একথা শুনেছিলেন অভেদানন্দের কাছে।(৩১) গিরিশচন্দ্র তাঁর এক লেখায় "অনেক সাধুব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার [বিনোদিনীর] পদধূলি লইতে অগ্রসর" হওয়ার কথা বলেছেন।(৩২) এখানে সেদিনের ঘটনারই ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বোঝা যায়।

পরদিন গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে এসে যখন সমস্ত ঘটনা শুনেছেন তখন, অনুমান করতে পারি, তার মধ্যে নতুন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তদের নমস্কার করার দৃশ্যে তিনি ইতিপূর্বে বিচলিত হয়েছিলেন। পূর্বরাত্রে তিনি নিজেই সে নমস্কার গ্রহণ করেছেন ; এবং তারপর যে বারবনিতাদের জন্য বাংলা থিয়েটার অপাঙক্তেয় তাদেরই একজনের সঙ্গে ঐ অকল্পনীয় ব্যবহার গিরিশচন্দ্রকে অভূতপূর্ব জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

এর কিছুদিন পরেই উভয়ের চতুর্থ সাক্ষাৎকার।

সেদিন গিরিশচন্দ্র বসেছিলেন নিজের বাড়ির রোয়াকে। শ্রীরামকৃষ্ণ চলেছেন বলরাম বসুর বাড়ি। একজন সঙ্গীভক্ত তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন গিরিশের দিকে—আগের মতোই জোড়হাতে গিরিশকে নমস্কার করে শ্রীরামকৃষ্ণ এগিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে গিরিশের মধ্যে শুরু হয়ে গেল একটা প্রবল আকর্ষণের টান। উল্টোদিকে তাঁর সহজাত অহঙ্কারও মাথা নাড়া দিয়ে উঠল—'না ডাকলে যাব কেন ?' এই দোটানার মধ্যে প্রার্থিত ডাক এসে পৌঁছল—একটি ভক্ত এসে বলল 'পরমহংসদেব আপনাকে ডাকছেন।' (৩৩)

এই ডাকের জন্যেই যেন গিরিশ অপেক্ষা করেছিলেন। কাল বিলম্ব না করে চললেন তিনি—জীবনের পরমলগ্ন এসেছে—কোনো গরবেই তাকে অবহেলা করা যাবে না।

সেদিন গিরিশ প্রশ্ন করেছিলেন 'গুরু কি ?'

রামকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন "গুরু কি জান, যেমন কুটনী।" পরক্ষণেই বললেন "তোমার

গুরু হয়ে গেছে।" (গিরিশচন্দ্র তাঁর বর্ণনায় 'কুটনী'র বদলে ঘটক শব্দ ব্যবহার করে লিখেছেন 'তিনি এই অর্থে অন্যকথা ব্যবহার করিয়াছিলেন'। শ্রীরামকৃষ্ণ 'কুটনী' শব্দটিই ব্যবহার করতেন)।

এ কথায় গিরিশের মন ভরে উঠেছিল। তাঁর স্বভাবগত দাম্ভিকতা কোনো মানুষকে দেবতা কল্পনা করে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু' বলে স্তুতি করার পথে প্রবল অন্তরায়। তা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁকে আর গুরু খুঁজে বেড়াতে হবে না।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার অভিনয় দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু একটা শর্তও আরোপ করেছেন "কিছু নিও।" গিরিশচন্দ্র অবশ্য সাধারণ অর্থেই কথাটিকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি ঠিক আক্ষরিক অর্থেই কথাগুলো বলেছিলেন ?—তিনি যে দিতেই চাইছিলেন।

উভয়ের পঞ্চম সাক্ষাৎ আবার সেই স্টার থিয়েটারেই। ১৮৮৪—১৪ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখতে। তখনো কিন্তু গিরিশের আচরণ কিছুমাত্র ভক্তসুলভ নয়। তাঁর নিজের বিবরণী থেকেই শোনা যাক :

"আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসে আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন 'পরমহংসদেব আসিয়াছেন।' আমি বলিলাম 'ভাল, Box-এ লইয়া গিয়া বসান।' দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন 'আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না ?' আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম 'আমি না গেলে তিনি কি আর গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না ?"(৩৪)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র গিয়েছিলেন অভ্যর্থনা জানাতে। সেদিন যে রৌপ্য-মুদ্রাটি রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে দিয়েছিলেন সেটি বহুদিন পর্যন্ত স্টার থিয়েটারে পরমশ্রদ্ধায় ও যত্নে রক্ষিত ছিল। অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখছেন "এই আশীর্বাদের টাকাটি স্টারের টিকিটঘরের ক্যাশবাক্সে পরম যত্নে একটুকরা নূতন কাপড়ে বাঁধা বরাবরই রাখা হইত। স্টারের স্বত্বাধিকারীদের বিশ্বাস, এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হয়েন।"(৩৬)

'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার দিনেব ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন গিরিশচন্দ্র। শ্রীম-ও এ সম্পর্কে 'কথামৃতে' বিবরণ দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন "Dress circle [ড্রেস সার্কেল]-এর দর্শকের Concert [কনসার্ট] এর সময় বসিবার জন্য স্টার থিয়েটারের দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটি কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। ...পরমহংসদেব একখানি চৌকীতে বসিলেন, আমিও অপর একটি চৌকীতে বসিলাম। ...পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে

লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন। একটি বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুপূর্বে আমি এক দুর্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাবভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।' আমি ভাবিলাম, অনেক রকম বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাঁক যায় কিসে?' পরমহংসদেব বলিলেন 'বিশ্বাস করো।'(৩৬)

প্রহ্লাদ চরিত্র অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর অফিসঘরে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে নানাবিধ আলাপ আলোচনার মধ্যে তাঁর নিজের কথাও তুলেছেন। প্রশ্ন করেছেন:

"এ পাপীর কি হবে?

"ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন

ভাব-শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হরি
ভাবিলে ভবভাবনা যায় রে—
তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।...ইত্যাদি

(গিরিশের প্রতি)

তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।—

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন যেন গিরিশেরই কথা ভেবে বলেছেন :

"বীরভাব ভাল না। নেড়ানেড়ীদের, ভৈরবভৈরবীদের বীরভাব অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এ ভাবে প্রায়ই পতন আছে।"

"গিরিশ—আমার এক সময় ঐ ভাব এসেছিল।"

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন।"

"গিরিশ—ঐ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তাঁকে আমমোক্তারী দাও—তিনি যা করবার করুন।"(৩৭)

সেদিন গিরিশ নিকট সান্নিধ্যে থেকে রামকৃষ্ণ চরিত্র অনেকখানি দেখবার সুযোগ পেলেন। 'চৈতন্যলীলা' দেখার দিন এ সুযোগ তিনি পান নি। আজ রঙ্গমঞ্চ নটনটী সকল কিছুর পটভূমিকায় রামকৃষ্ণকে তিনি দেখছেন। অভিনয়ের পর একজন প্রশ্ন করেছে 'কি রকম দেখলেন?'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা! যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন।" (৩৮)

"অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা (actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাঁহারা দেখিয়া অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন 'মা থাক্ থাক্; মা থাক্ থাক্।' কথাগুলি করুণামাখা।

"তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, সবই তিনি, এক এক রূপে।" (৩৯)

এদিনের পর গিরিশের নতুন জীবনদৃষ্টি স্বাভাবিক। তিনি এখন অনেকখানি নিশ্চিন্ত—অবশেষে আশ্রয় পেয়েছেন। যে আশ্রয় ছায়ায় সামান্য নটীরও স্থান আছে, সেও আনন্দময়ী বিশ্বজননীর আর এক মূর্তি—সেখানে গিরিশও অকুণ্ঠে প্রবেশ করতে পারেন—ব্যগ্রবাহু যেন তারই অপেক্ষায় রয়েছে কতদিন ধরে।

অল্পদিন পরে আবার ডাক এলো। বেলা ৩টার সময় থিয়েটারে বসে আছেন গিরিশচন্দ্র, এমন সময় একখানি চিরকুট পেলেন। তাতে লেখা—মধুরায়ের গলিতে রামদত্তের বাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন। গিরিশ লিখেছেন :

"[চিরকুট] পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমায় হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেই টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকট গিয়া ভাবিলাম, যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ি গিয়া পঁহুছিলাম।"(৪০)

সেইদিনই গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম প্রণাম করলেন। রামবাবুর উঠানে ভক্তেরা খোল বাজাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্যরত। গান হচ্ছে—'নদে টলমল টলমল করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে' গিরিশের মনে হল, সেই গান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যে রামবাবুর অঙ্গনও টলমল করছে। যে গিরিশ থিয়েটারের নৃত্যগীতের সঙ্গে নিত্য-পরিচিত সেই গিরিশের অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য এক অভূতপূর্ব অনুভূতি সঞ্চার করেছে। নৃত্য এমন সুন্দর হয়! নিবিড় আনন্দানুভূতিতে তাঁর চোখে জল এসে গেল। নৃত্য করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন—ভক্তেরা তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে লাগল। গিরিশেরও ইচ্ছা হলো,

সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার নৃত্য শুরু করেছেন—নাচতে নাচতে গিরিশের সামনে এসে আবার সমাধিস্থ!

গিরিশকে এগিয়ে যেতে হলো না—তিনিই এলেন। এবার আর কোনো বাধা নেই—কোনো কুণ্ঠা নেই। গিরিশ পরিপূর্ণ অন্তরে করলেন প্রথম প্রণাম। (৪১)

এই পরিপূর্ণ অন্তর নিয়েই এবার গিরিশ গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। দেখলেন :

"তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেল। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে 'গুরুর্ব্রহ্মা' ইত্যাদি স্তবকটিও আবৃত্তি করিলাম।" (৭২)

গিরিশচন্দ্র পৌঁছলেন 'সংশয় হতে সত্যসদনে।'

তৃতীয় অধ্যায়

মঞ্চের রাজা এবং মঞ্চের দেবতা

"থিয়েটার-গুলো আর করা কেন ?"—গিরিশের প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তরের উপর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি কতখানি নির্ভর করেছিল, তা কি আজ সঠিক বোঝা সম্ভব ? অথচ সেদিন একটি মুখের কথার ওপরই নির্ভর করছিল প্রফুল্ল-বলিদান,জনা-বিল্বমঙ্গল-বুদ্ধদেবচরিত, সিরাজদ্দৌলা-মীরকাশিম-ছত্রপতি শিবাজী লেখা হবে কি না !

গিরিশচন্দ্র জেদী মানুষ—যখন যা ধরেছেন তা সফল করে তবে শান্ত হয়েছেন। আজ তাঁর নতুন জেদ—থিয়েটার আর নয়। কিন্তু বাধা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বললেন "না, না, ও থাক—ওতে লোকশিক্ষা হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন—"না গো কর্ম ভালো। জমি পাট করা হলে যা হইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হোল।' যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখে-ছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্যে রাখবে।" (১)

এত সহজে থামবার মানুষ গিরিশচন্দ্র নন। আবার জিদ ধরেছেন :

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—"আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না ইদিক উদিক দুদিক রাখতে হবে, জনকরাজা ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।" (সকলের হাস্য)

গিরিশ—"থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না না ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্ছে।" (২)

নাটক বা মঞ্চের চিত্তরঞ্জনীবৃত্তির অতিরিক্ত একটা ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বরাবরই

সচেতন। বক্তৃতা বা উপদেশে প্রদত্ত শিক্ষার শুষ্কতাকে তিনি কোনোদিনই পছন্দ করেন নি। নাট্যকার বা অভিনেতা ইচ্ছা করলে নাটক ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালার সঙ্গে আলোচনাকালে সেই কথাই বলেছেন :

নীলকণ্ঠ : "আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : "তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য। অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু'একটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কতলোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।" (৩)

গিরিশের বৈরাগ্য-ব্যাকুলতা সহজে যাবার নয়—শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর আবার তা প্রবল হয়েছিল—সঙ্কল্প আরও দৃঢ়—এবার আর বাধা দেবার কেউ নেই। না, তবু একজনের সম্মতি চাই। সেই উদ্দেশ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর কাছে। ফলাফলটা কি হয়েছিল গম্ভীরানন্দের কাছ থেকেই শুনি :

"সংসারতাপে ক্লিষ্ট গিরিশবাবু একদিন শ্রীচরণে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা নিবেদন করিলে শ্রীমা সম্মতি দিলেন না। বুদ্ধিমান ও শব্দপ্রয়োগনিপুণ মহাকবি আধঘণ্টা ধরিয়া নানা-ভাবে শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সম্মুখে অতি অল্পলোকই স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বীয় সিদ্ধান্ত হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।...[ব্যর্থ মনোরথ গিরিশ] এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা লইয়া পুস্তক সকল প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।" (৪)

শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ ও নির্দেশই যে সারদাদেবীর যুক্তির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

থিয়েটার ছাড়ার আগ্রহ গিরিশের বরাবরই ছিল—পারেন নি শ্রীরামকৃষ্ণের (পরে সারদাদেবীরও) নিষেধে। সেবার একটা সুযোগও এসে গিয়েছিল। তিনি তখন অসুস্থ—হাঁপানি বেড়েছে। এই অবস্থায় [অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন] "গিরিশভক্ত অনেকেই গিরিশবাবুকে অনুরোধ করিলেন 'মশাই আর কেন, শরীর ভালো নয়, বয়সও হয়েছে, থিয়েটার ছেড়ে দিন।' গিরিশবাবু বলিলেন 'বেশ তো, এখুনি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, তবে তোদের রাজাকে [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] জিজ্ঞাসা করে আয়। তিনি যদি বলেন, আমি এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। যাঁহারা এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহারা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ধরিলেন; বলিলেন 'আপনি বললেই গিরিশবাবু থিয়েটার ছেড়ে দেন।' উত্তরে রাখাল মহারাজ বলিলেন 'না না ঠাকুর ত ওঁকে থিয়েটার করতেই বলে গেছেন;

তা কি হয় ? যতদিন ইচ্ছা থিয়েটার করুন, আমি কি বারণ করতে পারি ?' বাস, রায় বহাল রহিল। গিরিশবাবু থিয়েটার করিতে লাগিলেন।" (৫)

শেষ পর্যন্ত এই অভিনয়ের সূত্রেই গিরিশের মৃত্যু হয়।

মিনার্ভায় বলিদান নাটকের অভিনয় (৩০ আষাঢ় ১৩১৮)। হ্যাণ্ডবিল-পোস্টারে ছাপা হয়ে গেছে, গিরিশচন্দ্র নামছেন করুণাময়ের ভূমিকায়। অভিনয়ের দিন সন্ধ্যা থেকে প্রবল বৃষ্টি —দর্শক সমাগমও বেশি হয় নি। কিন্তু ক্রমশঃ গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখার জন্যই ভিড় বাড়তে শুরু করল। সেই বৃষ্টির মধ্যে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে এলেন। অনেকে অনুরোধ করলেন, "আজ এই দুর্যোগে আপনার নেমে কাজ নেই। একে হাঁপানি—খালি গায়ে অভিনয় করে ঠাণ্ডা লেগে বাড়াবাড়ি হতে পারে।" নিষেধ শুনলেন না গিরিশচন্দ্র, বললেন "এই দুর্যোগেও যাঁরা আমার অভিনয় দেখতে এসেছেন, তাঁদের বঞ্চিত করব না। এতে যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তো উপায় নেই।" সেই আশঙ্কাই সত্য হলো—ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তাঁর ব্যাধির প্রকোপ বাড়ল—সেটাই তাঁর কালব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। গুরুর আদেশ পালন করে বীরের মৃত্যুবরণ করলেন তিনি।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ সম্পর্কের ক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে তার গতি সরল ছিল না —সংশয় ও সংঘাতের পথে তা অগ্রসর হয়েছে এবং এই অতিক্রমণের পথে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ও ধৈর্য অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। প্রবল ভক্তিবিশ্বাস সত্ত্বেও গিরিশের জীবনের বক্রগতি অনেক সময়ই অবস্থা জটিল করে তুলেছে। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশের প্রতি অপার স্নেহ ও দৃঢ় বিশ্বাস পরিস্থিতিকে সহজ ও সরল করে দিয়েছে। ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ 'চৈতন্যলীলা' দেখার দিন থেকে ১৪ ডিসেম্বর, 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখার দিন পর্যন্ত—প্রায় তিনমাস সময়ে গিরিশের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা আগে আলোচনা করেছি। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখার দিন গিরিশ প্রথমদিকে তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী নাটক 'নিমাই সন্ন্যাসে'র প্রথম অভিনয় ১৬ মাঘ ১২৯১ (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রকাশিত রচনাবলীতে ও অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে ১৬ মাঘ ১২৯১, ইং ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫, প্রথম অভিনয়ের তারিখ হিসাবে উল্লেখিত। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে গবেষণারত শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে একটি পত্রে জানিয়েছেন, তারিখটি সঠিক নয়—'নিমাই সন্ন্যাস' প্রথম অভিনীত হয় ১০

জানুয়ারি, ১৮৮৫)। এই নাটকে গিরিশ তাঁর সেইকালের মানসিক অবস্থা অপূর্ব কৌশলে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার দিন গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন :

"আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস কর, হয়ে যাবে।"

"গিরিশ—আমি যে পাপী!"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।"

"গিরিশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না একেবারে দপ করে আলো হয়।"

"গিরিশ—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার যদি আন্তরিক হয়—আমি কি বলব? আমি খাই দাই তাঁর নাম করি।" (৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয় দেখার জন্য স্টার 'থিয়েটারে আগমন, নটীকে আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি গিরিশচন্দ্রকে আশ্বাসদান গিরিশের মনে এক নতুন শক্তি জাগিয়ে তুলেছিল। 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর ঘটনার পরেই গিরিশচন্দ্র রামদত্তের অঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ছিলেন (পূর্ব-অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি) 'নদে টলমল টলমল কবে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' গানের সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায়—যা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল 'রামদত্তের আঙ্গিনা টলমল করিতেছে'। এই পটভূমিকায় যখন তিনি 'নিমাই সন্ন্যাস' রচনা করেন তখন স্বভাবতই গৌরাঙ্গরূপে 'শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি আভাসিত হয়েছে। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটির নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে, আছেও, কিন্তু নাট্যকারের মানসিক পরিচয়ের দিক থেকে দৃশ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'নট' ও 'নটী' দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার যেমন নিজের আত্মোপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি সেইসঙ্গে রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি নট-নটীদের জীবনে যে নতুন বার্তা বহন করে এনেছিল তা-ও বুঝিয়েছেন ইঙ্গিতে। এই দৃশ্যে দেখি, 'মধুর চৈতন্যলীলা'য় অংশগ্রহণকারী নটীর মনে প্রবল দ্বিধা :

মতিহীনা আমি অতি দীনা
নিগূঢ় লীলার ভাব কেমনে প্রকাশি?

প্রত্যুত্তরে নটের আশ্বাস :

ত্যজ ভয় মনে
শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত-পাবন

পতিতে লো কৃপা তাঁর অতি
—বার বার অঙ্গীকার তাঁর
যে লবে অভয় নাম
গুণধাম সদয় হইয়ে
আপনি আসিয়ে
পুরাবেন মনস্কাম তার।

নটীর দ্বিধা তবু ঘোচে না :

ক্ষুদ্র নটী—ভক্তি কোথা পাব ?
মন নহে বশ—কেমনে গাহিব ?

সংশয় ঘুচিয়ে নট তাকে আশ্বস্ত করে :

গৌরাঙ্গের মহিমা অপার
অতি নীচ—অতি প্রিয় তার
নির্ভয়ে কর লো নাম গান
ভগবান অধিষ্ঠান হবেন হৃদয়ে।

অবশেষে একটি সঙ্গীতে উভয়েব প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় গিরিশেব হৃদয়দ্বন্দ্ব ও বেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম একটি আনন্দের সুরও ধ্বনিত হযেছে :

ডাকে হে পতিত তোমায়
পতিত-পাবন পুরাও সাধ
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ।...
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে
দাও হে প্রেম সুধার স্বাদ। (৭)

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন বলে গিরিশজীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "পুরীধামে প্রবেশকালীন দূরে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিয়া যখন নিতাই ও ভক্তগণ বিভোরভাবে গাহিতে লাগিলেন 'দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ওই !' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ঐ সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। অভিনয়ান্তে তিনি গিরিশচন্দ্রকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।" (৮)

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই নাটক দেখার তারিখ উল্লেখ করেন নি। তবে ২৮ জানুয়ারি (মতান্তরে ১০ জানুয়ারি)থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নাটক তিনি দেখেছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫,স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' নাটক দেখতে যাওয়ার কথা, 'কথামৃতে' আছে। তার পূর্বেই গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে আস্থাবান হয়ে উঠেছেন—সব দিক থেকে তাঁর কাছে পরাজয়ও

স্বীকার করে নিয়েছেন। ২২ ফেব্রুয়ারির অর্থাৎ 'বৃষকেতু' নাটক দেখার তিনদিন পূর্বের দিনলিপিতে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশের আলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) হাঁ গা আমার কথা তোমরা সব কি কচ্ছিলে ? আমি খাই দাই থাকি।

"গিরিশ—আপনার কথা আর কি বলব ? আপনি কি সাধু ?

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধু টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নাই।

"গিরিশ—ফচ্‌কিমিতেও আপনাকে পারলুম না। (৯)

শ্রীম'র আরও বর্ণনা :

"গিরিশের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

"গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢঙ্‌ করতেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরূপ হয়। এদিকে গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!

"গিরিশ—বুঝেছি, আপনাকে এখন বুঝছি।" (১০)

এর তিনদিন পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' নাটক দেখতে যাওয়ার পথে বোসপাড়ায় গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন। গিরিশের সেদিনের মানসিক অবস্থার পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রী-ম লিখছেন :

"কিছুদিন পূর্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশ অনেক কথা বলেছিলেন ; এখন শান্ত ভাব। সেই শান্ত-ভাব লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

"তোমার এ ভাব বেশ ভালো; শান্ত ভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা-তা আমায় না বলে।

"গিরিশ (মাস্টারের প্রতি) আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে। আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।" (১১)

স্টার থিয়েটারে যেদিন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে "অনেক কথা" বলেন সেদিনের ঘটনা এবং তার পরিণতি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। সেদিন অভিনয় শেষে (বা অভিনয় চলাকালে) গিরিশ পানোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দাবী করেন যে, তাঁকে গিরিশের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ,দাবী মেনে নিতে পারেন নি। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই গিরিশের আচরণ ও ভাষা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। উপস্থিত ভক্তেরা অবস্থা বুঝে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘোড়ার গাড়িতে এনে তোলেন। কটূক্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে গিরিশও তাঁর অনুসরণ করেন—শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে মাটিতে লুটিয়ে প্রণামও করেন। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কাহিনী সকলের কাছে বলছেন এবং

তাঁদের মতামত নিচ্ছেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন "ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিয়া যাকে তাকে বলেন 'শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালা-গালি দিয়াছে।' অনেকেই বলিতে লাগিল 'ওটা পাষণ্ড, আমরা জানি; ওর কাছেও আপনি যান?'...পরে রামদাদা [রামচন্দ্র দত্ত] উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর সমস্তই বলিলেন ...তিনি [রামদত্ত] বলিলেন, 'বেশ তো করিয়াছে।' ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শোনো, শোনো, রাম কি বলে শোনো, আমার পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়াছে, তবু বলে বেশ করিয়াছে। রামদাদা বলিলেন— 'হ্যাঁ ত। কালীয় নাগকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়না করিয়া বলেন তুমি কি নিমিত্ত বিষ উদ্‌গিরণ কর?' কালীয়নাগ বলিয়াছিল 'ঠাকুর, তুমি আমায় বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্‌গিরণ কিরূপে করিব?' আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, তাই দিয়া আপনার পূজা করিয়াছে।" (১২)

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই উত্তরটিরই অপেক্ষা করেছিলেন, কারণ ইতিমধ্যে গিরিশের অনু-শোচনার বেদনা তাকে স্পর্শ করেছিল। তিনি গিরিশের কাছে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সেইদিনই আমরা তাঁকে আবার দেখতে পেলাম গিরিশের বাড়িতে— উপযাচক হয়ে এসেছেন। অনুতপ্ত গিরিশ তীব্র বেদনার পরে এক অনাবিল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন তাঁকে নতুন উপলব্ধি এনে দিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহচর লাটু মহারাজ পূর্বরাত্রে ঘটনার সময় থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন। উত্তেজনা সত্ত্বেও গুরুর নিষেধে তিনি গিরিশকে বাধা দিতে পারেন নি। গিরিশ-সদনেও তিনি এসেছিলেন গুরুর সঙ্গী হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গিরিশের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন তখন গিরিশ কি করেছিলেন, কি বলেছিলেন, তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন লাটু মহারাজ:

"ঠাকুর এসেছেন শুনে তিনি [গিরিশ] কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলেন। তাঁকে [শ্রীরামকৃষ্ণকে] দেখেই সটান তিনি মাটিতে শুয়ে পড়লেন। ঠাকুর যখন বললেন 'হয়েছে হয়েছে' তখন তিনি মাটি ছেড়ে উঠলেন। পরে কত কথা বললেন। সেদিন গিরিশবাবুকে বলতে শুনেছি 'আজ যদি তুমি না আসতে ঠাকুর! তাহলে বুঝতুম তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারো নি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসে নি। তুমি আমাদেরই মতো একজন, লোক ভাঁড়িয়ে খাও। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই; আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি তোমায় ছাড়ছি নি। আমার সব ভার তোমার ওপর দিয়ে দিলুম। বল তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।" (১৩)

এই ঘটনার পরে গিরিশের মনোজগতে কেবল নয়, বাহ্যিক আচার আচরণেও পরি-বর্তনের সূচনা হয়। শ্রীশচন্দ্র মতিলাল 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "ঐ

ঘটনায় গিরিশ নিজ পানাসক্তি ত্যাগ করিতেও যে কৃতসংকল্প হন, একথাও আমরা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। এখন হইতে যখন-তখন পানদোষে রত হইতে কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই।" (১৪)

প্রশ্ন হলো, এ ঘটনাটি কোন্ নাটক দেখার সময় ঘটেছিল ?

শ্রীম'র দিনলিপি অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারির (১৮৮৫) কিছুদিন পূর্বে। কথামৃতে স্টার থিয়েটারে মোট তিনখানি নাটক দেখার কথা আছে—চৈতন্যলীলা (২১. ৯. ৮৪), প্রহ্লাদচরিত্র (১৪. ১২. ৮৪) এবং বৃষকেতু (২৫. ২. ৮৫)। ২৭-১২-৮৪ থেকে ২১. ২. ৮৫ পর্যন্ত কোনো দিনলিপি কথামৃতে নেই। এই সময়ের মধ্যে গিরিশের একমাত্র নতুন নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে-ছিলেন, এ কথা জানতে পারি অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' থেকে। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক দেখার দিন যে কোনো বিসদৃশ ঘটনা ঘটে নি বরং সেদিন গিরিশ অত্যন্ত সংযত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ কথামৃতের বর্ণনা। সে সময় গিরিশের আচরণে মনে হয়েছে, তখনো তিনি ততখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন নি। অথচ পরবর্তী ২২ ফেব্রুয়ারির (১৮৮৫) বর্ণনায় দেখতে পাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে নিঃসন্দিগ্ধ। তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি পূর্ববর্তী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এই সব কারণে অনুমান করতে চাই .

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দেখার দিন গিরিশচন্দ্র সকল সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে ছিলেন —ঐদিন নাটকে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। চতুর্থঅঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্তার পর (চারটি অঙ্কে এই নাটক রচিত) যখন তিনি গিরিশকে আলিঙ্গন করেন তখনই গিরিশের মনে তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করে সেবা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এই অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে ছিলেন বলে মনে হয় না কারণ এই দৃশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভুজমূর্তি ধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করত। এই দৃশ্যটি যে কতখানি উদ্দীপক ছিল, তা আমরা জানতে পারি গৌরাঙ্গের ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীর কথা থেকে : "সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার [নিমাই-সন্ন্যাস] অভিনয় না দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।" (১৫)

সুতরাং ঐদিন নাটক শেষ হওয়ার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের ব্যবহারে রঙ্গস্থল পরি-ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং গিরিশের জন্য "মার কাছে" প্রথম প্রার্থনা জানান।

এই ঘটনার পর গিরিশের কিছু বাক্-সংযম ঘটলেও মাঝে মাঝেই তিনি মদ্যপান করে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিব্রত করেছেন। একদিনের কথা—১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। দুপুরে গিরিশচন্দ্র পানোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের

কাছে উপস্থিত হয়েছেন। জিদ ধরেছেন :

"বর দাও ভগবন্, একবৎসর তোমার সেবা করবো।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার লোক ভালো নয়—কেউ কিছু বলবে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের মদ্যপান যতটা সহজভাবে নিয়েছেন; অন্যের কাছে—বিশেষ করে দেবমন্দিরে অবস্থানকালে—তা অবশ্যই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর চিন্তা এর জন্যে গিরিশের অন্যের নিন্দাভাজন, এমনকি অপমানিত হবারও সম্ভাবনা আছে।]

"গিরিশ—তা হবে না, বলো—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার বাড়িতে যখন যাবো—

"গিরিশ—না, তা নয় ! এইখানে করবো—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(জিদ দেখিয়া) আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

ঐ অবস্থাতেও কিন্তু তাঁর স্নেহ বিচলিত হয় নি। গাড়োয়ান বিলম্ব দেখে গিরিশকে ডাকাডাকি করছে—গিরিশ উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্বেগ—তিনি শ্রী-মকে বলছেন "ছাখো, কোথায় যায়—মারবে না তো !" অগত্যা শ্রীমকেও যেতে হলো।

তবে এদিনের একটি কথায় বোঝা যায়, গিরিশ এখন আর পূর্বের মতো মদ্যপান করেন না :

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তো পবিত্র আছো—তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি ! তুমি তো আনন্দে আছো।

"গিরিশ—আজ্ঞা না। মন খারাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম।" (১৬)

॥ ৩ ॥

এ রকম ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে—কিন্তু আশ্চর্য এই, এত দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও গিরিশ রামকৃষ্ণের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন নি। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই সে-অভাব দূর করতে পেরেছেন—অনাস্বাদিত মাতৃস্নেহধারাই তিনি পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁব একটি অভিজ্ঞতা :

শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন এক বাটি পায়েস নিয়ে, গিরিশ এসে খাবে। উপস্থিত ভক্তদের সকৌতুক প্রচেষ্টা, কেমন করে সে বাটিটি আয়ত্ত করবে। তিনি হাত দিয়ে আঁকড়ে রেখেছেন—আর কেউ যেন না নিয়ে নেয়। অবশেষে গিরিশ এসে পৌঁছেছেন—তারপর :

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন 'ও গিরিশ, তোর জন্যে এই পায়স রেখেছি, তুই খেয়ে নে। ওরা খাবার জন্যে কাড়াকাড়ি করতে চাচ্ছে।'

এই বলিয়া বাঁ হাত গিরিশবাবুর কাঁধে দিয়া মা যেমন আট বছরের ছেলেকে মুখে তুলিয়া তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়, তিনি তেমনি ডান হাতে করিয়া একটু একটু করিয়া গিরিশবাবুর মুখে দিতে লাগিলেন। অবশেষে বুড়া আঙুল দিয়া বাটি চেঁচে বাটির গায়ে যে সব লেগেছিল, তাহাও চেঁচে খাওয়াইতে লাগিলেন।...গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন 'কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি গিরিশঘোষ বুড়ো মিন্সে, কলকাতার বদমাস গুণ্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি,...কিন্তু তিনি যখন বাঁ হাত আমার কাঁধে দিয়ে ডান হাত দিয়ে আমার মুখে পায়স দিতে লাগিলেন তখন আমি যেন সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত-আট বৎসরের শিশু বালক হয়ে গেলুম। হ্যাঁ-না বলবার বিদ্যেবুদ্ধিও সব যা কিছু বল, সব যেন কোথায় চলে গেল।" (১৭)

আর একদিনের একটি ছবি এঁকেছেন শ্রীম। তিরোভাবের মাত্র চারমাস পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শয্যাশায়ী—

"গিরিশ, লাটু, মাস্টার ওপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন।...

"ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টারকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিরিশকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) ভালো আছো? (লাটুর প্রতি) এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে!

"কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন 'কিছু জলখাবার এনে দে।'

"লাটু—পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে।

"ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন।.. দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরিশকে দিলেন।

"ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'জলখাবার কি এলো?'...

"গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজে হাতে করিয়া, খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি।

"গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন, এখানে বেশ জল আছে।

"ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

"ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন?—দেখিতেছেন ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই।

দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন ঠাণ্ডা কি না। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভালো জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ জলই দিলেন। ··

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) কচুরি গরম আর খুব ভালো।···লুচি থাক। কচুরি খাও।···

"গিরিশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)···অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে বলে এসো আজ আর কিছু না খায়।" (১৮)

মায়ের মতো স্নেহে খাইয়েছেন আবার মায়ের মতোই উৎকণ্ঠা—যদি কোনো অসুখ করে!

স্নেহধন্য গিরিশচন্দ্র এই স্নেহের প্রকৃতি বিচাব করতে বসে সমস্যায় পড়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"পিতৃস্নেহ আমাদের পুত্র না হইলে, আমরা কোনোরূপে বুঝিতে পারি না। মাতৃ-স্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃস্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরম-হংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কোনোও উপায় নাই।···পিতামাতার স্নেহে কখনও স্বার্থ-লক্ষিত হয়। পিতাকে গুণবান সন্তানের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রেব অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতামাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হইতে তাঁহাদের বৃদ্ধকালের বিশেষ কার্য হইবে। নির্গুণ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ অধিক, কিন্তু গুণবান সন্তানের গুণই কখনও কখনও মাতার স্নেহের ত্রুটির কারণ হয়। পিতৃমাতৃস্নেহ অতি উচ্চ স্নেহ, কিন্তু একেবারে স্বার্থস্পর্শ নাই, একথা বলা যায় না। পিতামাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংস-দেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ কিরূপে অনুভব করিব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করিব।···

"আর এক কথা—পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্ব-গণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুব কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায়, তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয়ত বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ অ-হেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের

একটি নাম পতিতপাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি।...পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল প্রকৃতি থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না।" (১৯)

॥ ৪ ॥

গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তন কোনো ও আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনাসূত্রে হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের ক্ষেত্রে যেভাবে পরিবর্তন এসেছে—গিরিশের তা-ও হয় নি। কারণ গিরিশচন্দ্রের মানসিক গঠনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভালভাবেই জানতেন। জানতেন, এ-ভাবে পরিবর্তন ঘটলে তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারাবার সম্ভাবনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবারই বলেছেন, গিরিশকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে কিন্তু অবাক করে দেবার মতো কোনো ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি যেন একটি নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে এর তাৎপর্য বুঝেছিলেন: "তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোনো কার্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে।" (২০)

গিরিশের পরিবর্তন এসেছে ক্রমে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিষের তাৎপর্য বুঝেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় গিরিশ যতদিন গুরুকে সম্মুখে পেয়েছেন, ততদিন তাঁর একটা অন্য জোর ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে ছিলেন নিশ্চিন্ত—তাঁকে পূর্ণব্রহ্মরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকটাই ছিলেন উদাসীন। তাঁর জীবনে নতুন সঙ্কট দেখা দিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-তিরোভাবের পর—নিষেধ না করার যে পরম নিষেধ, তাকে উপলব্ধি করলেন তিনি। তখন "অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়। কোথায় কোনো ঘৃণিত আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম 'মহাশয়, আমি ত মিথ্যা কথা কই, কিরূপে সত্যবাদী হইব? 'তিনি বলিলেন, 'তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মতো সত্য-মিথ্যার পার।' মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না।" (২১)

গিরিশচন্দ্র বলেছেন, "পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী—সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য! তাঁহার কৃপায় যদি আমার কোনো গুণ বর্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার, তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন।" (২২)

প্রথম পরিচয় থেকেই এই স্নেহধারায় গিরিশ অভিষিক্ত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র জানতেন তাঁর কৃতকার্যের কথা, তাঁর জীবনের কথা, যে জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। রামকৃষ্ণকে যখন তিনি গুরুরূপে বরণ করেন নি তখনই অকপটে তিনি বলেছিলেন "মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।" এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এক আশ্চর্য আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন: "হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়?"

স্নেহ ও আশ্বাস—এই দুই শক্তিতেই গিরিশ এগিয়ে গেছেন—নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন—অবশেষে জয়ী হয়েছেন।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে অন্যসকলের থেকে পৃথক করে এতখানি স্বাধীনতা দিয়ে ধীরে ধীরে আত্মশুদ্ধির পথে এগোতে দিলেন কেন? কেন তিনি গিরিশের সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে নিয়েও তাঁকে পরম স্নেহে রক্ষা করলেন অন্তের আক্রমণ থেকে? কারণ তিনি জানতেন, নিজের আধ্যাত্মিক-শক্তিতে গিরিশকে জোর করে ছিনিয়ে আনলে তিনি ভক্ত-গিরিশকেই শুধু পাবেন—নাট্যকার-গিরিশকে হারাতে হবে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে এ এক মস্ত বড় ক্ষতি। বঙ্গসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এ ক্ষতি রোধ করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি নাটকের সঙ্গে লোকশিক্ষার সহজ সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করেছেন। যে দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের মাত্র অক্ষরপরিচয় আছে—যেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ অশিক্ষিত—সেখানে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের ভার গ্রহণ করতে পারে নাটক। তাই লোকশিক্ষার এই সহজ বাহনটিকে পরম স্নেহে ও আশ্রয়ে পরিপুষ্টি দান করেছেন। গিরিশের মঞ্চত্যাগ তাই কোনো সময়েই তাঁর সমর্থন পায় নি—বরং গিরিশের সকল ভার আপন হাতে তুলে নিয়ে অবাধ স্বাধীনতায় তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন—মুক্ত গিরিশ প্রতিশ্রুতিমতো আজীবন সেবা করে গেছেন রঙ্গমঞ্চের।

গিরিশচন্দ্রের কথা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসবার পর তিনি অনেকবার সন্ন্যাসলাভ ও মঞ্চত্যাগের—অনুমতি প্রার্থনা করেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'না থাক, ওতে অনেকের উপকার হচ্ছে।' অনেকের উপকারের সব চেয়ে বড় দিক যে লোকশিক্ষা বিস্তারের মধ্যে সে কথা অনস্বীকার্য; কিন্তু উপকারের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যা গিরিশচন্দ্র পরে উপলব্ধি করেছেন। মহৎ ভাবসমূহ যেমন দর্শককে অভিভূত করে তেমনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সমভাবে আলোড়িত করে

তাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারে। গিরিশচন্দ্র এর প্রমাণ পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই। বিনোদিনী যে অপর 'প্রত্যক্ষ' কারণেই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করুন না কেন, 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাইসন্ন্যাস' অভিনয়ের সময়ে তাঁর স্বভাব ও আচরণের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছিল, সেকথা তাঁর আত্মজীবনী (আমার কথা) থেকেই জানতে পারি। (২৩) আরও অনেক অভিনেতা—অভিনেত্রীর মধ্যেও এই পরিবর্তন দেখা গেছে—যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

মহৎ আদর্শ নিয়ে রচিত নাটকে অভিনয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনতে পারে—আর তাদের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা স্থাপন করলে তারা আদর্শের সুনির্দিষ্ট পথও পেতে পারে। এ ছাড়া আরও একটা সাধারণ দিক আছে, যা উপেক্ষনীয় নয়। সেকালে অভিনেত্রীরা এসেছিল যে সমাজ থেকে, সেখানে তাদের বাঁচবার জন্যে নিজেদের রূপ ও যৌবনকে পণ্য করা ভিন্ন পথ ছিল না। রঙ্গমঞ্চই তাদের একটা বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পেরেছিল। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের এই ভূমিকা সম্পর্কে কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"দেখ যাঁরা বেশ্যা ও মূর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলেন, তাদের আমি একটা কথা বলতে চাই।...এই বেশ্যা আর মূর্খ তো সমাজে বিদ্যমান আছে, তাদের ত্যাগ করা, কি ঘৃণা করাই কি সমাজসংস্কার? যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য—কোনো অবতার পুরুষই এদের ত্যাগ বা ঘৃণা করতে শেখান নি। আমি ঐ মহাপুরুষদের অনুসরণ করার দম্ভ করি না, কিন্তু যা হোক বেশ্যাদের একটি নতুন পথে চালিত কর্চ্ছি, যে পথে তারা ইচ্ছা করলে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্যলোককে প্রলোভিত করতে ক্ষান্ত থাকবে।" (২৪)

রঙ্গমঞ্চের এই ভূমিকা যে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত তা গিরিশচন্দ্রই উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বলেছেন :

"দেখ, আমি যখন ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই তখন থিয়েটার ছাড়বার এক একবার ঝোঁক হতো। কিন্তু ঠাকুর ছাড়তে চাইলেই বলতেন 'না না থাক—ওতে অনেক উপকার হচ্ছে।' এর মর্ম আমি তখন বুঝতে পারি নি। এখন মনে হয়, আমি নিজে কিছু করছি না, তাঁরই কাজ করছি। নাটকে তাঁরই ভাবের প্রচার হচ্ছে, আর রঙ্গালয় পতিত পতিতার আশ্রয়।" (২৫)

গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহকে বলেছেন স্বার্থস্পর্শহীন। প্রকৃতই গিরিশের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্বার্থে নয়, পরার্থে। যে-গিরিশ পাঁচজনের উপকার করবে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে—সেই গিরিশকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন—আশ্রয় দিয়েছেন গিরিশের মধ্যে দিয়ে শিশু রঙ্গরঙ্গমঞ্চকেই। বিদগ্ধ সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা-বঞ্চিত রঙ্গমঞ্চকে গ্রহণ করে

তৃতীয় অধ্যায়

মঞ্চের রাজা এবং মঞ্চের দেবতা

"থিয়েটার-গুলো আর করা কেন ?"—গিরিশের প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তরের উপর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি কতখানি নির্ভর করেছিল, তা কি আজ সঠিক বোঝা সম্ভব ? অথচ সেদিন একটি মুখের কথার ওপরই নির্ভর করছিল প্রফুল্ল-বলিদান,জনা-বিল্বমঙ্গল-বুদ্ধদেবচরিত, সিরাজদ্দৌলা-মীরকাশিম-ছত্রপতি শিবাজী লেখা হবে কি না !

গিরিশচন্দ্র জেদী মানুষ—যখন যা ধরেছেন তা সফল করে তবে শান্ত হয়েছেন। আজ তাঁর নতুন জেদ—থিয়েটার আর নয়। কিন্তু বাধা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বললেন "না, না, ও থাক—ওতে লোকশিক্ষা হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন—"না গো কর্ম ভালো। জমি পাট করা হলে যা কইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হোল।' যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখে-ছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্যে রাখবে।" (১)

এত সহজে থামবার মানুষ গিরিশচন্দ্র নন। আবার জিদ ধরেছেন :

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—"আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না ইদিক উদিক দুদিক রাখতে হবে, জনকরাজা ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।" (সকলের হাস্য)

গিরিশ—"থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না না ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্ছে।" (২)

নাটক বা মঞ্চের চিত্তরঞ্জনীবৃত্তির অতিরিক্ত একটা ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বরাবরই

সচেতন। বক্তৃতা বা উপদেশে প্রদত্ত শিক্ষার শুষ্কতাকে তিনি কোনোদিনই পছন্দ করেন নি। নাট্যকার বা অভিনেতা ইচ্ছা করলে নাটক ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালার সঙ্গে আলোচনাকালে সেই কথাই বলেছেন :

নীলকণ্ঠ : "আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : "তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য। অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু'একটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কতলোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।" (৩)

গিরিশের বৈরাগ্য-ব্যাকুলতা সহজে যাবার নয়—শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর আবার তা প্রবল হয়েছিল—সঙ্কল্প আরও দৃঢ়—এবার আর বাধা দেবার কেউ নেই। না, তবু একজনের সম্মতি চাই। সেই উদ্দেশ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর কাছে। ফলাফলটা কি হয়েছিল গম্ভীরানন্দের কাছ থেকেই শুনি :

"সংসারতাপে ক্লিষ্ট গিরিশবাবু একদিন শ্রীচরণে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা নিবেদন করিলে শ্রীমা সম্মতি দিলেন না। বুদ্ধিমান ও শব্দপ্রয়োগনিপুণ মহাকবি আধঘণ্টা ধরিয়া নানা-ভাবে শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সম্মুখে অতি অল্পলোকই স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বীয় সিদ্ধান্ত হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।...[ব্যর্থ মনোরথ গিরিশ] এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা লইয়া পুস্তক সকল প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।" (৪)

শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ ও নির্দেশই যে সারদাদেবীর যুক্তির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

থিয়েটার ছাড়ার আগ্রহ গিরিশের বরাবরই ছিল—পারেন নি শ্রীরামকৃষ্ণের (পরে সারদাদেবীরও) নিষেধে। সেবার একটা সুযোগও এসে গিয়েছিল। তিনি তখন অসুস্থ—হাঁপানি বেড়েছে। এই অবস্থায় [অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন] "গিরিশভক্ত অনেকেই গিরিশবাবুকে অনুরোধ করিলেন 'মশাই আর কেন, শরীর ভালো নয়, বয়সও হয়েছে, থিয়েটার ছেড়ে দিন।' গিরিশবাবু বলিলেন 'বেশ তো, এখুনি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, তবে তোদের রাজাকে [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] জিজ্ঞাসা করে আয়। তিনি যদি বলেন, আমি এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। যাঁহারা এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহারা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ধরিলেন; বলিলেন 'আপনি বললেই গিরিশবাবু থিয়েটার ছেড়ে দেন।' উত্তরে রাখাল মহারাজ বলিলেন 'না না ঠাকুর ত ওঁকে থিয়েটার করতেই বলে গেছেন;

তা কি হয় ? যতদিন ইচ্ছা থিয়েটার করুন, আমি কি বারণ করতে পারি ?' বাস, রায় বহাল রহিল। গিরিশবাবু থিয়েটার করিতে লাগিলেন।" (৫)

শেষ পর্যন্ত এই অভিনয়ের সূত্রেই গিরিশের মৃত্যু হয়।

মিনার্ভায় বলিদান নাটকের অভিনয় (৩০ আষাঢ় ১৩১৮)। হ্যাণ্ডবিল-পোস্টারে ছাপা হয়ে গেছে, গিরিশচন্দ্র নামছেন করুণাময়ের ভূমিকায়। অভিনয়ের দিন সন্ধ্যা থেকে প্রবল বৃষ্টি —দর্শক সমাগমও বেশি হয় নি। কিন্তু ক্রমশঃ গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখার জন্যই ভিড় বাড়তে শুরু করল। সেই বৃষ্টির মধ্যে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে এলেন। অনেকে অনুরোধ করলেন, "আজ এই দুর্যোগে আপনার নেমে কাজ নেই। একে হাঁপানি—খালি গায়ে অভিনয় করে ঠাণ্ডা লেগে বাড়াবাড়ি হতে পারে।" নিষেধ শুনলেন না গিরিশচন্দ্র, বললেন "এই দুর্যোগেও যাঁরা আমার অভিনয় দেখতে এসেছেন, তাঁদের বঞ্চিত করব না। এতে যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তো উপায় নেই।" সেই আশঙ্কাই সত্য হলো—ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তাঁর ব্যাধির প্রকোপ বাড়ল—সেটাই তাঁর কালব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। গুরুর আদেশ পালন করে বীরের মৃত্যুবরণ করলেন তিনি।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ সম্পর্কের ক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে তার গতি সরল ছিল না —সংশয় ও সংঘাতের পথে তা অগ্রসর হয়েছে এবং এই অতিক্রমণের পথে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ও ধৈর্য অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। প্রবল ভক্তিবিশ্বাস সত্ত্বেও গিরিশের জীবনের বক্রগতি অনেক সময়ই অবস্থা জটিল করে তুলেছে। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশের প্রতি অপার স্নেহ ও দৃঢ় বিশ্বাস পরিস্থিতিকে সহজ ও সরল করে দিয়েছে। ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ 'চৈতন্যলীলা' দেখার দিন থেকে ১৪ ডিসেম্বর, 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখার দিন পর্যন্ত—প্রায় তিনমাস সময়ে গিরিশের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা আগে আলোচনা করেছি। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখার দিন গিরিশ প্রথমদিকে তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী নাটক 'নিমাই সন্ন্যাসে'র প্রথম অভিনয় ১৬ মাঘ ১২৯১ (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রকাশিত রচনাবলীতে ও অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে ১৬ মাঘ ১২৯১, ইং ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫, প্রথম অভিনয়ের তারিখ হিসাবে উল্লেখিত। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে গবেষণারত শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে একটি পত্রে জানিয়েছেন, তারিখটি সঠিক নয়—'নিমাই সন্ন্যাস' প্রথম অভিনীত হয় ১০

জানুয়ারি, ১৮৮৫)। এই নাটকে গিরিশ তাঁর সেইকালের মানসিক অবস্থা অপূর্ব কৌশলে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার দিন গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন :

"আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস কর, হয়ে যাবে।"

"গিরিশ—আমি যে পাপী!"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।"

"গিরিশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না একেবারে দপ করে আলো হয়।"

"গিরিশ—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার যদি আন্তরিক হয়—আমি কি বলব? আমি খাই দাই তাঁর নাম করি।" (৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয় দেখাব জন্য স্টাব 'থিয়েটারে আগমন, নটীকে আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি গিরিশচন্দ্রকে আশ্বাসদান গিরিশের মনে এক নতুন শক্তি জাগিয়ে তুলেছিল। 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর ঘটনার পরেই গিরিশচন্দ্র রামদত্তের অঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ছিলেন (পূর্ব-অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি) 'নদে টলমল টলমল কবে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' গানের সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায়—যা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল 'রামদত্তের আঙ্গিনা টলমল করিতেছে'। এই পটভূমিকায় যখন তিনি 'নিমাই সন্ন্যাস' রচনা করেন তখন স্বভাবতই গৌরাঙ্গরূপে 'শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি আভাসিত হয়েছে। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটির নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে, আছেও, কিন্তু নাট্যকারের মানসিক পরিচয়ের দিক থেকে দৃশ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'নট' ও 'নটী' দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার যেমন নিজের আত্মোপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি সেইসঙ্গে রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি নট-নটীদের জীবনে যে নতুন বার্তা বহন করে এনেছিল তা-ও বুঝিয়েছেন ইঙ্গিতে। এই দৃশ্যে দেখি, 'মধুর চৈতন্যলীলা'য় অংশগ্রহণকারী নটীর মনে প্রবল দ্বিধা :

মতিহীনা আমি অতি দীনা
নিগূঢ় লীলার ভাব কেমনে প্রকাশি?

প্রত্যুত্তরে নটের আশ্বাস :

ত্যজ ভয় মনে
শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত-পাবন

পতিতে লো কৃপা তাঁর অতি
—বার বার অঙ্গীকার তাঁর
যে লবে অভয় নাম
গুণধাম সদয় হইয়ে
আপনি আসিয়ে
পুরাবেন মনস্কাম তার।

নটীর দ্বিধা তবু ঘোচে না :

ক্ষুদ্র নটী—ভক্তি কোথা পাব ?
মন নহে বশ—কেমনে গাহিব ?

সংশয় ঘুচিয়ে নট তাকে আশ্বস্ত করে :

গৌরাঙ্গের মহিমা অপার
অতি নীচ—অতি প্রিয় তার
নির্ভয়ে কর লো নাম গান
ভগবান অধিষ্ঠান হবেন হৃদয়ে।

অবশেষে একটি সঙ্গীতে উভয়েব প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় গিরিশেব হৃদয়দ্বন্দ্ব ও বেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম একটি আনন্দের সুরও ধ্বনিত হযেছে :

ডাকে হে পতিত তোমায়
পতিত-পাবন পুরাও সাধ
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ।...
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে
দাও হে প্রেম সুধার স্বাদ। (৭)

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন বলে গিরিশজীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "পুরীধামে প্রবেশকালীন দূরে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিয়া যখন নিতাই ও ভক্তগণ বিভোরভাবে গাহিতে লাগিলেন 'দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ওই !' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ঐ সময় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। অভিনয়ান্তে তিনি গিরিশচন্দ্রকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।" (৮) অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই নাটক দেখার তারিখ উল্লেখ করেন নি। তবে ২৮ জানুয়ারি (মতান্তরে ১০ জানুয়ারি)থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নাটক তিনি দেখেছিলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫,স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' নাটক দেখতে যাওয়ার কথা, 'কথামৃতে' আছে। তার পূর্বেই গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে আস্থাবান হয়ে উঠেছেন—সব দিক থেকে তাঁর কাছে পরাজয়ও

স্বীকার করে নিয়েছেন। ২২ ফেব্রুয়ারির অর্থাৎ 'বৃষকেতু' নাটক দেখার তিনদিন পূর্বের দিনলিপিতে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশের আলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) হাঁ গা আমার কথা তোমরা সব কি কচ্ছিলে ? আমি খাই দাই থাকি।

"গিরিশ—আপনার কথা আর কি বলব ? আপনি কি সাধু ?

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধু টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নাই।

"গিরিশ—ফচ্‌কিমিতেও আপনাকে পারলুম না। (৯)

শ্রীম'র আরও বর্ণনা :

"গিরিশের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

"গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢঙ্ করতেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরূপ হয়। এদিকে গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!

"গিরিশ—বুঝেছি, আপনাকে এখন বুঝছি।" (১০)

এর তিনদিন পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' নাটক দেখতে যাওয়ার পথে বোসপাড়ায় গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন। গিরিশের সেদিনের মানসিক অবস্থার পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রী-ম লিখছেন :

"কিছুদিন পূর্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশ অনেক কথা বলেছিলেন ; এখন শান্ত ভাব। সেই শান্ত-ভাব লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

"তোমার এ ভাব বেশ ভালো; শান্ত ভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা-তা আমায় না বলে।

"গিরিশ (মাস্টারের প্রতি) আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে। আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।" (১১)

স্টার থিয়েটারে যেদিন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে "অনেক কথা" বলেন সেদিনের ঘটনা এবং তার পরিণতি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। সেদিন অভিনয় শেষে (বা অভিনয় চলাকালে) গিরিশ পানোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দাবী করেন যে, তাঁকে গিরিশের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ দাবী মেনে নিতে পারেন নি। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই গিরিশের আচরণ ও ভাষা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। উপস্থিত ভক্তেরা অবস্থা বুঝে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘোড়ার গাড়িতে এনে তোলেন। কটূক্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে গিরিশও তাঁর অনুসরণ করেন—শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে মাটিতে লুটিয়ে প্রণামও করেন। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কাহিনী সকলের কাছে বলছেন এবং

তাঁদের মতামত নিচ্ছেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন "ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিয়া যাকে তাকে বলেন 'শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালা-গালি দিয়াছে।' অনেকেই বলিতে লাগিল 'ওটা পাষণ্ড, আমরা জানি; ওর কাছেও আপনি যান?'...পরে রামদাদা [রামচন্দ্র দত্ত] উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর সমস্তই বলিলেন ...তিনি [রামদত্ত] বলিলেন, 'বেশ তো করিয়াছে।' ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শোনো, শোনো, রাম কি বলে শোনো, আমার পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়াছে, তবু বলে বেশ করিয়াছে। রামদাদা বলিলেন— 'হ্যাঁ ত। কালীয় নাগকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়না করিয়া বলেন তুমি কি নিমিত্ত বিষ উদ্‌গিরণ কর?' কালীয়নাগ বলিয়াছিল 'ঠাকুর, তুমি আমায় বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্‌গিরণ কিরূপে করিব?' আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, তাই দিয়া আপনার পূজা করিয়াছে।" (১২)

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই উত্তরটিরই অপেক্ষা করেছিলেন, কারণ ইতিমধ্যে গিরিশের অনু-শোচনার বেদনা তাকে স্পর্শ করেছিল। তিনি গিরিশের কাছে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সেইদিনই আমরা তাঁকে আবার দেখতে পেলাম গিরিশের বাড়িতে— উপযাচক হয়ে এসেছেন। অনুতপ্ত গিরিশ তীব্র বেদনার পরে এক অনাবিল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন তাঁকে নতুন উপলব্ধি এনে দিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহচর লাটু মহারাজ পূর্বরাত্রে ঘটনার সময় থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন। উত্তেজনা সত্ত্বেও গুরুর নিষেধে তিনি গিরিশকে বাধা দিতে পারেন নি। গিরিশ-সদনেও তিনি এসেছিলেন গুরুর সঙ্গী হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গিরিশের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন তখন গিরিশ কি করেছিলেন, কি বলেছিলেন, তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন লাটু মহারাজ:

"ঠাকুর এসেছেন শুনে তিনি [গিরিশ] কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলেন। তাঁকে [শ্রীরামকৃষ্ণকে] দেখেই সটান তিনি মাটিতে শুয়ে পড়লেন। ঠাকুর যখন বললেন 'হয়েছে হয়েছে' তখন তিনি মাটি ছেড়ে উঠলেন। পরে কত কথা বললেন। সেদিন গিরিশবাবুকে বলতে শুনেছি 'আজ যদি তুমি না আসতে ঠাকুর! তাহলে বুঝতুম তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারো নি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসে নি। তুমি আমাদেরই মতো একজন, লোক ভাঁড়িয়ে খাও। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই; আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি তোমায় ছাড়ছি নি। আমার সব ভার তোমার ওপর দিয়ে দিলুম। বল তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।" (১৩)

এই ঘটনার পরে গিরিশের মনোজগতে কেবল নয়, বাহ্যিক আচার আচরণেও পরি-বর্তনের সূচনা হয়। শ্রীশচন্দ্র মজিলাল 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "ঐ

ঘটনায় গিরিশ নিজ পানাসক্তি ত্যাগ করিতেও যে কৃতসংকল্প হন, একথাও আমরা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। এখন হইতে যখন-তখন পানদোষে রত হইতে কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই।" (১৪)

প্রশ্ন হলো, এ ঘটনাটি কোন্ নাটক দেখার সময় ঘটেছিল ?

শ্রীম'র দিনলিপি অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারির (১৮৮৫) কিছুদিন পূর্বে। কথামৃতে স্টার থিয়েটারে মোট তিনখানি নাটক দেখার কথা আছে—চৈতন্যলীলা (২১. ৯. ৮৪), প্রহ্লাদচরিত্র (১৪. ১২. ৮৪) এবং বৃষকেতু (২৫. ২. ৮৫)। ২৭-১২-৮৪ থেকে ২১. ২. ৮৫ পর্যন্ত কোনো দিনলিপি কথামৃতে নেই। এই সময়ের মধ্যে গিরিশের একমাত্র নতুন নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, এ কথা জানতে পারি অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' থেকে। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক দেখার দিন যে কোনো বিসদৃশ ঘটনা ঘটে নি বরং সেদিন গিরিশ অত্যন্ত সংযত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ কথামৃতের বর্ণনা। সে সময় গিরিশের আচরণে মনে হয়েছে, তখনো তিনি ততখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন নি। অথচ পরবর্তী ২২ ফেব্রুয়ারির (১৮৮৫) বর্ণনায় দেখতে পাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে নিঃসন্দিগ্ধ। তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি পূর্ববর্তী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এই সব কারণে অনুমান করতে চাই .

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দেখার দিন গিরিশচন্দ্র সকল সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে ছিলেন —ঐদিন নাটকে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। চতুর্থঅঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্তার পর (চারটি অঙ্কে এই নাটক রচিত) যখন তিনি গিরিশকে আলিঙ্গন করেন তখনই গিরিশের মনে তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করে সেবা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এই অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে ছিলেন বলে মনে হয় না কারণ এই দৃশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভূজমূর্তি ধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করত। এই দৃশ্যটি যে কতখানি উদ্দীপক ছিল, তা আমরা জানতে পারি গৌরাঙ্গের ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীর কথা থেকে : "সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার [নিমাই-সন্ন্যাস] অভিনয় না দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।" (১৫)

সুতরাং ঐদিন নাটক শেষ হওয়ার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের ব্যবহারে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং গিরিশের জন্য "মার কাছে" প্রথম প্রার্থনা জানান।

এই ঘটনার পর গিরিশের কিছু বাক্-সংযম ঘটলেও মাঝে মাঝেই তিনি মদ্যপান করে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিব্রত করেছেন। একদিনের কথা—১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। দুপুরে গিরিশচন্দ্র পানোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের

কাছে উপস্থিত হয়েছেন। জিদ ধরেছেন :

"বর দাও ভগবন্, একবৎসর তোমার সেবা করবো।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার লোক ভালো নয়—কেউ কিছু বলবে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের মদ্যপান যতটা সহজভাবে নিয়েছেন; অন্যের কাছে—বিশেষ করে দেবমন্দিরে অবস্থানকালে—তা অবশ্যই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর চিন্তা এর জন্যে গিরিশের অন্যের নিন্দাভাজন, এমনকি অপমানিত হবারও সম্ভাবনা আছে।]

"গিরিশ—তা হবে না, বলো—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার বাড়িতে যখন যাবো—

"গিরিশ—না, তা নয় ! এইখানে করবো—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(জিদ দেখিয়া) আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

ঐ অবস্থাতেও কিন্তু তাঁর স্নেহ বিচলিত হয় নি। গাড়োয়ান বিলম্ব দেখে গিরিশকে ডাকাডাকি করছে—গিরিশ উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্বেগ—তিনি শ্রী-মকে বলছেন "ছাখো, কোথায় যায়—মারবে না তো !" অগত্যা শ্রীমকেও যেতে হলো।

তবে এদিনের একটি কথায় বোঝা যায়, গিরিশ এখন আর পূর্বের মতো মদ্যপান করেন না :

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তো পবিত্র আছো—তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি ! তুমি তো আনন্দে আছো।

"গিরিশ—আজ্ঞা না। মন খারাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম।" (১৬)

॥ ৩ ॥

এ রকম ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে—কিন্তু আশ্চর্য এই, এত দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও গিরিশ রামকৃষ্ণের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন নি। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই সে-অভাব দূর করতে পেরেছেন—অনাস্বাদিত মাতৃস্নেহধারাই তিনি পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর একটি অভিজ্ঞতা :

শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন এক বাটি পায়েস নিয়ে, গিরিশ এসে খাবে। উপস্থিত ভক্তদের সকৌতুক প্রচেষ্টা, কেমন করে সে বাটিটি আয়ত্ত করবে। তিনি হাত দিয়ে আঁকড়ে রেখেছেন—আর কেউ যেন না নিয়ে নেয়। অবশেষে গিরিশ এসে পৌঁছেছেন—তারপর :

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন 'ও গিরিশ, তোর জন্যে এই পায়স রেখেছি, তুই খেয়ে নে। ওরা খাবার জন্যে কাড়াকাড়ি করতে চাচ্ছে।'

এই বলিয়া বাঁ হাত গিরিশবাবুর কাঁধে দিয়া মা যেমন আট বছরের ছেলেকে মুখে তুলিয়া তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়, তিনি তেমনি ডান হাতে করিয়া একটু একটু করিয়া গিরিশবাবুর মুখে দিতে লাগিলেন। অবশেষে বুড়া আঙুল দিয়া বাটি চেঁচে বাটির গায়ে যে সব লেগেছিল, তাহাও চেঁচে খাওয়াইতে লাগিলেন।...গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন 'কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি গিরিশঘোষ বুড়ো মিন্সে, কলকাতার বদমাস গুণ্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি,...কিন্তু তিনি যখন বাঁ হাত আমার কাঁধে দিয়ে ডান হাত দিয়ে আমার মুখে পায়স দিতে লাগিলেন তখন আমি যেন সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত-আট বৎসরের শিশু বালক হয়ে গেলুম। হ্যাঁ-না বলবার বিদ্যেবুদ্ধিও সব যা কিছু বল, সব যেন কোথায় চলে গেল।" (১৭)

আর একদিনের একটি ছবি এঁকেছেন শ্রীম। তিরোভাবের মাত্র চারমাস পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শয্যাশায়ী—

"গিরিশ, লাটু, মাস্টার ওপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন।...

"ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টারকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিরিশকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) ভালো আছো? (লাটুর প্রতি) এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে!

"কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন 'কিছু জলখাবার এনে দে।'

"লাটু—পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে।

"ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন।.. দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরিশকে দিলেন।

"ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'জলখাবার কি এলো?'...

"গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজে হাতে করিয়া, খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি।

"গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন, এখানে বেশ জল আছে।

"ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

"ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন?—দেখিতেছেন ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই।

দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন ঠাণ্ডা কি না। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভালো জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ জলই দিলেন। ··

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) কচুরি গরম আর খুব ভালো।···লুচি থাক। কচুরি খাও।···

"গিরিশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)···অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে বলে এসো আজ আর কিছু না খায়।" (১৮)

মায়ের মতো স্নেহে খাইয়েছেন আবার মায়ের মতোই উৎকণ্ঠা—যদি কোনো অসুখ করে!

স্নেহধন্য গিরিশচন্দ্র এই স্নেহের প্রকৃতি বিচাব করতে বসে সমস্যায় পড়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"পিতৃস্নেহ আমাদের পুত্র না হইলে, আমরা কোনোরূপে বুঝিতে পারি না। মাতৃ-স্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃস্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরম-হংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কোনোও উপায় নাই।···পিতামাতার স্নেহে কখনও স্বার্থ-লক্ষিত হয়। পিতাকে গুণবান সন্তানের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রেব অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতামাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হইতে তাঁহাদের বৃদ্ধকালের বিশেষ কার্য হইবে। নির্গুণ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ অধিক, কিন্তু গুণবান সন্তানের গুণই কখনও কখনও মাতার স্নেহের ত্রুটির কারণ হয়। পিতৃমাতৃস্নেহ অতি উচ্চ স্নেহ, কিন্তু একেবারে স্বার্থস্পর্শ নাই, একথা বলা যায় না। পিতামাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংস-দেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ কিরূপে অনুভব করিব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করিব।···

"আর এক কথা—পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্ব-গণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুব কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায়, তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয়ত বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ অ-হেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের

একটি নাম পতিতপাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি।...পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল প্রকৃতি থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না।" (১৯)

॥ ৪ ॥

গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তন কোনো ও আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনাসূত্রে হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের ক্ষেত্রে যেভাবে পরিবর্তন এসেছে—গিরিশের তা-ও হয় নি। কারণ গিরিশচন্দ্রের মানসিক গঠনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভালভাবেই জানতেন। জানতেন, এ-ভাবে পরিবর্তন ঘটলে তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারাবার সম্ভাবনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবারই বলেছেন, গিরিশকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে কিন্তু অবাক করে দেবার মতো কোনো ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি যেন একটি নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে এর তাৎপর্য বুঝেছিলেন: "তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোনো কার্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে।" (২০)

গিরিশের পরিবর্তন এসেছে ক্রমে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিষের তাৎপর্য বুঝেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় গিরিশ যতদিন গুরুকে সম্মুখে পেয়েছেন, ততদিন তাঁর একটা অন্য জোর ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে ছিলেন নিশ্চিন্ত—তাঁকে পূর্ণব্রহ্মরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকটাই ছিলেন উদাসীন। তাঁর জীবনে নতুন সঙ্কট দেখা দিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-তিরোভাবের পর—নিষেধ না করার যে পরম নিষেধ, তাকে উপলব্ধি করলেন তিনি। তখন "অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়। কোথায় কোনো ঘৃণিত আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম 'মহাশয়, আমি ত মিথ্যা কথা কই, কিরূপে সত্যবাদী হইব? 'তিনি বলিলেন, 'তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মতো সত্য-মিথ্যার পার।' মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না।" (২১)

গিরিশচন্দ্র বলেছেন, "পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী—সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য! তাঁহার কৃপায় যদি আমার কোনো গুণ বর্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার, তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন।" (২২)

প্রথম পরিচয় থেকেই এই স্নেহধারায় গিরিশ অভিষিক্ত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র জানতেন তাঁর কৃতকার্যের কথা, তাঁর জীবনের কথা, যে জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। রামকৃষ্ণকে যখন তিনি গুরুরূপে বরণ করেন নি তখনই অকপটে তিনি বলেছিলেন "মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।" এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এক আশ্চর্য আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন: "হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়?"

স্নেহ ও আশ্বাস—এই দুই শক্তিতেই গিরিশ এগিয়ে গেছেন—নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন—অবশেষে জয়ী হয়েছেন।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে অন্যসকলের থেকে পৃথক করে এতখানি স্বাধীনতা দিয়ে ধীরে ধীরে আত্মশুদ্ধির পথে এগোতে দিলেন কেন? কেন তিনি গিরিশের সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে নিয়েও তাঁকে পরম স্নেহে রক্ষা করলেন অন্যের আক্রমণ থেকে? কারণ তিনি জানতেন, নিজের আধ্যাত্মিক-শক্তিতে গিরিশকে জোর করে ছিনিয়ে আনলে তিনি ভক্ত-গিরিশকেই শুধু পাবেন—নাট্যকার-গিরিশকে হারাতে হবে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে এ এক মস্ত বড় ক্ষতি। বঙ্গসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এ ক্ষতি রোধ করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি নাটকের সঙ্গে লোকশিক্ষার সহজ সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করেছেন। যে দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের মাত্র অক্ষরপরিচয় আছে—যেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ অশিক্ষিত—সেখানে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের ভার গ্রহণ করতে পারে নাটক। তাই লোকশিক্ষার এই সহজ বাহনটিকে পরম স্নেহে ও আশ্রয়ে পরিপুষ্ট দান করেছেন। গিরিশের মঞ্চত্যাগ তাই কোনো সময়েই তাঁর সমর্থন পায় নি—বরং গিরিশের সকল ভার আপন হাতে তুলে নিয়ে অবাধ স্বাধীনতায় তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন—মুক্ত গিরিশ প্রতিশ্রুতিমতো আজীবন সেবা করে গেছেন রঙ্গমঞ্চের।

গিরিশচন্দ্রের কথা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসবার পর তিনি অনেকবার সন্ন্যাসলাভ ও মঞ্চত্যাগের—অনুমতি প্রার্থনা করেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'না থাক, ওতে অনেকের উপকার হচ্ছে।' অনেকের উপকারের সব চেয়ে বড় দিক যে লোকশিক্ষা বিস্তারের মধ্যে সে কথা অনস্বীকার্য; কিন্তু উপকারের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যা গিরিশচন্দ্র পরে উপলব্ধি করেছেন। মহৎ ভাবসমূহ যেমন দর্শককে অভিভূত করে তেমনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সমভাবে আলোড়িত করে

তাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারে। গিরিশচন্দ্র এর প্রমাণ পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই। বিনোদিনী যে অপর 'প্রত্যক্ষ' কারণেই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করুন না কেন, 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাইসন্ন্যাস' অভিনয়ের সময়ে তাঁর স্বভাব ও আচরণের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছিল, সেকথা তাঁর আত্মজীবনী (আমার কথা) থেকেই জানতে পারি। (২৩) আরও অনেক অভিনেতা—অভিনেত্রীর মধ্যেও এই পরিবর্তন দেখা গেছে—যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

মহৎ আদর্শ নিয়ে রচিত নাটকে অভিনয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনতে পারে—আর তাদের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা স্থাপন করলে তারা আদর্শের সুনির্দিষ্ট পথও পেতে পারে। এ ছাড়া আরও একটা সাধারণ দিক আছে, যা উপেক্ষনীয় নয়। সেকালে অভিনেত্রীরা এসেছিল যে সমাজ থেকে, সেখানে তাদের বাঁচবার জন্যে নিজেদের রূপ ও যৌবনকে পণ্য করা ভিন্ন পথ ছিল না। রঙ্গমঞ্চই তাদের একটা বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পেরেছিল। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের এই ভূমিকা সম্পর্কে কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"দেখ যাঁরা বেশ্যা ও মূর্খ নিয়ে থিয়েটার করাতে সমাজে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলেন, তাদের আমি একটা কথা বলতে চাই।...এই বেশ্যা আর মূর্খ তো সমাজে বিদ্যমান আছে, তাদের ত্যাগ করা, কি ঘৃণা করাই কি সমাজসংস্কার? যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য—কোনো অবতার পুরুষই এদের ত্যাগ বা ঘৃণা করতে শেখান নি। আমি ঐ মহাপুরুষদের অনুসরণ করার দম্ভ করি না, কিন্তু যা হোক বেশ্যাদের একটি নতুন পথে চালিত কর্চ্ছি, যে পথে তারা ইচ্ছা করলে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে এবং বাজারে দাঁড়িয়ে অন্যলোককে প্রলোভিত করতে ক্ষান্ত থাকবে।" (২৪)

রঙ্গমঞ্চের এই ভূমিকা যে শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত তা গিরিশচন্দ্রই উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বলেছেন :

"দেখ, আমি যখন ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই তখন থিয়েটার ছাড়বার এক একবার ঝোঁক হতো। কিন্তু ঠাকুর ছাড়তে চাইলেই বলতেন 'না না থাক—ওতে অনেক উপকার হচ্ছে।' এর মর্ম আমি তখন বুঝতে পারি নি। এখন মনে হয়, আমি নিজে কিছু করছি না, তাঁরই কাজ করছি। নাটকে তাঁরই ভাবের প্রচার হচ্ছে, আর রঙ্গালয় পতিত পতিতার আশ্রয়।" (২৫)

গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহকে বলেছেন স্বার্থস্পর্শহীন। প্রকৃতই গিরিশের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্বার্থে নয়, পরার্থে। যে-গিরিশ পাঁচজনের উপকার করবে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে—সেই গিরিশকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন—আশ্রয় দিয়েছেন গিরিশের মধ্যে দিয়ে শিশু রঙ্গরঙ্গমঞ্চকেই। বিদগ্ধ সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা-বঞ্চিত রঙ্গমঞ্চকে গ্রহণ করে

তিনি বাঙালী সংস্কৃতিকেই পুষ্টি দান করেছেন।
এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—শুভ অশুভ, দুদিক থেকেই
এবাব সে কথায় আসা যাক।

চতুর্থ অধ্যায়

মঞ্চপৃষ্ঠপোষক রামকৃষ্ণ : প্রতিক্রিয়া

কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণ আর কোথায় গিরিশচন্দ্র !

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—শ্রীরামকৃষ্ণ 'পবিত্র নয়—পবিত্রতা'; আর গিরিশের আত্ম-পরিচয়—'আমি যেখানে বসতাম, সে মাটি অশুদ্ধ !'

সেই গিরিশের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা অনেকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—এ তো স্বাভাবিক।

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন "ব্রাহ্মসমাজে অনেকে ঠাকুরের সংশ্রবে আসা বন্ধ করে দিলেন। কেশব সেন তখন দিব্যধামে গিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আর আসিতেন না। তিনি এত ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করিতেন যে, অনেকে প্রশ্ন করিতেন, "আপনি ঠাকুরের কাছে যান না কেন ?

"শিবনাথশাস্ত্রী—যাব কি, থিয়েটারের হীনচরিত্র লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ওখানে আর আমাদের যাওয়া চলে না।" (১)

অশ্বিনী দত্তকে প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 'গিরিশ ঘোষকে চেন ?'

'কোন্ গিরিশ ঘোষ ? থিয়েটার করে যে ?'

'হাঁ।'

'দেখি নি কখনও, নাম জানি।'

'ভালো লোক।'

'শুনি মদ খায় নাকি ?'

অশ্বিনীদত্ত এবার তাঁর না-চেনার আসল কারণটা বলে ফেললেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তা নিয়ে চিন্তা নেই : 'থাক্ না, থাক না, ক'দিন খাবে ?' (২)

এ মনোভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যেও ছিল কারণ সাধারণভাবে রঙ্গালয় সম্পর্কে সমগ্র উচ্চসমাজই ছিল বিরূপ। 'চৈতন্যলীলা' দেখতে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তের ঘটনা :

"কোনখানে বসিলে ভালো দেখা যায়, সেই কথা হইতেছে। কেউ কেউ বললেন, এক টাকার সিটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন, কেন, উনি বক্সে বসবেন।

"ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব নিতাই —এ সব অভিনয় তারা করে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(ভক্তদিগকে) আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো।

"তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।" (৩)

বামদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত কিন্তু তিনিও থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের যাতায়াত পছন্দ করেন নি। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "প্রভু যেখানে যাইতেন, রামচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু যখন থিয়েটাবে আসিয়াছিলেন, প্রভুর নিমিত্ত রামচন্দ্র ভোগ পাঠান, তথাপিতিনি স্বয়ং আসেন নাই। থিয়েটার তিনি কলুষিত জ্ঞান করিতেন।" (৪)

কেশবচন্দ্রের অনুগামীরা থিয়েটার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি ; কিন্তু এই থিয়েটারকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আসামীর কাঠগড়াতেও দাঁড় করিয়েছেন।

ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণ-জীবনী লিখেছেন—পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে **Real Mahatma** বলে অভিহিত করেছেন, যে রামকৃষ্ণ থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।' মদ্যপ গিরিশ ঘোষকে আশ্রয় দান করেছেন—বারাঙ্গনা অভিনেত্রীর মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেছেন, 'চৈতন্য হোক'—তাঁর গুণের মতো দোষের দিকটি ম্যাক্সমূলার জানবেন না, এ হয় কখনো ? ম্যাক্সমূলারকে সত্যের আলো পৌঁছে দেবার জন্যে এক 'কেশব-আত্মীয়' তাঁকে পত্র লিখলেন। সেই পত্রের উল্লেখ করে ম্যাক্সমূলার লিখেছেন :

"তাঁর শিষ্যহিসাবে কেশব সেন [প্রতাপ] মজুমদার প্রমুখদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রভাব বিস্তারের কথা আমি বলেছিলাম, তার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে কেশবচন্দ্রের কোনো আত্মীয় কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণের পূর্ববর্তী-রূপে স্থাপন করার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন—যেন দার্শনিক বা ধর্মীয় সত্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বলে কিছু হতে পাবে !···এর পর তিনি রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যেগুলি, সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, রামকৃষ্ণ-কেশব সেন সম্পর্ক নির্ণয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তিনি আমাদের যা বলেছেন, রামকৃষ্ণ যদি বারবনিতা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে নৈতিক ঘৃণা প্রদর্শন না করে থাকেন তবে এ ব্যাপারে তাঁকে অন্যান্য ধর্মনেতাদের থেকে পৃথক বলা যায় না। পাশ্চাত্যধারণা অনুযায়ী যদি তিনি পান-বিরোধী না-ও হন তবু, আমি যতদূর জানি, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ অতিরিক্ত পানাসক্তির অভিযোগ কখনো করে নি।"

সবশেষে ম্যাক্সমূলারের বিরক্ত মন্তব্য :

"এ ধরনের বাদানুবাদ ও দোষারোপ—কেশব সেন এবং রামকৃষ্ণ উভয়ের পক্ষেই অ-

প্রীতিকর হতো।" (৫) অভিযোগগুলি সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের **The Life & Sayings Of Ramkrishna** গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অম্ল-মধুর ভাষায় মন্তব্য করেছেন :

"অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না। ইহাতে অধ্যাপকের [ম্যাক্সমূলারের] উত্তর বড়ই মধুর ; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্ম-প্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

"আহা! কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরত ঈশার দয়াপ্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরও অভিযোগ, মদ্যপানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! 'একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না'—এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল বেশ্যা চোর দুষ্টদের—মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদিভাষায় সানাইয়ের পোঁ সুরে কেন কথা কহিতেন না!"…

"যাহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্তসমুদ্র পার পর্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্মের জয় ঘোষণা নিজ শক্তি বলে অত্যল্পকালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্বলোকমান্য শূরবীর মহাপণ্ডিত আপনারা—আপনারা ইচ্ছা করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা—আমরা পুষ্পচন্দন হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।…আর যাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ নামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জরিত কলেবর হইয়া বিনা কারণে বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে—হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা।" (৬)

অভিযোগের প্রধান দুটিই হলো রঙ্গালয় সংক্রান্ত—লক্ষ্য, রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীকুল ও গিরিশচন্দ্র। রঙ্গালয়ের জন্যই এই অপাপবিদ্ধ মানুষটির বিরুদ্ধে অভিযোগ গেছে সুদূর ইংলণ্ডে। কিন্তু এ অপরাধ তো একা শ্রীরামকৃষ্ণের নয়।

একদল লোক একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে এলো যীশুর কাছে। লোকগুলির নিবেদন, 'প্রভু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারিনী। মুশা তাঁর আইনে নির্দেশ দিয়েছেন—ব্যভিচারিনীর শাস্তি। সেই নিয়ম অনুযায়ী সকলে একে পাথর ছুঁড়ে মারবে।—এখন আপনি অনুমতি দিন।

মাথা নিচু করে নিরুত্তর-যীশু মাটিতে কি লিখছেন।

প্রভু কি শুনতে পেলেন না ! সুতরাং আবার—বারবার তারা উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করল অনুমতি।

এবার ধীরে ধীরে মাথা তুললেন যীশু। বললেন, 'বেশ, তোমাদের মধ্যে জীবনে যে কখনো কোনো পাপ করে নি—সে-ই প্রথম পাথরটি ছুঁড়ে মার।'

তারপর আবার মাথা নিচু করে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার মাথা তুললেন যীশু। কেউ নেই—শুধু তার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধিনী।

'তোমাকে ওরা কেউ মারে নি ?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'না প্রভু' : অপরাধিনীর সকুণ্ঠ উত্তর।

'আমিও তোমাকে অভিযুক্ত করছি না। যাও, আর কোনোদিন পাপ কোরো না'—ক্ষমাস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন মহাপুরুষ। (৭)

যীশুর সঙ্গে খেতে বসেছে নাম করা পাপীরা—ফরিসিরা তাই দেখে নানান কথা বলাবলি শুরু করেছে : 'কি গো, তোমাদের পবিত্র প্রভু ওদের সঙ্গে বসে খাচ্ছেন কোন শাস্ত্রমতে ?'

যীশুর কানেও গেল সে কথা। বললেন 'যারা সুস্থ তাদের চিকিৎসার কি প্রয়োজন ? চিকিৎসা তো তারই দরকার যে অসুস্থ।'

শাস্তি নয়—দয়া। দয়া দিয়েই ধুয়ে দিতে হবে পাপ।

'আমি তো পুণ্যবানকে ডাক দিতে আসি নি। ডাক দিতে এসেছি পাপীকে—পাপীকে তার অনুশোচনায়।' (৮)

রাজগৃহ থেকে কুশীনগরে এসে পৌঁছলেন ভগবান বুদ্ধ।

এসে উঠলেন জনপদবধূ আম্রপালির আম্রকাননে। বুদ্ধ এসেছেন শুনে আম্রপালি এলেন বুদ্ধ সন্দর্শনে। আহারের নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর আবাসে। আম্রপালি বিদায় নেবার পরই লিচ্ছবিরাজেরা এসে উপস্থিত। তাঁরাও আহারের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের প্রাসাদে। সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তথাগত বললেন 'আমি তো আপনাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব না কারণ আমি কাল আম্রপালির গৃহে আহার গ্রহণ করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

যথাসময়ে তিনি আম্রপালির গৃহে গেলে আম্রপালি সভক্তি অতিথি সৎকার করলেন—তারপর নিজের আম্রকুঞ্জ দান করলেন তাঁকে।

পরে আম্রপালি নিজেকেও সমর্পণ করলেন বুদ্ধের চরণপ্রান্তে।

বুদ্ধের সহচর ও একান্ত ভক্ত জীবক তো গণিকা শালবতীর পুত্র। (৯)

কে না চেনে জগাই মাধাইকে? সকল কু-কাজের মধ্যমণি সেই জগাই-মাধাইকেও পরিত্যাগ করেন নি শ্রীচৈতন্য। দয়ার পুণ্যধারায় তাদের সব মালিন্য মুছে দিতে চৈতন্যের নিত্যসঙ্গী নিত্যানন্দের ললাটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে রইল কলসীর-কানার চিহ্ন।

জৈন সাধু বিপুলমতীর একটি কাহিনী : এক সুন্দরী বারবনিতার মৃত্যু হয়েছে। সৎকারের জন্য তার দেহ যখন শ্মশানে এনে উপস্থিত করল তখন সেখানে ছিল এক লম্পট। সেই অপরূপ সুন্দরী বারবনিতার মৃতদেহ দেখে সে ভাবল 'যদি জীবিতাবস্থায় একদিনের জন্যও দেহটি উপভোগ করতে পেতাম!'
উপস্থিত ছিল একটি কুকুর। তার মনেও ক্ষোভ: 'আহা! এমন চমৎকার মাংসটা যদি খেতে পাওয়া যেত!'
উপস্থিত ছিলেন আরও একজন—এক যোগী। তাঁর মনেও ক্ষোভ 'আহা! এমন সুন্দর আধারটি পেয়ে মেয়েটি যোগসাধনা করল না!' (১০)
একই স্থান-কাল-পাত্র। তফাৎ শুধু দৃষ্টির!
শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীর দৃষ্টি দিয়েই পতিতাকে দেখেছেন—আনন্দময়ী মাতৃরূপে। আশীর্বাদ করেছেন চৈতন্যলাভের।

॥ ২ ॥

একদিকে যেমন অশুভ প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নতুন দৃষ্টি।
থিয়েটারে বারবনিতার ভূমিকার প্রতিবাদে যে শোরগোল চলছিল—রামচন্দ্র দত্তই প্রথম এগিয়ে এলেন তার বিরুদ্ধে।
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই তাঁর ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে রামদত্ত প্রকাশ করলেন 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকা। তার প্রথম সংখ্যাতেই একটি প্রবন্ধ 'সমাজ ও নীতি—অভিনয়।' রঙ্গমঞ্চ ও নাটক লোকশিক্ষার বাহনরূপে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সমকালীন রঙ্গমঞ্চকে সমর্থন করে প্রবন্ধকার লিখেছেন : "আমরা পূর্বের থিয়েটার দেখিয়াছি এবং এক্ষণেও দেখিতেছি। যদ্যপি ইহাদের তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে কি প্রভেদ যে দৃষ্ট হইবে, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য অভিনয় দ্বারা সাধারণ ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে। বিশেষতঃ স্টার

থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু গিরীশ [গিরিশ] চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃত চৈতন্যলীলা, প্রভাস মিলন [প্রভাস যজ্ঞ] এবং বুদ্ধ চরিত্রের [বুদ্ধদেব চরিত] অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে তৃপ্তিলাভ হইতেছে তাহা আমরা নূতন আর কি বলিব ; সর্বসাধারণে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।"

রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রবন্ধকারের বক্তব্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। তিনি তিনটি বিকল্পের কথা স্মরণ করেছেন : (১) নারীর ভূমিকায় পুরুষেব অভিনয় (২) বারবনিতার বদলে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের দ্বারা স্ত্রীভূমিকার অভিনয়, ও (৩) অন্য কোনো সম্প্রদায় থেকে বেশী বেতন দিয়ে 'সচ্চরিত্রা' মহিলাদের দ্বারা অভিনয়। লেখকের মতে নারীচরিত্রে পুরুষের অভিনয় সম্ভব নয় কারণ "স্বভাবে যাহা প্রসূত হয় তাহা বিকৃত করা অন্যায় ও অপ্রীতিকর।" সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা সংগ্রহের চিন্তা সমকালীন হিন্দু-সমাজের দিক থেকে অবাস্তব। অন্য সম্প্রদায় থেকে 'সচ্চরিত্রা' মহিলা সংগ্রহে প্রবন্ধকার পরামর্শ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তা সম্ভব না হলে লেখকের স্পষ্ট জবাব : "দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আমরা থিয়েটার কোম্পানীদের বারাঙ্গনাদিগের বিদায় দিতে পবামর্শ দিতে অসমর্থ হইতেছি।"

তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকার এই প্রবন্ধে বাবাঙ্গনা সম্পর্কে আলোচনা গভীর সহানুভূতিজাত। লেখক বলেছেন : "বারবিলাসিনী অপেক্ষা দয়াব পাত্রী ত্রিভুবনে আব কেহ নাই।" তাঁর বক্তব্য : "আমরা ভূরি ভূবি দৃষ্টান্ত অবগত হইয়াছি যথায় কেবল সমাজেব বাহ্যিক কঠোরতায় তাহাদের বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন কবিয়া থাকিতে হইযাছে। প্রতি বৎসব যত খুন হয় ইহাদের অধিকাংশ ঐ চিরদুঃখিনী সমাজবিতাড়িতা বারবিলাসিনী।...কৈ পুরুষদিগের প্রতি সে-ভাব কোথায় ? কে অস্বীকাব করিতেপাবেন, যে শতকরা ৯৯ জন ব্যভিচার দোষে দূষি [দোষী] কি না ? কেন সমাজ দূষি [দোষী] স্বীকার পূর্বক সমাজ হইতে দূর করিয়া না দেয় ?

থিয়েটারে বারাঙ্গনার অভিনয়দর্শনে যুবচিত্তের অধঃপতি ঘটবে এই আশঙ্কার জবাবে যুক্তি প্রদর্শন করে প্রবন্ধটির উপসংহার। 'তত্ত্বমঞ্জরী'র লেখক বলছেন যে, সাধারণত দেখা যায় স্বভাবসিদ্ধ কারণেই চরিত্রদোষ ঘটে, সে ক্ষেত্রে পিতামাতা বা বিদ্যালয়ের শাসনও নিরর্থক হয়ে পড়ে। "দুইটি কারণ ভিন্ন কোনো কার্য হয় না। একটিকে পূর্ব এবং অপরটিকে উত্তেজক কারণ বলে। যাহারা মন্দভাব ধারণ করে, তাহাদের স্বভাব এবং সেই স্বভাবানুযায়ী অবস্থা, দুয়েরই আবশ্যক। তবে কেহ বলিতে পারেন যে যাহার স্বভাব মন্দ, প্রতিকূল অবস্থাবশতঃ তাহার কার্য হইতে পারে না। আমরা তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সে স্থলে বরং এপ্রকার চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির শত বেশ্যার বাটীতে গমন করা শ্রেয়ঃ তথাপি আপন পরিবার ব্যভিচার দোষে দূষিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।"

কোনো মন্দস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি বাইরের অনুকূল পরিবেশ না পেলে নিজের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যেই হয়ত দুর্নীতি বিস্তার করতে পারে—সমাজের পক্ষে এ অবস্থা আরও বেশী ভয়াবহ।

তাই লেখকের সিদ্ধান্ত "যে যতই বলুন, আর যুক্তি মীমাংসার দোহাই প্রদান করুন, যতদিন পূর্বকারণ অর্থাৎ আপনাদের মানসিক উৎকর্ষসাধনে যত্নবান না হইবেন, তত-দিন উত্তেজক কারণ বিনষ্টের দ্বারা সমাজের এক পরমাণু কল্যাণ সাধন হইবে না।" (১১) বলা বাহুল্য, এই রচনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য ব্যক্তিগত নয়। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার। এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রেখে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এই বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি এখানে ঘটে নি—এবং তার জন্যে বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিকেও সুদূর সুইজারল্যাণ্ড থেকে নির্দেশ পাঠাতে হয়েছে। ২৩ আগস্ট ১৮৯৬, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখেছেন :

"অদ্য রামদয়ালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণে-শ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে।...তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই :

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপী-দের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরকদ্বার-রূপ বহু-ভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে প্রভেদ কি?

৩। আমাদের মহাজগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নর-নারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহাধর্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসবে, সেই ভেসে যাক্।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতই কম হয় ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে

মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। It is easier for a camel to pass through the eyes of a needle than for a rich-man to enter the Kingdom of God. এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসীভাব মনেও স্থান দিবে না।" (১২)

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামীদেব এই দৃঢ়তা রঙ্গালয়কে এবং তার পক্ষসমর্থকদের যে কতখানি শক্তি যুগিয়েছিল, সে-কালের থিয়েটার সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির পাতা ওলটালে তা দেখা যাবে। বক্রেশ্বর, বীরভূম থেকে পরমানন্দগুপ্তের একখানি চিঠি 'মজলিশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক অম্লমধুর ভাষায় বারবনিতা সম্পর্কে নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ শানিয়েছেন তাতে রামকৃষ্ণ-অনুগামীদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থনের জোবের দিকটা সুন্দর ফুটে উঠেছে :

"দু একটি হুজুগপ্রিয় যুবক, সদ্যপ্রসূত অজ্ঞাতনামা এক আধখানি সংবাদপত্র, বৃক্ষশাখা-বাসী দু'চার বৎসর বয়স্ক দু'একখানি মাসিকপত্র এবং শামাদিবিকারগ্রস্ত স্বদেশহিতৈষী কোনও সম্প্রদায়, আজকাল রঙ্গালয়ের উপর খড়্গহস্ত। বিশেষ কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণের গুণে উক্ত সম্প্রদায় ধর্মটা একচেটে করিয়া ধর্মের ফাঁদে অনেক ঊর্ধ্বশ্বাস শীকার [শিকার] কবিতেছিলেন। অগ্নিতে কীটেব পতন স্বাভাবিক, বিশেষতঃ বঙ্গ-দেশীয়। কিন্তু বিধি তায় বাদ সাধিল। কোথাকার এক বৈজ্ঞানিক তর্কচূড়ামণি, আর ফোড়াব ওপব বিষফোড়া কুমাব শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক আসিয়া সাধের এলবার্ট হলে সখের বিডন পার্কে, অপিচ 'জাতীয় রঙ্গালয়ে' কূটযুক্তি, জ্বালামালাময় ধর্মভাবের বিষম তেজপূর্ণ বক্তৃতাব জ্বালায কান ঝালাপালা করে তুল্লেন। আবার গিরিশ ঘোষটা ছিল ভালো হে; সেও দেখ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী ছেড়ে নবদ্বীপচন্দ্র—চৈতন্য ধরে বসলো। স্টারের ধরাধরি সব থিয়েটারেই ঐ সুর ধরলে। শুধু কি তাই? ঐ দেখ সাধের ভ্রাতা চৈতন্যলীলা শুনে চেতনা পেয়ে বসলো। সার্ট এলবার্ট ছেড়ে কাপড় ছিঁড়ে কপ্নী পরে, হরি হরি করে মথুবাপুবী হয়ে সটান বৃন্দাবন দাখিল। আর ঐ বুড়ো প্রচারক স্টারে বেশ্যানাচ দেখে, হরি রে, কি ঢলাঢলি না করলে। সব যায়! সব যায়। অতএব স্টার অরুচি, অভিনয় কুরুচি, চৈতন্যবুদ্ধ অশ্লীল, গিরিশ ঘোষ বাতিল, এবং শ্রোতাগণ অতি ছ্যা। হা দয়াল ব্রহ্ম! কিন্তু ভায়া যাঁরা প্রকৃত সাধুভক্ত, প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি বলেন জান? কোনো ভদ্রপল্লীতে ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে কোনো বিখ্যাত ধর্ম-বক্তাকে প্রশ্ন করায় তিনি যে উত্তর দেন তাহার কতক মর্ম এই—অভিনয়ে ধর্মবীর-গণের চিত্র বিশেষ পরিস্ফুট হয় এবং তাহা প্রকৃতি গঠনের পক্ষে মৃতঅক্ষর অপেক্ষা বেশী কার্যকর। কুলঙ্গনা ও তরলমতি বালকের দ্বারা অভিনয়, সমাজের বিশেষ অনিষ্ট-

কর। সুতরাং যাহারা করিতেছে তাহারাই করুক ; তবে ভালো হইবার চেষ্টা থাকা উচিত। যখন 'নিধিরাম' রাম সাজিলেও রামবনবাসে অশ্রুপাত করে, তখন হরিদাসী সীতা সাজিলে সীতার বনবাসে কেন কাঁদিবে না বুঝি না ; তখন তাহাকে বেশ্যাজ্ঞান করা কলুষিতদৃষ্টির কার্য। **গিরিশবাবু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ লাভ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। সাধুসঙ্গ, নানাপ্রকার ধর্মপুস্তক পাঠ করিয়াছেন। চৈতন্য বিল্বমঙ্গল ও বুদ্ধদেব চরিত পুস্তকে অনেক সারবান ধর্মকথা, অনেক গূঢ় সাধনপ্রণালীর ইঙ্গিত আছে। তাঁর থিয়েটারই দেখিবে ; তাহা সুশাসিত শুনিয়াছি। সন্ন্যাসীর নিকট স্টার থিয়েটার ও গিরিশবাবুর এই মান। রত্নবণিকই রত্নের পরিচয় জানে।**" (১৩)

বঙ্গবাণী পত্রিকায় কুমুদবন্ধু সেনের 'গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি' প্রবন্ধে গিরিশের বারবনিতা সংক্রান্ত যে মতামত প্রকাশিত হয়েছিল (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত) তা নিয়ে প্রবাসী পত্রিকা কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চ পতিতাদের আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবিকা অর্জনের একটা বিকল্প পথ খুলে দিয়েছে। তারা অন্যদিকে চালিত হবার সুযোগ পেয়েছে—থিয়েটার ভিন্ন তাদের আর দাঁড়াবার আশ্রয় কোথায় ? কিন্তু যাঁরা রুচিবাগীশ তাঁরা এদের সংস্কারের জন্য চিন্তা না করে শুধুমাত্র সমালোচনাই কবে চলেছেন।

গিরিশের এই কথাটি নিয়ে প্রবাসী প্রশ্ন তুলেছে :

"গিবিশবাবুব এই মত পড়িবার অনেক আগে আমরা পেশাদার অভিনেত্রীদের কাজের এই ভালো দিকটা দেখাইয়াছিলাম, যে তাহারা সুযোগ পাইলে ও ইচ্ছা করিলে ইহার সাহায্যে পাপ পথ ত্যাগ করিতে পাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, কয়জন তাহা করিয়াছে, করিতে উৎসাহিত হইয়াছে, বা করিবার সুযোগ পাইয়াছে।"

প্রবাসীর দ্বিতীয় প্রশ্ন "সেই দাঁড়াবার জায়গা তাহাদিগকে 'অন্যদিকে চালিত' এমনভাবে করিতেছে কি যাহাতে 'সমাজের অনেক হিত হইতে পারে ?" (গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, 'অন্যদিকে চালিত হলে এদের দ্বারা সমাজের অনেক হিত হইতে পারে।') সাপ্তাহিক 'রঙ্গদর্শনে' এর যে প্রচণ্ড উত্তর প্রকাশিত তা থেকে আমরা অভিনেত্রী-সমাজের পরিবর্তনের দিকটা লক্ষ্য করতে পারি :

"বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া, বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া এমন প্রশ্ন যে কেহ করিতে পারেন, তাহা 'প্রবাসী'র—ঐ লেখাটুকু পড়িবার পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল না। যাহারা বন্যাপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত, স্বদেশবাসীর অভাব দূর করিবার জন্য পথে ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

রাশি রাশি অর্থ ও বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহারা আজ প্রবাসীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যদি ঘৃণায় মুখ ফিরায়, কিংবা যদি বলে যে, বাবুরা অকৃতজ্ঞতায় আমাদের মতো বেশ্যাকেও পরাজিত করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রবাসী তখন কি বলিবেন ? বেশী দিনের কথা নয়—গত বৎসরে দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য 'সিমলা নারী সমিতি' অভিনয় আয়োজন করিয়া যাহা লিখিয়াছিল তাহা প্রবাসীর বাঁকাবুদ্ধির চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু দেশবাসী কখনই তাহা ভুলিবে না। 'সিমলা নারী সমিতি' থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে লিখিয়াছিল 'গঙ্গাস্নানে অধিকার কাহার নাই ? যে পাপী, তাপিত, পতিত, পীড়িত, সর্বকল্যাণ পরিত্যক্ত ভাগীরথীপুণ্যপ্রবাহ তো তাহারই উদ্ধারের জন্য। সমগ্র দেশে আজ পুণ্যচরিত দেশবন্ধুর উদ্দেশে ভক্তি-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে ; ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ এই ভক্তিপ্রবাহে অবগাহন করিয়া ধন্য হইতেছেন। দীনা সর্বসহায়হীনা আমরা, এই পবিত্র বারিপরশের যদি আমাদের সাধ হয়, সে সাধ কি অন্যায় ? তাই স্বর্গগত মহাপুরুষের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী স্মৃতিপূজার যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে সাহসী হইয়াছি। সাধ—ভিক্ষা। হে সজ্জন, আপনাদের চিরাচরিত সহানুভূতি দানে আমাদের আয়োজন সার্থক করুন, আমরা ধন্য হই, কৃতার্থ হই—মহতের চরণস্পর্শে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।' ইহাতে প্রবাসীর চৈতন্যোদয় হইবে কি ?—প্রবাসী এখন বুঝিতে পারিতেছেন কি 'থিয়েটারে দাঁড়াবার জায়গা' না পাইলে এই পতিতারা এমনভাবে চালিত হইয়া দেশের এইরূপ হিতসাধন করিতে পারিত না ? প্রবাসী তো বেশ্যা প্রসঙ্গে অনেক ওস্তাদী করিয়াছেন কিন্তু বেশ্যারা যদি আজ প্রবাসীকে পাল্টা জবাবে জিজ্ঞাসা করে যে, 'দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারে' প্রবাসী কয় পয়সা দান করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রবাসী তাহার সদুত্তর দিতে পারিবেন কি ?" (১৪)

বিভিন্ন সাহায্য-রজনী মারফৎ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান তখনকার থিয়েটারের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই সব সাহায্য-রজনীতে বিনা পারিশ্রমিকে সেকালের অভিনেত্রীরা যোগদান করতেন। অনেক সময় অবসরগ্রহণের পরেও শুধু একটি সাহায্য-রজনীতে যোগদানের নিদর্শন পাওয়া যায়। দু'একটি উল্লেখ করি :

(১) রঙ্গালয় পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় :

"আগামী ১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথি হইতে ২০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমীর দিন পর্যন্ত কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইবে।...

"এই উৎসবে সাহায্য করিবার জন্য আগামী রবিবার সন্ধ্যার পর ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইবে। এই অভিনয় দেখিবার জন্য যাঁহারা টিকিট কিনিবেন—তাঁহাদের সকলের

নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, ক্লাসিক থিয়েটারের অধিকারী সে **সমস্ত অর্থই** রামকৃষ্ণোৎসবে দান করিবেন।" (১৫)

(২) রঙ্গমঞ্চ পত্রিকায় একখানি চিঠি—লেখক তৃষিতকুমার তলাপাত্র :

"মিনার্ভা থিয়েটার ইতিমধ্যে দুটি সৎকার্য করিয়াছে। কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে একদিন আর পীড়িত, ঋণগ্রস্ত, সুকবি, সুগায়ক রজনীকান্ত সেনের জন্য একদিন 'বেনিফিট' দিয়াছে।

'জনা' ও লেডী ম্যাকবেথের অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি বহুদিন পরে সেদিন বারাণসী সেবাশ্রমের সাহায্য-রজনীতে মিনার্ভায় জনার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি পারিশ্রমিক লয়েন নাই। কেবল তিনি কেন, কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী লয়েন নাই।" (১৬)

(৩) মিস ম্যাকলাউডের ১৯।২।২৩-এর চিঠির একটি অংশ :

"…**Going in the evening to a benefit performance at the Star Theatre, for Ramkrishna Mission of Bhubaneswar, near Puri. The great Indian actress Tara coming out of retirement for it.**" (১৭)

(৪) সে-কালের এক অভিনেত্রীর মৃত্যুর পূর্বে রচিত উইল :

(ক) নিজস্ব মোট তিনখানি বাড়ির মধ্যে দুটি বড়বাজার হাসপাতালে দান।

(খ) বাকী একটি তাঁর পৃষ্ঠপোষক বাবুর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে দান।

(গ) যাবতীয় অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে তিনখানি বাড়ির ভাড়াটিয়াদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে দান।

(ঘ) অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকার বাকী অংশে নিজের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা।

অভিনেত্রীটির নাম তিনকড়ি দাসী। (১৮)

(৫) আর এক 'দাসী'—শ্রীমতী নীহারবালা

পণ্ডিচেরী আশ্রমে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে। সেবারকার বিদায় মুহূর্তটি বর্ণনা করেছেন তাঁর সেদিনের সঙ্গী, বর্তমানে অরবিন্দ-আশ্রমিক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার :

"ফেরার সময় নীহারবালা এক কাণ্ড করে বসলেন। রাস্তায় রিকসা দাঁড়িয়ে। আশ্রমের নবপরিচিতা বন্ধুরা ফুটপাথ পর্যন্ত এসেছেন নীহারবালাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। উদ্গত অশ্রুর ধারা বর্ষণ করতে করতে আশ্রম থেকে স্টেশন অভিমুখে রওনা হলেন। ক্রন্দনের বিরাম নাই। ট্রেনের কামরার মধ্যে বসেও তদবস্থা। শুনতে পাই, যাঁদের গ্রহণ সামর্থ্য থাকে, তাঁরা দর্শনের সময় মা ও অরবিন্দের কাছ থেকে কিছু অধ্যাত্ম সম্পদও লাভ করেন। নীহারবালা কি কিছু পেয়েছিলেন?" (১৯)

এর পর চলল ছ'সাত বছর ধরে যাতায়াতের পালা—অবশেষে স্থায়ীভাবে সেখানে নীহারবালার আশ্রয় লাভ। কিন্তু প্রথম দর্শনে 'অধ্যাত্ম-সম্পদ' লাভের অধিকার ও সামর্থ্য কোথা থেকে পেয়েছিলেন মঞ্চাভিনেত্রী নীহারবালা দাসী ?

॥ ৩ ॥

এ-সবের সূত্রপাত সেই 'চৈতন্যলীলা' থেকে। সুতরাং 'চৈতন্যলীলা'য় রামকৃষ্ণের উপস্থিতি সমকালীন এবং পরবর্তীকালের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সর্বপ্রথম সেই হিসাবটা নেওয়া দরকার।

চৈতন্যের ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীকে সেদিনের ঘটনা ও রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এক গভীর আত্মবিশ্বাসে মাথা উঁচু করে চলার শক্তি তিনি লাভ করেছিলেন। বিনোদিনীর নিজের কথায় :

"জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেন না আমি জানি যে পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমায় কৃপা করিয়াছিলেন। সেই পীযূষপূরিত আশাময়ী বাণী 'হরি গুরু, গুরু হরি' আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্নমূর্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে 'বল—হরি গুরু, গুরু হরি'। এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন মনে নাই। তবে বক্ষে যেন তাঁর সেই প্রফুল্লময় মূর্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।" (২০)

এই মনোভাব সমকালীন রঙ্গালয়কে আচ্ছন্ন করেছিল।

অমৃতলাল বসু লিখেছেন :

"সেই প্রথম যখন দীনা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যের বেশে নদীয়ার ঈশ্বরাবতারের লীলা অভিনয় করিয়াছে তখন আমাদিগের হীন রঙ্গালয়কে বৈকুণ্ঠে উন্নত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রকটিত ঈশ্বরের অন্য অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই অভিনয় বসিয়া দেখিয়াছেন, আমরা ধন্য হইয়াছি। দর্শক ধন্য হইয়াছেন, বসুমতী ধন্য হইয়াছেন !!! আমাদিগের চৈতন্যলীলার অভিনয় সেই ঐশিক নয়নপাতে পুণ্যময় পবিত্রতীর্থে পরিণত হইয়াছে !!! এখন চৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শন আর কেবল আমোদ উপভোগ নয়, হৃদয়ের শিক্ষা নয়, সঙ্কীর্তন শ্রবণে আনন্দ নয়—এখন তীর্থ দর্শন।" (২১)

অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"সাধারণত লোকের বিশ্বাস, বিশেষ থিয়েটারের প্রথম যুগে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, যাহারা থিয়েটার করে তাহারা 'পারিয়া', তাহারা একঘরে ; কারণ—গিরিশচন্দ্রই

বলিয়াছেন—'বারাঙ্গনা সহচারী, কে কোথায় রাখে তার মান !' কিন্তু এ মান রাখিয়াছিলেন, আর কেহ নহেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী ! তিনি এই বাঙ্গলাদেশের কোনো পতিতা অভিনেত্রীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন 'তোমার চৈতন্য হোক।' (২২)

অমর দত্তের সম্পাদনায় 'নাট্যমন্দিরের একটি সংখ্যায় প্রথম চিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের—সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় কৈফিয়ত :

"এবারকার নাট্যমন্দিরের প্রথম চিত্রে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন নট-নটী চিত্র সম্বলিত 'নাট্যমন্দিরে' শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অবতার পুরুষের প্রতিকৃতি কেন ? নাট্যমন্দিরের কৈফিয়ত আছে। নাট্যমন্দির বলেন—এ জগতই বিশ্বনাট্যশালা। তাঁহার সৃষ্ট অসংখ্য মানবমণ্ডলী নটনটীরূপে নিত্য ইহাতে অভিনয় করিতেছে, কিন্তু যখন তাহারা স্খলিত হইয়া স্রষ্টার উদ্দেশ্য বহির্ভূত পথে চালিত হইয়া প্রকৃত অভিনয় ভুলিয়া যায়, তখনই সেই বিশ্বনাট্যাচার্য স্বয়ং তাঁহার বিরাট রঙ্গশালায় অবতীর্ণ হয়েন। এইভাবেই একদিন বঙ্গের কোনো নিভৃত কোণে সেই নটকুল ধুরন্ধর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র দেবমন্দিরে তাঁহার আসন সংস্থাপিত করিয়া, রাজধানীর পণ্ডিত মূর্খ ধনী-দরিদ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, জগতের অনিত্যতা ও ঈশ্বর লাভ করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহা পিপাসুগণের প্রাণে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সাধু, যোগী, পাপী, পতিত 'কেহই এড়ায় নাই ! অহেতুক কৃপায় ছদ্মবেশে—দীন ভিখারী ভূদেব-তনয়রূপে দেখা দিয়া সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়াছিলেন। বঙ্গের নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় নাট্যমন্দিরেও এই দেবতার, এই পতিতপাবনের পদধূলি পড়িয়াছিল। সে পূত চরণরেণুতে কত শত পতিত পতিতার উদ্ধার হইয়াছে কে বলিবে ? নাট্যশালা চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনার সমাবেশে সাধারণ কর্তৃক ঘৃণিত কিন্তু পতিতপাবনের চক্ষে স্বর্গ-নরক সমান। তাই রামকৃষ্ণের মতো লোকগুরু, নরদেবতা, দয়ালরাজ নাট্যমন্দিরে পদার্পণ করিয়া বঙ্গের নাট্যশালার মলিনতা ঘুচাইয়া তাহার শোভাবর্ধন করিলেন, আদরের করিয়া তুলিলেন।" (২৩)

সেকালের রঙ্গজগৎ সম্পর্কিত পত্রিকাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের রঙ্গমঞ্চের উপস্থিতির ঘটনাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছে। অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও নাট্যসমালোচকরা এই ঘটনার গুরুত্ব অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বঙ্গনারী ও রঙ্গভূমি'-তে বসন্তকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন :

"ভগবান রামকৃষ্ণদেব কলানৈপুণ্যে ও চরিত্রাভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বহু বারাঙ্গনা অভিনেত্রীকে পদরজদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কেবল অভিনেত্রীর কৃতিত্বেই এক সময় সাধা-

রণ রঙ্গশালা এই মহাপুরুষের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছিল।'(২৪)

দশকের পর দশক পেরিয়ে আমরা একালে পৌঁছেও একই কথা শুনি। একালের শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"আমাদের এক পূর্বসূরী অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে হাত তুলে যে আশীর্বাদ করেছিলেন, সে আশীর্বাদ শুধু নটী বিনোদিনীকেই নয়, সে আশীর্বাদ নটী বিনোদিনীর মধ্যে দিয়ে অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল অভিনয় শিল্পীদের প্রতি আশীর্বাদ, আজও মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে যখন উপস্থিত হই, তখনই উপলব্ধি করি ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই আশীর্বাদ।"(২৫)

অতি-আধুনিককালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিনোদিনীর 'আমার কথা'র সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ :

"রঙ্গালয়ে রামকৃষ্ণের আগমন সে সময় একটি বড় ঘটনা। রঙ্গালয় ও অভিনেতা অভিনেত্রীকে লোকে তখন সুনজরে দেখতো না, সমাজে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল—অভিনেতারা দুশ্চরিত্র, আর অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা বলে ঘৃণার পাত্র ছিল। গিরিশচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে কবিতা লিখেছিলেন 'লোকে কয় অভিনয়/ কভু নিন্দনীয় নয়/নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।' অথচ এই 'নিন্দাভাজন' ব্যক্তিরা সমাজের একটি মহৎ ভূমিকায় অশেষ ত্যাগ ও কষ্টের জীবন বরণ করে নিয়েছিল। অভিনয়-জীবন তখন অপরিসীম কঠিন ছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তখন রঙ্গালয় থেকে লাভবান হওয়া দূরে থাক, কোনো ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠতো। এই অবস্থায় সামাজিক অসম্মান ছিল মর্মান্তিক। শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ তাই সামাজিক মর্যাদা এনে দিয়েছিল বলেই মনে হয়।"(২৬)

সমকালীন ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, এই মর্যাদা আনার ক্ষেত্রে কোনো সংশয় নেই। ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটেছে—ইতিহাস বিবর্তিত করেছে সমাজমানসকে, রুচিকে, চিন্তাধারাকে। পুরাতন বিশ্বাস ও মর্যাদাবোধের স্তম্ভগুলো ক্ষয়িষ্ণু কিন্তু কালান্তরের পারে দাঁড়িয়ে একালের শিল্পী জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় মনে করেন :

"তখনকার দিনের অভিনেত্রীদের তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] একটা স্থান করে দিয়েছিলেন—তারা সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বিনোদিনীকে তিনি বলেছিলেন যে,…তুমি মানুষ। যেখানে অন্য মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে, সেখানে তিনিই তাদের ঘৃণা থেকে বাঁচিয়েছেন।· এটাই সাঙ্ঘাতিক প্রভাব। বিদ্যাসাগর ··যিনি সারা জীবন স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করলেন তিনিই মেয়েদের মঞ্চে আনার প্রতিবাদে মঞ্চের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তা করেন নি—তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন।"(২৭)

তরুণকুমার (চট্টোপাধ্যায়) বললেন : "এখন হয়তো অনেক ভালো ঘরের মেয়েরা অভিনয় করতে আসেন কিন্তু এখনও বহু মেয়ে আছেন যাঁরা তথাকথিত অস্পৃশ্যা।—আমরা তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি কারণ আমরা ঠাকুরের কাছ থেকেই জানতে শিখেছি, অভিনেত্রীদের জাত নেই—তাঁরা প্রণম্য শিল্পী বলে। ঠাকুর যদি বিনোদিনীকে 'মা' না বলতেন, তাহলে এ শিক্ষা আমরা পেতাম কোথায় ?"(২৮)
গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন "ঐ চৈতন্যলীলাই আমার সব—ঐ থেকেই আমি গুরুকৃপা লাভ করলাম।"(২৯)
আর রঙ্গরঙ্গমঞ্চও লাভ করেছিল তাব গুককে।

॥ ৪ ॥

সেই গুককে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রই।
গিরিশচন্দ্র তখন প্রবল ভক্তিস্রোতে ভেসে চলেছেন—সেই টানে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সমগ্র রঙ্গজগতকেও। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখার ছলে থিয়েটারে আসেন পতিত-পতিতাদের উদ্ধাব করতে। তিনি থিয়েটার দেখতে এলে তাই গিরিশের ব্যস্ততার শেষ থাকে না—"কোথায় কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রাণে ঠাকুবের প্রতি একটু বিশ্বাস হইয়াছে জানিয়াছেন, কোথায় কোনো নিম্নপদস্থ কর্মচারী ঠাকুরের পদস্পর্শ করিবার প্রার্থনা সভয়ে তাহাকে নিবেদন করিয়াছে—তাহাদিগকে সকলকে একত্রিত করিয়া অবসর বুঝিয়া ঠাকুরের সামনে আগমন করিয়া মনে মনে তাহাদের উদ্ধার কামনা করত : তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিতেন।"(৩০)
থিয়েটারের সাজ ঘরেও চলত রামকৃষ্ণ-কথা। থিয়েটারের পর গিরিশচন্দ্রের ঘরে সমবেত হতেন নট-নটীরা। কোহিনুর থিয়েটারের এমনি এক মজলিশের আলোচনায় শুনি :
"তারাসুন্দরী : তবু আমরা যে ভাবে জীবন কাটিয়েছি, আমাদের আর উদ্ধার নেই।
"গিরিশ : এমন কথা বলো না তারা, তোমার বিনিমাসীর কথা শোন নাই ? ঠাকুর চৈতন্যের ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে ওরে আশীর্বাদ করেছিলেন—মা তোর চৈতন্য হোক।
"অবিনাশবাবু : বিনোদিনী এখন গোপালের সেবায় তৎপর আছেন।"(৩১)
চৈতন্যলীলায় অমৃতলাল বসু গ্রহণ করেছিলেন 'প্রতিবেশী'র একটি ভূমিকা। সে দিন, শুধু সেদিন কেন, পরেও যখন শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসেছেন অমৃতলাল তাঁর কাছে উপস্থিত হন নি। তাঁর নিজের কথা :

"আসিয়াছ কতবার কর্ণে গেছে সমাচার
দৃষ্টিপথ ছাড়ি গেছি দুষ্টামি সারিতে।"

এবং "জনমে কৌতুক বঙ্গ মুখেতে কৌতুক ব্যঙ্গ
কপি সম করিযাছি মাত্র উপহাস।
ভুজঙ্গ গরল ঢালে কণ্ঠে ধব সেই কালে
এমনি ঈশ্ববৃত্তি, ওহে কৃত্তিবাস॥"

কিন্তু তাবপর :

"গিরিশ ভক্তবীব চবণে লুটায শিব
কৃতজ্ঞ প্রাণেব অর্ঘ্য কবিছে প্রদান।
নাট্যববি কবি বিশ্বে স্নেহেব অনুজ শিষ্যে
বামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে দেওযাইলে স্থান॥"

জীবনেব অন্তিম লগ্নে অমৃতলাল বচনা কবেছেন 'শ্রীবামকৃষ্ণেব বাল্যলীলা' ব্রতকথা। সেখানে শবণাগতিব সুব

"সে দযাব আবিভাব নবদেহে সুপ্রভাত—
ঘুচাতে অভেদমন্ত্রে ধর্মে ভেদবুদ্ধি।
বামকৃষ্ণ নাম ধবি শান্তি দেন ভ্রান্তি হরি
সৎ অর্থে পথ বলি লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি॥
অপূর্ব সে জন্মকথা ভাষায রচিব লতা
বাসনা ফোটাতে চায অমৃতেব ফুল।
কব দেব শক্তি দান ভক্তিসিক্ত হোক গান
প্রচারিতে ব্রতকথা অমৃত আকুল॥"(৩২)

পরবর্তীকালে নট-নটীদেব কাছে গিবিশ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি। গিরিশের মুখ থেকেই শুনি তাঁব অভিজ্ঞতা :

"গিরিশ (তামাক খাইতে খাইতে) বুঝেছ দাদা। ঠাকুর আমাকেও ছাডছেন না। হররকম জুটুচ্ছেন। আজকাল মাস্টারের (অক্ষয়) ভাগ্নে রাজুটাকে এনে জুটিয়ে দিয়েছেন। সে নাছোডবান্দা। আমি মা-কে—মঠের ওদের সব দেখিয়ে দিই, তা ছাডে না।

"রাম—ও যার যা ঘাট। তুমি দেখিয়ে দিলে কি হবে? এই সব দেখছ না?

"গিরিশ—হাঁ, তা আমি খুব বুঝতে পেরেছি। আমার জন্য যত তেডেল, বেডেল, মাতাল, বেশ্যা আমদানী করা ছিল।

"মনোমোহন মিত্র—তা না হলে তোমাকে তিনি টানবেন কেন? যে সবার সেরা

তাকে যদি মাত করতে পারলে তাহলে ত সবাইকে মাত করা হলো।

"গিরিশ—মায় মেয়েগুলো [গিরিশ অবশ্য 'মেয়ে'র বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করেছেন] পর্যন্ত। তারা appear হবার আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে, আমার পা'র ধুলো নিয়ে তবে stage-এ গিয়ে নামে। আমি পা'র ধুলো না দিলে তারা ক্ষুণ্ণ হয়, মন খুলে play করতে পারে না। বিষম বালাই ! হ্যাঁ।" (৩৩)

স্টেজে নামার আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করার রীতিটি এখনো সমানভাবে অনুসৃত। প্রতিদিন অভিনয়ের আগে ধূপধুনো এবং ফুলের মালা দিয়ে রামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি-সুসজ্জিত করা হয়। সাজঘরে, দর্শকদের বিশ্রাম ঘরে, কোনো কোনো অভিনেতার নিজস্ব বিশ্রাম কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। শুধু অভিনেতা অভিনেত্রীরা নয়—প্রম্পটার, পেণ্টার, শিফটার—প্রত্যেক মঞ্চকর্মীই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে প্রণাম জানিয়ে তবে শুরু করেন দিনের কাজ। ইদানীং শৌখীন সম্প্রদায় যখন সাধারণভাবে রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করেন তখনও দেখা যাবে, পেশাদার মঞ্চকর্মীরা তাঁদের রীতি অনুসরণ করে তবে কাজ শুরু কবেন। এই ট্রাডিশন চলে আসছে সেই গিরিশচন্দ্রের আমল থেকে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের এ বৈশিষ্ট্য সুবিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিকেরও চোখ এড়ায় নি। ক্রিষ্টোফার ইসারউড লিখেছেন :

"উভয়ের [শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র] মিলনের একটি বিচিত্র ফল হলো—আজ কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটা থিয়েটারে স্টেজের অন্তরালে রামকৃষ্ণের ছবি টাঙানো আছে। অভিনেতারা মঞ্চ প্রবেশের পূর্বে এতে প্রণাম জানায়। গিরিশের শিল্পকর্মে সম্মতি জানিয়ে এবং তাঁকে সেই শিল্পচর্চায় উৎসাহিত করে, রামকৃষ্ণ যেন বাংলা দেশের নাটকের গুরু (Patron-Saint)রূপে প্রতিষ্ঠিত।" (৩৪)

সেকালের থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, প্রোগ্রাম, সাট (৩৫) প্রভৃতির শিরোনামে দেখতে পাওয়া যাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদ ভরসা'। অমর দত্ত নতুন নাটক লিখতে শুরু করেছেন 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট'—'শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথিতে' আরম্ভ করেছেন রচনা। ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্যক্তিগত চিঠি লিখছেন তাঁর ছেলেকে পত্রশীর্ষে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং'। কখনো কখনো রামকৃষ্ণের বদলে 'গুরুমহারাজ' বলেও তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। 'নাট্যমন্দির' ফাল্গুন ১৩১৭ সংখ্যায় মৃণীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী 'গুরুমহারাজ' বলে একটি কবিতা লিখেছেন, উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। কবিতাটির শেষ দুটি পঙক্তি :

গুরু মহারাজ বিশ্ব চিনিল ত্বরায়।
সত্যি শিব রামকৃষ্ণ বিরাজে ধরায়॥

নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামীর মৃত্যুর পর এক গুণমুগ্ধ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার শিরোনামে প্রথম "নমঃ নটনাথায়" কথাটি পেলাম। (৩৬)

প্রচলিত রীতিতে রামকৃষ্ণশরণের স্থানে 'নটনাথ' শব্দটির দ্বারা লেখক সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণ-স্মরণই করেছেন। পরে শিশির কুমারও 'নটনাথ' ব্যবহার করেছেন হ্যাণ্ডবিল-পোস্টারে।

নাচঘর, নটরাজ (সম্পাদক, শচীন সেনগুপ্ত) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও সেই রামকৃষ্ণশরণ—এমন কি নাটক বিক্রয়েব জন্য যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত—তাতেও এই রীতি অনুসৃত। (৩৭) অমর দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকা—তার ছাপাখানার নামও যে রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—স্বতন্ত্রভাবে সগৌরবে সেটি ঘোষণা করেছেন অমরবাবু। (৩৮)

॥ ৫ ॥

এ-সব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি নাট্য-জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই আলোডন যে বাহ্যিক নিয়মরক্ষা মাত্র নয়, অনেকস্থলে শিল্পীদের ব্যক্তিজীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল যথাস্থানে সে আলো-চনা করব। থিয়েটার-জগৎ অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের সমস্যা নিয়েও উপস্থিত হয়েছে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের কাছে, সে রকমও কিছু সংবাদ আছে। দু'একটা উদাহরণ দিই।

নীলমাধব চক্রবর্তী, হাবু দত্ত, হরিদাস দত্ত বীণা রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটার নাম দিয়ে অভিনয় শুরু করলেন—তাঁদের ভরসা দিলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু ইতিমধ্যে গিরিশ চন্দ্র যোগদান করেছেন 'মিনার্ভা'য়। নীলমাধববাবুরা পড়লেন বিপদে—গিরিশচন্দ্র সাহায্য না করলে এ বিপদ থেকে উদ্ধারের আশা নেই। তাঁদের আমন্ত্রণে রামদত্ত সেদিন গেছেন সিটি থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে। তাঁর কাছে তাঁরা জানালেন সমস্যার কথা, তারপর "ঠাকুরের শ্রীমূর্তিখানি দেখাইয়া তাঁহারা বলিলেন যে ওঁরই চরণ আমাদের একমাত্র ভরসা। রাখতে হয় উনি রাখবেন, মারতে হয় উনি মারবেন। আমরা আর তো কিছু জানি না।

"রামচন্দ্র এই কথায় তাঁহাদের দ্বিগুণ উৎসাহ দিলেন, কহিলেন 'আচ্ছা গিরিশদাদাকে আমি আপনাদের হয়ে বলবো। আর আমার দ্বারা যদি আপনাদের কিছু সাহায্য হয়, তবে বলবেন, আমি করতে রাজী।" (৩৯)

'বসুমতী' সম্পাদক উপেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুচ্ছ কারণে অমর দত্তের বিবাদ শুরু হলো। সামান্য থেকে শেষ পর্যন্ত মানহানির মোকদ্দমায় গিয়ে পৌছল। এ বিবাদ মেটাবার জন্যে এগিয়ে এলেন থিয়েটারের ললিত চট্টোপাধ্যায়, মধ্যস্থ হলেন রামকৃষ্ণ শিষ্য মণ্ডলী। সহজেই মীমাংসা হয়ে গেল। অমর দত্ত যে চিঠিখানি উপেনবাবুকে

লিখেছিলেন সেটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় এ বিবাদের মীমাংসা হলো কোথায় এবং কি ভাবে :

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

ক্লাসিক থিয়েটার
২৭।৮।১৯০১

প্রিয় উপেনবাবু,

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত সেবক মণ্ডলী বিশেষত আমাদের উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধু বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে আমাদের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা উভয়ের সম্মতিক্রমে মিটিতেছে, ইহা উভয়ের পক্ষে সুখের বিষয়।

…সেদিন রাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত শিষ্য মণ্ডলী ও তুমি যে বিষয়ের অনুরোধ করিয়াছ, তাহা আমি রক্ষা করিব।

তোমার

(স্বাঃ) অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। (৪০)

১৩২০ রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের দিনে থিয়েটারের ঘরোয়া দ্বন্দ্ব বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াতে 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার এক সমর্থকের পত্র প্রকাশিত হয়েছে ঐ পত্রিকায় :

'নাট্যমন্দির' ইদানীং সরলভাবে সত্য কথা প্রকাশ করায় দেখিতেছি—সাহিত্যসংসারের অনেকগুলি 'ঘটিচোরে'র ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে।…এই শ্রেণীর একজন নামজাদা 'ঘটিচোর' সেদিন, শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের দিন বেলুড় মঠে গিয়া মঠের পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজগণের নিকট নাট্যমন্দিরের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া 'নাট্যমন্দির'কে তাঁহাদের বিদ্বেষভাজন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।" (৪১)

সে-সময় মঠের উৎসবে রঙ্গমঞ্চের সব শিল্পীদের নিমন্ত্রণ জানানো হতো—ব্যক্তি হিসাবে নয়, সম্প্রদায় হিসাবে। সে উৎসবে যোগদান করতেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। থিয়েটার-পত্রিকাগুলি উৎসবের পূর্বে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাত উৎসবে যোগদান করতে। উৎসব শেষে তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হতো এই সব পত্রিকায়। এমনি একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 'নাট্যমন্দিরে' :

"ভাই বাঙালী, গত ৩রা চৈত্র রবিবারে ভাগীরথী-পাদবিধৌত বেলুড় মঠ মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা দেখিবার সৌভাগ্য তোমার হইয়াছিল কি? সেখানে যদি যাইয়া থাক ভালো, যদি যাইবার অবকাশ না হইয়া থাকে তো আমরা ঈশ্বর সমীপে তোমার

জন্য প্রার্থনা করি যেন তোমায় দীর্ঘজীবি [দীর্ঘজীবী] করিয়া তিনি এই অবসর, এই সুযোগ, এই সৌভাগ্য আগামী বৎসর হইতে আজীবন তোমায় দেন। সেদিন বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে যে মহতী লোকসভা দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিলেও হৃদয়—এই ত্রিতাপদগ্ধ, শতধাবিধ্বস্ত, শতভারে প্রপীড়িত হৃদয়ে—শান্তি সুধা সিঞ্চিৎ [সিঞ্চিত] হয়। সহস্র সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত ভগবন্নামাবলী-পীযূষ-স্রোত সেদিন একটানা মন্দাকিনী ধারার ন্যায় বেলুড়ের আনন্দ মঠে প্রবাহিত হইয়াছিল। সে আনন্দস্রোতে যে কেহই অবগাহন করিয়াছেন, কিম্বা যিনি বিন্দুমাত্রও সে সুধা সম্ভোগের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন।...মঠের দরিদ্রনারায়ণসেবী ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জলন্ত আদর্শ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এ বৎসর সংখ্যায় কম উপস্থিত থাকিতেও প্রসাদ বিতরণের যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাও দেখিবার জিনিষ—উপভোগ্য। কম-বেশী সাত হাজার প্রসাদপ্রার্থী উদরপূর্ণ করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিল। আর কণিকা গ্রহণাভিলাষী সহস্র সহস্র লোক বেলা পাঁচটা পর্যন্ত লুচি মিষ্টান্ন বিশেষের আস্বাদ পাইয়াছিল।...আর একটি কথা, এখানেও সাধু মহন্তের সঙ্গে, গৃহস্থের সঙ্গে, পতিতা ও পতিতের সমাবেশ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই জগদ্বিখ্যাত কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাশিষ্য, বেলুড় মঠের ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গিয়াছেন "আমাদের ঠাকুর আচণ্ডালের —আমাদের ঠাকুরের নিকটে আসিতে, অন্তত বৎসরের একদিনের জন্যও সাধুর যেমন অধিকার, পতিত-পতিতারও তেমনই অধিকার। পতিতপাবন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো দয়ালের উপযুক্ত শিষ্যেরই কথা বটে।" (৪২)

সেই অধিকার নিয়ে এক 'পতিত' মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিংহাসনসজ্জিত করতেন। রোগশয্যায় ধর্মদাস স্বহস্তে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তার ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

"একটি মহৎ কার্যের উল্লেখ তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাইলাম না। বেলুড় মঠে মহোৎসবে তিনি কয়েক বৎসর উপর্যুপরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিংহাসন সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ লাভ করেন, যে লাভে তিনি অক্ষয় স্বর্গভোগের অধিকারী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।" (৪৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে সংযোগ সেতু নির্মাণে তাঁর লোকান্তরের পর যাঁরা উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, তাঁরা কি-ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

পঞ্চম অধ্যায়

রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ও রঙ্গমঞ্চ

॥ ১ ॥

শিশু সারদার স্বামী-নির্বাচন এক যাত্রার আসরেই। উত্তরকালে তিনিই লাভ করলেন অভিনয় জগতের প্রেরণাদাত্রীর আসন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব ও গিরিশের লোকান্তর—এই দুই কালের মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক অটুট থাকা সম্ভব কিন্তু দেখা গেল, তার পরবর্তীকালেও এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো না। সারদাদেবী যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে আদর্শ স্থাপন করে গেলেন, সেই আদর্শ অনুসরণ করেই এগিয়ে এলেন সংঘজননী।

এক অভিনেতা—নাম বিনোদবিহারী সোম। (১) প্রথম জীবনে ছিলেন শ্রীম-র ছাত্র—সেই সূত্রেই গেছেন রামকৃষ্ণ সন্নিধানে। পরে যখন থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন, তখন আর পাঁচজন সমকালীন অভিনেতার মতোই স্ফূর্তিতে মেতেছেন। সেই বিনোদ বিহারী থিয়েটার সেরে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন রাত দুপুরে। সারদাদেবী তখন বাগবাজারে থাকেন। সেই বাড়ির সামনে দিয়েই বাড়ি ফেরেন বিনোদবিহারী। এই মত্ত অবস্থাতেও তাঁর মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা। সংঘজননীর অসুস্থ শরীর—ঘুমের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে তার জন্যে স্বামী সারদানন্দের বিশেষ সতর্কতা। বিনোদ-বিহারী সারদানন্দকে বলতেন দোস্ত্। কিন্তু বেশী রাত করে এসে হাঁকাহাঁকি করলে সারদানন্দও দোস্তি ভুলে জবরদস্তি বিদায় করতেন তাঁকে।

সেদিন বিনোদবিহারী নতুন চাল চাললেন। সারদাদেবীর ঘরের নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান ধরলেন :

উঠ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটির দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার ॥…
রাম বলে ত্যজি তোরে, যাব কার কাছে আর।
মা বিনে কে লবে এই অকৃতি অধম ভার।

প্রমাদ গণলেন সারদানন্দ—কিন্তু তিনি বেরোবার আগেই ওপরের ঘরের জানলার

পাল্লা খুলে গেছে। পথের ওপর সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে বিনোদবিহারী বললেন, 'উঠেছ মা! ছেলের ডাক শুনেছ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।'

উঠে দাঁড়িয়ে আবার গান ধরলেন :

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।

সারদানন্দের চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন বলে আখর জুড়ে দিলেন :

...'আমি দেখি, দোস্ত্ না দেখে।' (২)

গিরিশচন্দ্রের বাড়ি দুর্গাপূজা। সেখানে তিনদিন সারদাদেবী উপস্থিত—গিরিশের আত্মীয়-স্বজন তো আছেই, তার সঙ্গে আছে থিয়েটারের নট-নটী কলাকুশলীরা। সান্নিধ্য লাভ করে তাঁকে অর্ঘ্য অঞ্জলি দিয়ে মহাপূজা সার্থক করে তুলল তারা। (৩)

এই গিরিশ যখন শ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলেন মদ্যত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করতে তখন কিভাবে তিনি গিরিশকে নিবৃত্ত করেছিলেন এবং বঙ্গরঙ্গশালাকে বাঁচিয়েছিলেন সে কথা তো আগেই বলেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন রঙ্গমঞ্চে—স্নেহ দিয়ে, আশীর্বাদ দিয়ে অনুপ্রেরিত করেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের।

একদিনের ঘটনা :

মিনার্ভা থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' অভিনীত হচ্ছে। অপরেশবাবুর অনুরোধে সারদাদেবী এসেছেন অভিনয় দেখতে। নাটকে লক্ষ্মণের কলহপরায়ণা স্ত্রী চমম্বার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নীরদাসুন্দরী। অভিনয় শেষে অপরেশবাবু এসে নীরদাকে বললেন, 'ওপরে যা, সারদা মা এসেছেন, তোকে ডাকছেন।' সেই পোষাকেই ছুটলেন নীরদা। সারদাদেবী তাঁকে কোলে টেনে নিলেন—সস্নেহে চুম্বন করলেন। বারবধূ নীরদা বিস্মিত, অভিভূত। নব্বই বছরের বৃদ্ধা অন্ধ নীরদাসুন্দরী জীবনের অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর দুর্বল স্মৃতিতে সেদিনের সেই মুহূর্তটি আমৃত্যু অম্লান ছিল। (৪)

অমৃতলাল তো নিজের মুখেই বলেছিলেন—কি প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন সারদাদেবীর কাছে :

শক্তির সঞ্চার করি অলক্ষ্যে লেখনী ধরি
শেখালে লীলার গীতি কত ভক্তজনে।
স্তবস্তুতি পুঁথি নয় হৃদয় এ কথা কয়
প্রত্যক্ষ পেয়েছ সাক্ষ্য কুপুত্র রচনে॥

নহে কি সে মূর্খ নট শূন্য শিরে জ্ঞান ঘট
ঘটনা রটনা পারে করিতে হেলায়।
আগে মনে জাগে নাই কি লিখেছি ভুলে যাই
কলম তবে কে-মাগো চালায় হেলায়॥

প্রার্থনা করেছেন :

দাসে দাও ভাবভাষা ভগবানে ভালবাসা
কল্পনা কুসুমে দেহ ঐশিক সৌরভ। (৫)

স্বামী অভেদানন্দের 'শ্রীমা-স্তোত্রে'

স্নেহেনা বগ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান-সগুণী করোষি।
অহেতুনা, নো দয়সে সদোষান
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম॥

—পড়ে অমৃতলাল অভিভূত। অভেদানন্দকে সাশ্রুনয়নে বলেছিলেন "মহারাজ, শ্রীমার উদ্দেশে রচিত আপনার এই ক'টি লাইন অন্ততঃ চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে। অপূর্ব এই কথা যে, করুণাময়ী মা, আমাদের সকল দোষকে সকল সময়ে গুণ হিসাবে গণ্য করতেন। অহেতুকী তাঁর কৃপা! চিরক্ষমাসুন্দরমূর্তি ছিলেন মা সারদা, আর তারি জন্য পাপী তাপী আমরা সকলে তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাবার অধিকার পেয়েছিলাম।" (৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সারদাদেবীর অবারিত সাদর আহ্বান—অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্যে।

সারদাদেবী তখন অসুস্থ। 'উদ্বোধনে' ঘরের মেঝেতে শুয়েছিলেন দুপুরে। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এসেছেন মাতৃ-সন্দর্শনে ভক্তি ভরে প্রণাম করে যুক্ত করে বসে মৃদুস্বরে আলাপ করছেন। সারদাদেবী বলছেন, "থিয়েটারে তো বেশ বলো। কেমন সেজে-গুজে আসো—তোমাকে আর তখন চেনাই যায় না। আচ্ছা, আমাদের এখন একটু শোনাও দেখি।"

মাতৃ আদেশ! জোড়হাত করে সারদাদেবীকে নমস্কার করে আরম্ভ করলেন 'জনা' থেকে আবৃত্তি—প্রবীরের বীররসাত্মক সংলাপের কিছু অংশ।

অভিনয় শেষ করে প্রণাম করে সেদিনের মতো বিদায় নেবার সময় সারদাদেবী বললেন 'আর একদিন সময় মতো এসো।' (৭)

একদিন কেন, অনেকদিনই গেছেন তারাসুন্দরী। একবার হঠাৎ গিয়ে হাজির ট্যাক্সি করে—গাড়ি বোঝাই মালপত্র—দই, মিষ্টি, ম্যাঙ্গোটীন, লেবু, কলা, বাতাবি, আঙুর,

বেদানা, আনারস। নিয়ে এসেছেন রজনীগন্ধার গুচ্ছ, সকলের জন্তে কাপড়, ছোটদের পশমী জুতো। যেন মেয়ে এসেছে মায়ের কাছে। যতটা এনেছেন, তার থেকে আরও আরও অনেক আনতে পারলে যেন খুশী হতেন—নিঃস্ব হয়ে সব উজাড় করে দিতে পারলেই যেন তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ হতো। সারদাদেবীর সেদিন জ্বর—দরজার বাইরে থেকেই প্রণাম করলেন তারাসুন্দরী। (৮)

শ্রীমতী তিনকড়িও গেছেন মাতৃ-আশ্রয়ে। আশুতোষ মিত্রের বিবরণ উল্লেখ করে মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত লিখেছেন—"প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী মাকে কখন কখন দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহারা কখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বা মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করিতেন না। বাহির হইতে গলবস্ত্র হইয়া মা ও ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। মা তাহাদের যত্নের সহিত প্রসাদ পাইতে বলিতেন ও স্বহস্তে পান দিতেন। একদিন সারদাদেবীর ইচ্ছায় তিনকড়ি তাঁকে 'বিল্বমঙ্গলে'র পাগলিনীর 'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে' গানটি শোনালেন। গান শুনে সারদাদেবী ভাবাবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে পরম স্নেহে গায়িকাকে অভিনন্দন জানালেন "আজ কি গানই শোনালি মা!" (৯) সারদাদেবী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কতবার উপস্থিত হয়েছেন এবং কি কি নাটক দেখেছিলেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা-সারদাদেবী' জীবনীগ্রন্থে সারদাদেবীর কতকগুলি নাটক দেখার কথা উল্লেখ করেছেন:

(ক) ১৯০৪—বিল্বমঙ্গল (মিনার্ভা থিয়েটারে) গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে তিনি এই অভিনয় দেখেছিলেন।

(খ) ১৯০৯-১২ সেপ্টেম্বর—'পাণ্ডব গৌরব' (মিনার্ভা) গিরিশচন্দ্রেরই আমন্ত্রণে। এ নাটকে গিরিশের ভূমিকা ছিল কঞ্চুকীর। "অভিনয়কালে দেবীমূর্তির আবির্ভাব দেখিয়া ও 'হের হরমনমোহিনী' ইত্যাদি গান শুনিয়া" তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

এ ছাড়া অপরেশচন্দ্রের অনুরোধেই যে 'রামানুজ' নাটক দেখতে মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়েছিলেন তা নীরদাসুন্দরীর জবানবন্দী থেকে জানা যায়। নীরদাসুন্দরীর কথায় সমর্থন পাওয়া যাবে অপরেশচন্দ্রের রচনা থেকে। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন:

"মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোনো পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না—সে দয়ার পাত্রপাত্রী নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যবহারিক জগতের কোনো বিধিনিষেধ মানে না; সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।' (১০)

বিনোদিনীর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভের মতো নীরদার সারদাদেবীর আশীর্বাদ লাভ

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে যে আলোড়ন তুলেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'শ্রীরামানুজ' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৫ই জুলাই, ১৯১৬।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিতি ছাড়াও অন্যত্র অভিনয়-দর্শনে তাঁকে উপস্থিত দেখতে পাই। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার (১৯১২) মহাষ্টমীর রাত্রে 'জনা' নাটক এবং বিজয়া-দশমীর রাত্রে 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ' যাত্রাভিনয় হয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে।

কিন্তু সারদাদেবী তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় দেখেছিলেন কামারপুকুরে—যেদিন তাঁকে গ্রামান্তরে যাত্রা শুনতে যাওয়ার অনুমতি দেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই মনো-বেদনা মোচন করার জন্য স্বয়ং সেই যাত্রা একক অভিনয়ে ও সঙ্গীতে পরিবেশন করেছিলেন। সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি (ঘটনাটি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত)!

লোকশিক্ষার বাহনরূপে নাটক ও অভিনয়কে গ্রহণ করলেও এর আনন্দ দানের ভূমিকা সম্পর্কে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সচেতন ছিলেন অর্থাৎ শুধু শিক্ষা-লাভের জন্য নয়, তার রসোপলব্ধির দ্বারও তাঁর কাছে উন্মুক্ত ছিল। দু'একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি :

একবার বেলুড় মঠের বিজয়াদশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকায় ডাক্তার কাঞ্জিলাল নানা মুখভঙ্গী ও রঙ্গব্যঙ্গ করে সকলকে আনন্দদান করছিলেন। এই চপলতা এক ব্রহ্মচারীকে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত করেছিল। সেসময় সারদাদেবীও নিজের ঘরে বসে অন্যান্যের সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করছিলেন। বিরক্ত ব্রহ্মচারী এই প্রগলভতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি রায় দিয়েছিলেন "না না এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ, এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।"(১১)

'বিল্বমঙ্গলে' সাধক সেজেছিলেন গিরিশচন্দ্র। নানারকম ভাবভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে কপট সাধুর অভিনয়কালেও সারদাদেবী পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর অভিনয় উপভোগ করে-ছেন। (১২)

সন্ন্যাসের শুষ্কতা আনন্দ উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করে নি বলেই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় অভিনয়-জগতকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। শুধু কৃপা বিতরণের উদ্দেশ্যে নয়, তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্মতার মধ্য দিয়ে তাঁরা রামকৃষ্ণ-চেতনা পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের কাছে। উচ্চ সমাজের ধর্মীয় গাম্ভীর্য যেখানে পতিতের পতন-পথকে আরও সুগম করে তুলেছিল সেখানে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন, সমগ্র রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ই তাঁদের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের মহত্তর ভাবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন।

॥ ২ ॥

রাস্তায় যে ফুটপাথে থিয়েটারগুলো পড়ে সে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যেতেন না নরেন্দ্রনাথ। (১৩)

সেই নরেন্দ্রনাথই এসেছেন একেবারে থিয়েটারের সাজঘরে। পতিত-পতিতাদের মাঝখানে বসে তানপুরা নিয়ে গান ধরেছেন 'সত্যং শিবং'। বিনোদিনী লিখেছেন, "কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) 'সত্যং শিবং' মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমার থিয়েটার কার্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি।" (১৪)

একদিন তো গিরিশচন্দ্র রীতিমতো বিপদেই পড়তে বসেছিলেন। বিল্বমঙ্গল নাটক দেখতে গিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ গিরিশের অনুরোধে। অভিনয় শেষ হতে গিরিশচন্দ্রই তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন স্টেজে—হাতে একটা তানপুরা ধরিয়ে দিলেন। তখন সবেমাত্র থিয়েটার শেষ হয়েছে—নটনটীরা হাল্‌কা মেজাজে যত্রতত্র ঘুরছে। তাঁদের চাপল্য ও প্রগলভতার মাঝখানেই নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠের ভজন গানে ক্রমশঃ ধ্যানের রূপটি ফুটে উঠতে লাগলো। মর্ত্যলোকের সীমা ছাড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ যেন কোন্ অসীমের সুদূরতায় পৌঁছে গেছেন। রঙ্গমঞ্চ দেবালয়ের পবিত্রতায় মগ্ন। কখন ঘুচে গেছে নটনটীদের চাপল্য—স্তব্ধ বিস্ময়ে তারা নরেন্দ্রনাথের ধ্যানস্তিমিত চোখের দিকে, যোগীশ্বরের প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। প্রমাদ গণলেন গিরিশচন্দ্র। নরেনের কি সমাধি হবে! তাড়াতাড়ি হাত থেকে তানপুরা কেড়ে নিলেন।

পরদিন নটীরা এসে অনুযোগ করলো গিরিশচন্দ্রের কাছে, "আপনি করেছিলেন কি? ঐ শক্তিমান মহাপুরুষকে এনে বসিয়েছিলেন আমাদের অশুচিতার মাঝখানে? ইহকাল তো গেছেই, পরকালও যে যেতে বসেছিল।" (১৫)

গিরিশচন্দ্র কিন্তু বেশ খুশী। চৈতন্যদানের জন্যই তো শ্রীচৈতন্যকে সেই পথেই যেতে হয় যে পথ কেউ স্পর্শ করে না।

কিন্তু কেমন হলো বিল্বমঙ্গল কে বলবে! সাধারণ দর্শক তো নাচগান আর অভিনয় দেখে আনন্দটুকু পেলেই খুশী। ভালোমন্দ যাচাই করার মতো খাঁটি সমালোচক আছে ক'জন? নরেন্দ্রনাথকেই 'বিল্বমঙ্গল' পড়তে দিলেন গিরিশচন্দ্র—পড়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "ভাখ, আমি সংস্কৃতে ইংরাজীতে বহু কাব্য পড়েছি, মিলটন, শেক্সপীয়র, কালিদাস আমার কণ্ঠস্থ কিন্তু 'বিল্বমঙ্গল'খানা আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে।" (১৬)

গিরিশচন্দ্রের নাটকের গান নরেন্দ্রনাথের কাছে একান্ত প্রিয় বস্তু। 'চৈতন্যলীলা' দেখার পর তাঁর কণ্ঠে নাটকের গান :

রাধা বই আর নাইকো আমার
রাধা বলে বাজাই বাঁশী—
মানের দায়ে সেজে যোগী
মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥

হয়ত আপন ঈশ্বর-ব্যাকুলতার স্বরূপটি তিনি এ গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।
মহেন্দ্রনাথ দত্ত গিরিশের নাটকের গানের কথা বলেছেন, যেগুলি নরেন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল।
'বুদ্ধদেব চরিতে'র 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই' এবং 'ছাড় মোহ ছাড়রে কুমন্ত্রণা' বরানগর মঠের কঠোর তিতিক্ষার দিনগুলিতে নরেন্দ্রনাথের অন্তরের অনেক অকথিত বেদনা উদঘাটিত করত। (১৮) শিষ্য মণ্ডলীর কাছেও গেয়েছেন গিরিশ নাটকের গান।
'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' রচনায় নিবেদিতা "প্রেমের রাজা কৃষ্ণ বনে" (নিমাই সন্ন্যাস) ও "পরমাত্মন পীত বসন নবঘন শ্যামকায়" গান শোনানোর কথা উল্লেখ করেছেন।
গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্পর্কে তাঁর প্রশংসাবাণী গিরিশচন্দ্রকে যে অনেকখানি উৎসাহিত করেছিল সন্দেহ নেই। একদিন মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গেও গিরিশ-নাটকের প্রশংসা করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে :
"এই যে জি. সি (স্বামীজী গিরিশচন্দ্রকে জি. সি বলতেন) কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিত-গণ কত Criticise (সমালোচনা) করছে, দোষ ধরছে! জি. সি কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে ? পরে লোকে ঐ সব বই appreciate (আদর) করবে।" (১৯)

শুধু নরেন্দ্রনাথ কেন রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকেই নাটকের জগতের সঙ্গে আত্মীয়-তার সূত্রে জড়িয়ে পড়েছেন।
স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 'চৈতন্যলীলা' ও 'প্রহ্লাদ চরিত' দেখতে গিয়ে-ছিলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ তাকে যেমন বিস্মিত করেছিল তেমনি তার মধ্যে এনে দিয়েছিল উদারতা। শুরু কঠোর কালীতপস্বী থিয়েটারের সমজদার হয়েছেন। পরে দেখেছেন 'বিলমঙ্গল'—তাঁর আত্মস্মৃতি-কথন থেকেই জানতে পারি। (২০)
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থের মধ্যে অভেদানন্দের সঙ্গে মিনার্ভামঞ্চে দানী-বাবুর অভিনয় দেখতে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সেদিন দানীবাবুর যোগেশের

ভূমিকায় অভিনয় দেখে তার ভাল-মন্দ সমালোচনা করছিলেন অভেদানন্দ শিষ্যদের কাছেও দানীবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি অভেদানন্দের কাছে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলেন। অভেদানন্দ উত্তর দিলেন—'তোমার বাবার অভিনয় তো আমরা দেখেছি।' এই কথায় মনে হয়, তিনি গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ'-ও (প্রফুল্ল) দেখেছিলেন। এই গ্রন্থে অপরেশবাবুর আমন্ত্রণে তাঁর স্টার থিয়েটার-এ সাজাহান নাটক দেখার কথারও উল্লেখ আছে। জ্ঞানাত্মানন্দ মন্তব্য করেছেন "দেশের এই সকল অভিনেতা ও নাট্যকারদের উৎসাহ দিবার জন্যই মহারাজ যেন উহাদের ঐ সকল অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কথাচ্ছলে আর একদিন অপরেশবাবুকে বলিয়াছিলেন 'আপনারা Original (মৌলিক) হোন, তাহলে ও-দেশেও (পাশ্চাত্যেও) আপনাদের আদর হবে। ওরা Originality চায়, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে অত শ্রদ্ধা করে।' (২১) গৈরিশ সাহিত্য ও অভিনয়-কলা স্বামী অভেদানন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে অভেদানন্দ গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

"কেবল বাঙ্গালাদেশ কেন, সমগ্র ভারতে এত বড় Original নাট্যকার জন্মায় নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্যের জগতে তাঁর দান অপরিসীম।..... বিশেষ করে পৌরাণিক নাটক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বহুমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা।"(২২)

প্রসঙ্গত একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ গিরিশ প্রতিভা বিচার করতে বসে সকল সময় তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। উভয়েই বিদেশী নাট্যসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন, বিদেশের সমকালীন খ্যাত-কীর্তি-অভিনেতাদের অভিনয় দেখারও সুযোগ পেয়েছেন, যে-সুযোগ সকল সমালোচকের ভাগ্যে জোটে না। অভেদানন্দের একটি তুলনামূলক আলোচনা দেখা যাক :

"আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি এডমণ্ড রাসেলের অভিনয় দেখে। 'ম্যাজিসন স্কোয়ার কনসার্ট হল'-এ সেদিন ছিল শকুন্তলা অভিনয়। রাসেল ভূমিকা নিয়েছিলেন দুষ্মন্তের। দুষ্মন্তের ভূমিকাকে তিনি জীবন্ত করেছিলেন। 'ওয়ার্লাক থিয়েটার'-এ রাসেলের হ্যামলেট অভিনয়ও আমি দেখেছি। কি প্রতিভাবান অভিনেতাই না তিনি ছিলেন! তাঁর অভিনয় দেখে আমার সর্বদাই মনে পড়ছিল গিরিশবাবুর অভিনয়ের কথা। গিরিশ-প্রতিভাকে এদেশে কেউ ঠিক চিনলে না, এটাই আমার দুঃখ। বিল্বমঙ্গলে বা চৈতন্যলীলায় অভিনয় আমি দেখেছি। তুলনা করলে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গিরিশবাবুর অভিনয়ের কোন কোন অংশ রাসেলের অভিনয়-নৈপুণ্যের চেয়ে সহস্রগুণে ভালো।"

রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বহির্ভারতের নাট্যশিল্পের সঙ্গে বাঙলা রঙ্গ জগতের যোগস্থাপনাও ঘটেছে পরোক্ষভাবে। গিরিশচন্দ্র নির্দেশ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন উৎসাহ

ও পরামর্শ। নিবেদিতা ৯।১।১৮৯৯ শ্রীমতী ম্যাকলাউডের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

"Good Old Mr. Ghose has read Brand [ইবসেন] and is in raptures. He says its conformity with Indian thought astonishes him—and he throws great light on the unsolved problem of the book."

॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামদত্তের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ। পেশায় ডাক্তার, নেশায় যাত্রাদল পরিচালক তিনি। বেলঘরিয়ায় যাত্রার আখড়া। তার জন্যে পালা-ও লিখেছেন 'বাল্য বিবাহ', কিন্তু পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নটী নিয়ে অভিনয়ের নাম শুনলেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গেও যান নি রঙ্গমঞ্চে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আন্তরিক সৌহার্দ্য সত্ত্বেও থিয়েটার থেকে শত হস্ত কেন সহস্র হস্ত দূরে থেকেছেন। সেই গিরিশের প্রতি রামকৃষ্ণের ভালবাসা তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে—এতদিনের ঘৃণা, কুণ্ঠা—সব ঘুচে গেছে। আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমি কি নির্বোধ যে, প্রভু যেখানে পদার্পণ করেছেন, যেখানে পতিতকে কৃপা করতে উদয় হয়েছেন, সেই স্থানকে কলুষিত জ্ঞান করেছি। দীন দয়াময় থিয়েটার দেখার ছল করে দীনকে দয়া করতে এসেছিলেন, মূর্খ আমি, সে কথা বুঝিনি। দেবেন, দেখবে, এই থিয়েটারের লোক আর সামান্য থিয়েটার-ওয়ালা থাকবে না, প্রভুর কৃপায় তারা হবে আমার আরাধ্য।" (২৪)

সেই রামদত্তই সর্বপ্রথম তাঁর নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বনামে (সশরীরে নয়) আনলেন মঞ্চে। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ চরিত্র এঁকেছেন রূপকের সাহায্যে—রামদত্ত কোনো আড়াল রাখেন নি।

নাটকের নাম 'লীলামৃত'। 'উদ্বোধন'—১৫ কার্তিক, ১৩০৭-এর একটি সংবাদ :

"লীলামৃত: নাটকাকারে একখানি ধর্মগ্রন্থ। ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। গ্রন্থকার কলিকাতা নিবাসী অনেক মহাত্মার সুপরিচিত ছিলেন ; তাঁহার পবিত্র জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ধর্মের জন্য এতদূর উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হইতেন। সেই বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণপ্রসূত 'লীলামৃত'। ইহাতে ভগবানের লীলা ভক্তগণের নিকট যে কি অমৃতময়, তাহা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকার পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর, সম্প্রতি তৎপ্রিয়বন্ধুগণ কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া 'তত্ত্ব মঞ্জরী'র উপহার স্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে (তত্ত্বমঞ্জরী গ্রন্থকারের প্রচারিত একখানি মাসিক পত্রিকা)।"

লীলামৃত রচিত হয়েছিল ১৩০৫ মাঘের (রামচন্দ্রের লোকান্তর) অনেক আগেই.

কিন্তু প্রকাশিত হলো তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এই নাটকটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে একটু বিস্তৃত আলোচনা করি।

রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। এ নাটকে তিনি তাঁকে অবতার রূপেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। প্রথম অঙ্কে গোলোকে নারায়ণের পৃথিবীতে আগমনের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন। পূর্ব পূর্ব অবতারের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন "গৌরাঙ্গলীলায় দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় যা অব্যক্ত রেখেছি, এবার তাই প্রকাশ কর্বো।"—"

"গৌরাঙ্গলীলায় অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই তিনরূপে তিনভাব স্বতন্ত্র করে অভিনয় করেছি, জীব তা জানে। এবার দেখাব যে, আমিই সেই তিনের সমষ্টি। আমিই অদ্বৈত, আমিই চৈতন্য, আমিই নিত্যানন্দ। আমারই তিনভাব একাধারে প্রকাশিত হবে।"

একদিনের কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। সেদিন বামদত্ত গিরিশচন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতলায় একান্তে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার কথা বলেছিলেন "গিরিশদাদা, বুঝিয়াছ কি, এবার একে তিন—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব। তাহার ভাব এই যে একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গ-অবতারে তিনাধারে তাঁহার বিকাশ ছিল।" (২৫)

রামদত্তের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা এবং তাঁর লীলাসহচররা যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন সেটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নারায়ণ নারদ সংলাপের শেষাংশে :

"নারায়ণ—উনবিংশ শতাব্দী জ্ঞানালোচনার সময়। সেইজন্য শক্তির দ্বারা, ভাব দ্বারা আমি কার্য করবো। জ্ঞানে চক্ষু প্রস্ফুটিত হলে, বিশ্বকাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থই আশ্চর্য। অধিক কি বলবো, পার্থিব পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুই জীবের বুদ্ধির অতীত তারা তাই দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অন্য আশ্চর্য আর কি দেখবে। এই জ্ঞানশক্তির দ্বারা আমি তাদের হৃদয়ে অনন্ত কাণ্ড বদ্ধমূল করে দিয়ে ভক্তি ভাব প্রবল করবো। তখনই জীব আমার প্রেমে বিহ্বল হয়ে যাবে।

"নারদ—জ্ঞানভক্তির দ্বারা যদি কার্য কর, তাহলে তো তোমার ক্লেশের অবধি থাকবে না। এত বাক্যব্যয় একাকী কেমন করে করবে?

"নারায়ণ—একা নয়; জ্ঞান ভক্তির মূর্তি ধারণ কর্বো। ঘটে ঘটে প্রবেশ করে তাদের মুখে তত্ত্ব কথা প্রকাশিত করবো।"

পঞ্চাঙ্ক এই নাটকটির প্রথম অঙ্ক (গোলোক) পটভূমিকারূপে কল্পিত। দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে মূল কাহিনীটি সামাজিক। শৈশবে শিবসুন্দরী খেলাচ্ছলে পূর্বাঞ্চলের জমিদার গোলকবাবুকে পতিত্বে বরণ করেছিল। এগারো বারো বৎসর বয়সে তাঁর অন্যত্র

বিবাহের ব্যবস্থা হলে মায়ের আদেশ অমান্য করে তার শৈশবে স্ব-নির্বাচিত স্বামীর (যাঁর এক স্ত্রী ও বিধবা পুত্রবধূ বর্তমান)আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে বাল্যকাল থেকে শিবসুন্দরী সংসার-উদাসীন এবং তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। সে বৃদ্ধ গোলকবাবুর আশ্রয়ে আপন কৌমার্য রক্ষা করে ঈশ্বর-আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু গোলক তার এই দ্বিতীয়া কিশোরী বধূর উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে ওঠে—অবশেষে ব্যর্থ হয়ে শিবসুন্দরীকে গৃহত্যাগে বাধ্য করে। শিবসুন্দরীর সান্নিধ্যে এসে গোলকের বিধবা পুত্রবধূর মধ্যে আসে পরিবর্তন—সেও শিবসুন্দরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে।

পাশাপাশি অপর একটি কাহিনীবৃত্তে এক মহাপুরুষের অবতারত্বে আস্থাবান জ্ঞানবাবুর সঙ্গে বিরোধ তার বন্ধুবান্ধবদের—তাদের মধ্যে আছে ডাক্তার, মুন্সেফ, সদরওয়ালা, ভট্টাচার্য, গোস্বামী, নাস্তিক, ব্রাহ্ম ইত্যাদি। জ্ঞানবাবুর গভীর ভক্তি-বিশ্বাস একে একে তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনে—একে একে সকলেই বিশ্বাস করে :—"প্রভু আমার পাপীর ঠাকুর, তাই তাঁর নাম পতিতপাবন।"

"আপন মূর্খতার ফলে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞানগর্বে, এতদিন দুরন্ত ক্লেশের গ্রাসে পতিত হয়ে, তার দন্তে দন্তে সংপিষ্ট হলুম। কিন্তু দয়াময় দয়া করে আমার সেই আত্মশ্লাঘা, বুঝি —সব ভাব, এই হতে পারে, আর না হতে পারে—সেই সর্বনাশের পথোন্মোচনকারী ভাব, পদার্থ বিদ্যার দুই পাতা, দর্শনের চার পাতা, অধ্যয়নের বিষময় ভাব হতে রক্ষা কল্লেন।"

"পূর্ণব্রহ্ম অবতার, পাষণ্ড দলন, সাম্প্রদায়িক ভাব চূর্ণকারী, অদ্বৈতজ্ঞানের অবতার, চৈতন্যভাবের মূর্তি, নিত্যানন্দের জলন্ত ছবি, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলুম। প্রভুর অপার করুণা। তা না হলে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মতো নরাধমকে পরিত্রাণ কল্লেন ?"

জ্ঞানবাবুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন দুর্নীতিপরায়ণ সকল ব্যক্তিই। এদেরই একজন গোলকবাবু, যিনি এক বারবনিতা হত্যার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

শিবসুন্দরী নানা তীর্থ ভ্রমণ করে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে এক যোগীর সাক্ষাৎ পায়। তাঁর কাছে জানতে পারেন, জ্ঞানবাবুর কথায় সন্দেহ করে যাকে গ্রহণ করতে পারেন নি তিনিই পূর্ণব্রহ্ম। সে-ও ফিরে আসে জ্ঞানবাবুর কাছে—সেই যোগীশ্রেষ্ঠের শরণ গ্রহণ করতে।

শেষ দৃশ্যে সকলে কীর্তনানন্দে আত্মহারা

তুমি পূর্ণজ্ঞান দেখিতে অজ্ঞান
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি পূর্ণ অধিষ্ঠান—

জ্ঞান হতে বিজ্ঞান তুমি, নতশির সবাকার।

এই মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে উন্মাদিনী বেশে শিবসুন্দরীর প্রবেশ—তার নেতৃত্বে সকলের কীর্তন গান। যবনিকাপাতের পূর্বে এক সাধকের প্রবেশ এবং সংগীতের মাধ্যমে রামকৃষ্ণলীলার মূল তত্ত্বগুলি প্রকটিত :

একাধারে বিরাজ করে অদ্বৈত গৌর নিতাই
সে হাসে কাঁদে নাচে গায় কভু লুণ্ঠিত ধূলায়
(হরি হরি বলে পড়ে ঢলে)
(কভু নয়ন ঝরে মা মা বলে)
(ঈশামুশা বলেও ভাবে ভোলে)
(আবার সকল ভাবই তাঁতে খেলে)……
করি সর্ব ধর্ম-সমন্বয় জীবে করালে প্রত্যয়……
দেখ পূর্ণব্রহ্ম বহুরূপী সকল ভাবেই তারে পাই ॥
যে ত্রেতায় রাম দ্বাপরে কৃষ্ণ সেই এবে রামকৃষ্ণ
(এবার একই দেহে যুগল নামে)
(জীব উদ্ধারিতে দীনের বেশে)
এই জীবতরাণ মধুর নামে প্রাণে শান্তি জাগে সদাই—
কত অভাজন তরে গেল দিয়ে ঐ নামের দোহাই
জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল ভাই ॥

নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে কল্পতরু উৎসবে—১ জানুয়ারি ১৯১৪। ১৩২০ মাঘ সংখ্যা তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় এই অভিনয়ের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে : "ঐ দিবস রামচন্দ্রের আশ্রিত পটল ডাঙ্গার ভক্তবৃন্দ উক্ত মহাত্মার লিখিত 'লীলামৃত' নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। বোধহয় শীঘ্রই ইঁহারা একদিবস সাধারণ নাট্যমন্দিরে ঐ নাটক অভিনয় করিয়া ভক্তবৃন্দকে শুনাইবেন।" প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্টার থিয়েটারে পটলডাঙ্গা-নাম-কীর্তন সমিতি 'লীলামৃত' নাটকের অভিনয় করেন ২৩ জানুয়ারি। 'তত্ত্বমঞ্জরী' ফাল্গুন সংখ্যায় এই অভিনয়ের 'বসুমতী'-কৃত সমালোচনা উদ্ধৃত হয়েছে :

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক মহাত্মা রামচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবলম্বনে এই নাটক লিখিয়াছিলেন। আমরা এই অভিনয় দর্শন করিয়া সে দিবস যে আনন্দিত হইয়াছি তাহা জীবনে কখন ভুলিব না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দয়াবতার পতিতপাবন পতিতের উদ্ধার কর্তা বলিয়া তাঁহার ভক্ত 'জ্ঞানবাবু' যেরূপে ও যেভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতে হয়। ডাক্তার ও উকীলের জীবন পরিবর্তন

ও শিবসুন্দরীর ভক্তির ভাব দেখিলে রোমাঞ্চিত না হইয়া থাকা যায় না। যেমন পুস্তক তেমনি তাহার সুন্দর অভিনয় হইয়াছিল। প্রত্যেক অংশ যে এরূপ ভাবে অভিনীত হইবে তাহা আমরা আদৌ আশা করি নাই। এমেচার পার্টি যে অভিনয় দেখাইয়াছেন তাহা কোনো অংশেই থিয়েটার কোম্পানী অপেক্ষা মন্দ হয় নাই। আবার পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীগণের অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল যে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে ইঁহারা বোধহয় বারনারীগণ কর্তৃক স্ত্রী অভিনয় করাইতেছেন।

স্টার কোম্পানী ইহাদের দৃশ্যপট দেখাইয়া এই অভিনয় আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিলেন।...সর্বশেষে ফুলমালার সুশোভিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব দেখিয়া আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছিল।"

'লীলামৃত' নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয় গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল রঙ্গমঞ্চে ১৯১৪-২০ ফেব্রুয়ারি। খরচবাদে বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ প্রদত্ত হয় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিমন্দির নির্মাণে। তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকার ১৩২১ বৈশাখ সংখ্যায় গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কর্তৃপক্ষ বিনা ভাড়ায় তাদের প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যে এবং গ্রেট ইড়িন ও এরিয়েল প্রেস বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছাপানোর জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন পটলডাঙ্গা নামকীর্তন সমিতি।

নাটক হিসাবে 'লীলামৃত' যেমনই হোক না কেন, লেখকের মূল উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা প্রচার, সম্পূর্ণ সফল। লেখকের পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব হলো, নাটকে কোথাও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মঞ্চাবতরণ দেখান নি অথচ সর্বত্র তাঁর পরিচিতিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। শেষ দৃশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির মাত্র আবির্ভাব—অভিনয়ের পাত্র হিসাবে উপস্থিতি নয়। এর সংগীতগুলি রচনা করেন সেবকমণ্ডলী। একখানি গান কালীপদ ঘোষের রচনা হিসাবে গৃহীত হয়েছে "রামকৃষ্ণ সংগীত বা ঠাকুরের নামামৃত" পুস্তিকায়—

সাধু কি অসাধু জানি না।
সে ত আপনি কিছু বলে না।
শুধু বলতে সাধু মন ত সরে না॥
সাধু বলে অসাধুরে দেয় সাধে সে কোল
চরণ পেলে অবহেলে ঘোচে ভবের গোল
প্রেমে বলে হরিবোল ;
চিন্তা যাঁর চিন্তামণি, চিনেও তাঁরে চিনি না।

'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় রামচন্দ্র দত্তের আরও একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল 'নিত্যানন্দ বিলাস'। সম্ভবত এটি কোনোদিনই পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে নি। (২৬)

এই নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্র ১২ খানি গান রচনা করে দিয়েছিলেন যেগুলি ঐ পত্রিকাতেই ১৩১০ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সর্বসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে রামকৃষ্ণোৎসবের সূচনা 'যোগোদ্যানে'। চতুর্দশ বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের পর 'তত্ত্বমঞ্জরীর' সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার এক সপ্তাহ পরে (৮ই ভাদ্র) তাঁর ভস্মাস্থি একটি তাম্র কলসে সংগ্রহ করে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে অনেকের কাছে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে এবং সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সকলকে উৎসবে যোগদানে আহ্বান জানান হয়। সেদিন স্টার থিয়েটারের দল 'চৈতন্যলীলা'র গান 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়' কীর্তন করতে করতে পথপরিক্রমায় সকলের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। অমৃত-লাল বসু এ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। (২৭)

থিয়েটার যেমন রামদত্তের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে—তারাও সাহায্য করেছে তাঁকে নানাভাবে। প্রতি বৎসর উৎসবে স্টার থিয়েটারের সঙ্কীর্তনে অংশগ্রহণ এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সাক্ষ্য। ১২৯৯ থেকে রামদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রচারমূলক বক্তৃতা করতে শুরু করেন। অমৃতলাল, কালীপদ ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে তাঁর বক্তৃতাগুলি হয়েছে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে। স্টার, সিটি ও মিনার্ভা—এই তিনটি থিয়েটারে মোট ১৮টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। (২৮) আবার সেই রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর তাঁর জীবনমাহাত্ম্য প্রচারে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বিজয়নাথ মজুমদার বক্তৃতা দিয়েছেন মিনার্ভা থিয়েটারে (২৯)—তাঁর সমাধিস্থানে একটি কুটির নির্মাণে 'স্টার থিয়েটার কোম্পানীর সভ্য মহোদয়গণ' পঁচিশ টাকা অর্থসাহায্য করেছেন। (৩০) রামচন্দ্রের বক্তৃতা ছাড়া মঠ মিশন সংক্রান্ত বক্তৃতার জন্যে থিয়েটারের দরজা সকল সময়েই উন্মুক্ত। ১৮৯৭ সালে স্টারে এস্ রঙ্গাচার্য একদিন, ১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতার দু'দিন বক্তৃতার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৮-তে এমারেল্ড থিয়েটারে এবং ১৮৯৯-তে ভগিনী নিবেদিতা ক্লাসিক থিয়েটারে দু'দিন বক্তৃতা দিয়েছেন। (৩১)

রামচন্দ্র থিয়েটারকে নানা ভাবেই সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ, যখন থিয়েটারে বারবনিতা সংক্রান্ত সামাজিক বিরোধিতা তুঙ্গে, তখনই তিনি এগিয়ে এসেছেন—'তত্ত্বমঞ্জরীতে' অত্যন্ত জোরালো ভাষায় থিয়েটারে অভিনেত্রীর যোগদান সমর্থন করেছেন—এ প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

॥ ৪ ॥

"আমার দু'টি জাহাজ"—বলতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

একজন কাইজার—(ললিত চট্টোপাধ্যায়) থিয়েটার করে আর অন্যজন পুলিন মিত্র, বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। (৩২)

এ রকম অনেক জাহাজ, নৌকো, জেলেডিঙি পর্যন্ত বেলুড়ের ঘাটে ভিড়েছে রাজা-মহারাজের দরবারে। উনি তাঁদের কাণ্ডারী।

সেবারের কথা বলি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে নেই—অমৃতলালের কাছ থেকে খবর এলো উনি আসছেন প্রসাদ পেতে। মহারাজ মঠে নেই—কিন্তু তাঁর পাকা হুকুম, ওঁদের আদর আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয়। সুতরাং সকলকে তৈরী থাকতে হবে। এ সব লোককে সামলানো বড় সোজা কথা নয়। ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে দুটোর ঘর ছুঁতে চলেছে—এমনি সময় এসে পৌঁছলেন অমৃতলাল। কাশফুলের মতো এক মাথা বাবরি চুল কাঁধে পড়েছে, সঙ্গে এসেছে ভৃত্য, তেল মাখাবে—তারপর গঙ্গাস্নান এবং সবশেষে ধীরে-সুস্থে প্রসাদ পাওয়া। আহারের পর তামাকের নেশা—গড়গড়া এসেছে সঙ্গে—তামাক টিকে সব বন্দোবস্ত।

এ কিন্তু সব গা সওয়া হয়ে গেছে তরুণ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের। থিয়েটারের দলের লোক, ওরা একটু বে-হিসেবী ত হবেই। অন্য পাঁচজনের মতো সব নিয়ম ঠিক ঠিক মেনে চলবে না, তার জন্যে কষ্ট একটু করতেই হবে। কিন্তু রাজা-মহারাজের আদেশ—ওদের যেন কোনো কষ্ট না হয়। (৩৩)

ভুবনেশ্বরের মঠ তখনো সম্পূর্ণ হয় নি, সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। রাজা মহারাজ আছেন সেখানে—মঠ গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। শিষ্যা তারাসুন্দরী অজীর্ণ রোগে ভুগছেন। মহারাজ বললেন, ভুবনেশ্বরে কেদার-গৌরীর জল নিয়মিত খেলে সব রকম পেটের রোগ ভালো হয়। তারাসুন্দরী গেলেন ভুবনেশ্বরে। দুধওয়ালা ধর্মশালায় থাকেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খাবেন না। মঠ থেকে রোজ প্রসাদ পাঠানোর বন্দোবস্ত হলো। স্বামী ব্রহ্মানন্দের তাই নিয়ে রোজ তাড়া। ঠাকুরের ভোগ হতেই আগে পাঠিয়ে দিতেন দুধওয়ালা ধর্মশালায় 'তারা মা পূজো করে এখনো জলটুকুও মুখে দেয় নি!' যে লোকটি প্রসাদ নিয়ে যেত তার এক খুঁটে প্রসাদী পান, অন্য খুঁটে চা-চিনি। ভুবনেশ্বরে তখন ও-সব পাওয়া যায় না। তারাসুন্দরীর চোখে জল আসত—পিতৃস্নেহ কি তা কোনোদিন জানতে পান নি—গুরু-স্নেহধারায় সে অভাব তাঁর ঘুচে যেত। কোনোদিন হয়ত সঙ্কোচে কুণ্ঠায় বলেছেন 'কাল থেকে, আমি নিজে

এসেই প্রসাদ পেয়ে যাব।' তীব্র নিষেধ করেছেন ব্রহ্মানন্দ 'না, না গো তারা মা, দুপুরে বড় রদ্দুর—এদেশে গাড়ি পাওয়া যায় না। তুমি কষ্ট করে এসো না—আমিই তোমায় প্রসাদ পাঠিয়ে দেব। (৩৪)

বেলুড়ে এসেছেন তারাসুন্দরী—ঘর্মাক্ত, পথশ্রান্ত। ব্রহ্মানন্দ নিজে হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে তারাকেও হাওয়া করছেন। তারাসুন্দরী কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত। (৩৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গভীর সংযোগের কথা লিখেছেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বঙ্গভূমি' প্রবন্ধে :

"কিসে থিয়েটারের উন্নতি হয়, অপবিত্রচিত্ত যে, এই থিয়েটার হইতেই কিরূপে সে আত্মশুদ্ধি লাভ করে, রঙ্গমঞ্চ হইতেই কেমন করিয়া ধর্মভাব প্রচারিত হয়, কি করিয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লক্ষ্য উচ্চ হয়, তাহারা সৎ হয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল তাহাই। গিরিশবাবুকে 'শঙ্করাচার্য' লিখিবার জন্য তিনিই বলেন। গিরিশ চন্দ্র 'শঙ্করাচার্য' লিখিলেন, অনেকেই বলিলেন, 'মশাই লোকে থিয়েটার দেখতে আসবে, না আপনার বেদান্তের বক্তৃতা শুনতে আসবে? আপনারও যেমন, এ নাটক কি লোকে নেবে?' গিরিশবাবুর কিন্তু গুরুভাইয়ের কথা বেদবাক্য। রাখাল মহারাজ বলিয়াছেন। তিনি নাটক লিখিলেন। সে নাটকের অভিনয়ও হইল। অমন স্বদেশী ঐতিহাসিক নাটকের যুগে সেই বেদান্তবিধৃত নাটক প্রথম স্থান অধিকার করিল। শঙ্করাচার্যের বিক্রম, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম, সাজাহানকে ছাড়াইয়া গেল। ইহা গল্প নহে। তখনকার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের হিসাবের খাতা ইহার সাক্ষ্য।" (৩৬)

অপরেশবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকেই জানতে পারা যায় ব্রহ্মানন্দের আদেশেই গিরিশ 'তপোবল' রচনা করেন এবং "তপোবলও রঙ্গালয়ের আর্থিক সমস্যা কম পূরণ করে নাই।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন 'রামানুজ' নাটক। একটি করে অঙ্ক রচনা শেষ করেই যেতেন স্বামী সারদানন্দের কাছে—পাঠ করে শোনাতেন—নির্দেশমতো সংশোধন করে নিতেন। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলির সহজ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন সারদানন্দ। অপরেশচন্দ্র বলেছেন "লোকে যাহাতে ইহা গ্রহণ করে ইহার জন্য মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) ও তাঁহার (সারদানন্দের) কি আগ্রহ! রামনাম প্রচার করিতে হইবে—রামানুজে রামনাম কীর্তন দাও; সে গানের সুর দিবেন নারদ মহারাজ—স্বামী অম্বিকানন্দ। তাঁহাকে কাশিমবাজারে টেলিগ্রাম করা হইল; তিনি আসিয়া সুর দিলেন; একখানির নয়, অমন কত গানের; সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীর বেদনার জন্য তাঁহার কি কাতরতা! এ সব কথা বাঙ্গালা-

দেশের থিয়েটার কখনও ভুলিতে পারে না। এ ব্যবহার জীবনে যে পাইয়াছে, সে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাহা ভুলিবে না।" (৩৭)

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের) স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে অপরেশচন্দ্রের নাটক পাঠের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দিয়েছেন "অপরেশবাবু তখন রামানুজ বা কর্ণার্জুন লিখিতেছিলেন বলিয়া মনে পড়ে, শ্রীশ্রীমহারাজকে উহার Manuscript বা খসড়া পড়িয়া শুনাইতেন ও শ্রীশ্রীমহারাজ উহার কিরূপ অদলবদল করিলে ভালো হয় বলিয়া তাঁহার Suggestion দিতেন, অপরেশবাবুও তাহা মাথা পাতিয়া লইতেন।" (৩৮)

সেই 'রামানুজ' নাটক দেখতে এলেন ব্রহ্মানন্দ। সেদিনের কথা লিখেছেন তারা-সুন্দরী—"অভিনয় শেষ হইলে আমি মহারাজের পায়ের ধূলি লইলাম—মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন; বলিলেন 'বেশ, বেশ, খুব ভক্তিবৃদ্ধি হ'ক। কৃতার্থ হইলাম।" (৩৯)

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্বামী ব্রহ্মানন্দও রঙ্গালয়কে লোকশিক্ষার কেন্দ্ররূপে দেখতে চেয়েছিলেন—তার জন্যে তিনি সাহায্য করেছেন সর্বপ্রকারে। অপরেশচন্দ্রের কথায় "থিয়েটার কেবল আমোদাগার না হইয়া ইহা যে জাতীয় শিক্ষালয়ের মানুষ তৈয়ারী করিবার একটা অনুষ্ঠানে পরিণত হয় এ বিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি থিয়েটার দেখিতে যাইতেন ; নট-নটীকে উৎসাহ দিতেন ; তাহাদের নৈতিক কল্যাণ কামনা করিতেন। তাহারা যাহাতে সমাজের কল্যাণকর কাজে জীবন অতি-বাহিত করে, সে বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করিতেন।" (৪০)

শঙ্করাচার্যের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয়ে প্রীত হয়ে ব্রহ্মানন্দ তাঁকে স্বর্ণ বা রৌপ্য-পদক দেন নি—তাঁকে উপবীত পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন "তুমি উপবীত ধারণের উপযুক্ত।" (৪১) গভীর শ্রদ্ধায় সে উপবীত গ্রহণ করেছিলেন দানীবাবু। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয় কিম্বদন্তী হয়ে আছে। চাণক্যের ব্রাহ্মণাভিমান প্রকাশ করতে দানীবাবু স্পর্শ করতেন সেই উপবীত (শিশিরকুমার স্পর্শ করতেন শিখা)। উপবীত স্পর্শ করে চাণক্য যেমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন দ্বিজত্বের গৌরবে—শিল্পী দানীবাবুও তেমনি উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন তাঁর অভিনেতা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোভাবের পর স্টার রঙ্গমঞ্চে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে অপরেশ চন্দ্র রচিত একটি গানে ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা উৎসারিত :

হতাশে হুতাশে ঘুচাইতে ব্যথা
হেসে হেসে আর কে কহিবে কথা
যাচিয়ে সাধিয়ে কোলে তুলে নিয়ে

নিরাশ আঁধারে কেন গো ডুবালে।...
দিয়ে অযাচিত প্রীতি ভালবাসা
শুধু বাড়াইলে আশাতীত আশা
মিটিল না আশা, রহিল পিপাসা
ভাসায়ে অকূলে কেন গো লুকালে। (৪২)

ব্রহ্মানন্দের তিরোভাবে অসীম শূন্যতার মধ্যে স্মৃতিচারণ করেছেন তারাসুন্দরী :

"কে আমি ? সমাজের কোন্ স্তরে আমার স্থান ? কত—কত নিম্নে—ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া জগতের কাছে যার প্রাপ্য আর কিছুই নেই—না বন্ধু, না পিতা, না আত্মীয় —এত বড় সংসারটা—এ যেন একটা পরের বাড়ি। স্বার্থ ভিন্ন কেউ কথা কয় না, ফিরেও চায় না—জগতে আপনার বলতে কেউ নাই। আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্বপূজ্য সর্বমান্য মহারাজ, কি আকুল আগ্রহে কি অকৃত্রিম স্নেহে, কি অপ্রত্যাশিত যত্নে আমাকে আপনার করিয়া লইলেন।"(৪৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের সকলের সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' রচনায় স্বামী সারদানন্দের অনেকখানি দান ছিল, এ কথা অপরেশচন্দ্রই বলেছেন। তারই স্বীকৃতি-স্বরূপ নাটকটি সারদানন্দকে উৎসর্গ করে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন :

"পরমারাধ্য
শ্রীল শ্রীমদ্ সারদানন্দ স্বামী মহারাজ
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

দেব, আপনার আশীর্বাদ অবলম্বন করিয়াই রামানুজ নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। অকিঞ্চিৎকর হইলেও এই গ্রন্থ আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।"

ক্ষীরোদপ্রসাদও পেয়েছেন সারদানন্দের প্রেরণা—তারই স্বীকৃতি দেখি 'ভীষ্ম' নাটকের উৎসর্গ-পত্রে :

"যাহার সদিচ্ছা প্রেরণায় ও আশীর্বাদে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামীজী মহারাজকে ইহা উৎসর্গীকৃত হইল।"

সারদানন্দের তিরোভাবের পর অমৃতলালের "বন্দনাগীত"

বন্দ সে সারদানন্দ নাম
ধন্য হব স্মরি পুণ্যধাম
সাধুত্তম কর্মযোগী ক্ষমবান।
রামকৃষ্ণ লীলারঙ্গ অঙ্গ
নিত্যসিদ্ধ চিরারাধ্য সঙ্গ

কুমার সন্ন্যাসী শুদ্ধ শক্তিমান।
পণ্ডিত মণ্ডিত-জ্ঞান জ্যোতি
নিপুণ লেখনী বাণী জ্যোতি
বিপন্ন বান্ধব ত্যাগে আগুয়ান। (৪৩)

পতিত-পতিতাদের আশ্রয় স্বামী শিবানন্দও।

তারাসুন্দরী মস্ত চারঝুড়ি বড় বড় কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে হাজির হয়েছেন বেলুড় মঠে। সন্ধ্যারতির সময় সেই সন্দেশ ঠাকুরের ভোগে দেওয়া হবে—তারাসুন্দরীর ঐকান্তিক ইচ্ছা। যাঁর ওপর ভার ছিল তিনি কিন্তু অভিনেত্রীর আনা সন্দেশ ভোগে দিতে কুণ্ঠা বোধ করলেন। কথাটা স্বামী শিবানন্দের কানে তুললেন সেই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিই। শুনে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন শিবানন্দ। বললেন, রামকৃষ্ণের জাত ছিল, জানতুম না। যাই হোক, তাঁর এই চেলার জাত নেই। কোথায় সন্দেশ, নিয়ে এসো।' সন্দেশ আনা হলো—একটু টুকরো ভেঙে মুখে দিলেন—ভোগের সঙ্গেই সকলের পাতে পড়ল সন্দেশ। (৪৪)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর তারাসুন্দরী শেষ শান্তির আশ্রয়টুকু হারিয়ে অসহায়। মঠে যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও আর নেই। শিবানন্দ স্বামী লোক পাঠিয়ে ডেকে আনলেন "কি গো তারামা, আর আস না কেন?"

—"আর কার কাছে আসব মহারাজ? রাজা-মহারাজই তো নেই।"

—"সে কি গো, নেই কি?…ঠাকুর আছেন, আমরা আছি।" (৪৫)

আর সর্বোপরি আছে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ—যে দীপ তিনি জ্বেলে দিয়ে গেছেন, সে যে অনির্বাণ! সেই দীপে আলোকিত করো নিজেকে—নিজের শিল্প সুষমায় বাংলার মানুষকে।

সে আলো কেমন করে বাংলা নাটকে প্রতিফলিত হয়েছিল—এবার সেই প্রসঙ্গে আসি।

তথ্যপঞ্জী

১। বিনোদবিহারী সোম : থিয়েটারে পদ্মবিনোদ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রফুল্ল নাটকে ইণ্টারপ্রিণ্টার ও ডাক্তার, ম্যাকবেথে লেনক্স, জনায় প্রথম গঙ্গা-রক্ষক প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

২। 'শ্রীমা-সাবদাদেবী'—স্বামী গম্ভীবানন্দ (শতবর্ষ জযন্তী গ্রন্থ)—২৬৮।

৩। ঐ ঐ ঐ —২৯১।

৪। 'স্মৃতি-বিস্মৃতি'—সুকান্ত।

এই রচনাটিতে লেখক ঘটনার দিনে শ্রীবামচন্দ্র নাটকে 'চমম্বা'র ভূমিকায় নীরদাসুন্দরী অভিনযের কথা বলেছেন। 'চমম্বা' 'শ্রীবামানুজ' নাটকেব চরিত্র—'শ্রীবামচন্দ্রে'র নয়। শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী আমার কাছে জবান-বন্দীতে (১৪।৫।৭৪) 'শ্রীবামানুজ' নাটকেব কথাই উল্লেখ করেছেন।

অপরেশ মুখোপাধ্যায় এই দিনের ঘটনাব কথা উল্লেখ কবেছেন 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি' (রূপ ও বঙ্গ, ১৮ মাঘ ১৩৩১) প্রবন্ধে।

৫। 'শ্রীবামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা'—অমৃতলাল বসু।

(মাসিক বসুমতী ১৩৩৬, অমৃত স্মৃতি সংখ্যা-ক্রোডপত্র)।

৬। মন ও মানুষ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, —১৪৩-৪৪।

৭। 'মাতৃ-সান্নিধ্যে'—স্বামী ঈশানানন্দ—২১৪।

৮। ঐ ঐ —২১৫।

৯। 'শ্রীশ্রীমা সাবদামণি দেবী'—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত—৩৮৮।

১০। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি'—রূপ ও রঙ্গ, ১৮ মাঘ ১৩৩১।

১১। 'শ্রীমা-সারদাদেবী'—স্বামী গম্ভীবানন্দ (জয়ন্তী গ্রন্থ)—৩৪১।

১২। ঐ ঐ ঐ —২৫৮।

১৩। ফ্রান্সিস লেগেটের কাছে লেখা চিঠি।

Complete works (centenary) VII—255.

১৪। আমাব কথা—বিনোদিনী দাসী (সুবর্ণরেখা সংস্করণ)—৪৭।

১৫। ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১ম খণ্ড)—১০৯-১০।

১৬। ঘটনাবলী (১ম খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৪।

১৭। ঐ ঐ ঐ ৭২।

১৮। কথামৃত (১ম খণ্ড পরিশিষ্ট) ২৫৭-৫৮।

১৯। রচনাবলী (শতবার্ষিকী) ৯ম— ১১।

২০। 'মন ও মানুষ'—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১৬৫ ও ১৭০।

২১। 'পুণ্যস্মৃতি'—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ৭১-৭২।

২২। 'মন ও মানুষ'—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১৬৬।

২৩। ঐ ঐ ১৭০।

২৪। 'গিরিশ রচনাবলী' (সংসদ) ৫ম খণ্ড ২৯১।

২৫। ঐ ঐ ঐ ২৯১।

২৬। 'তত্ত্বমঞ্জরী'—১৩০৯

২৭। ঐ —১৩০৪ অগ্রহায়ণ।

২৮। 'থিয়েটারে রামচন্দ্রের বক্তৃতা'—তত্ত্বমঞ্জরী ১৯ চৈত্র ১২৯৯

২৯। 'তত্ত্বমঞ্জরী'—কার্তিক ১৩১১।

৩০। ঐ —২য় ভাগ ৬৪ রামকৃষ্ণাব্দ (১৯০০)

৩১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত 'বিবেকানন্দ ইন্ ইণ্ডিয়ান্ নিউজ পেপারস' গ্রন্থে থিয়েটারে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের বক্তৃতার বহু সংবাদ সঙ্কলিত হয়েছে।

৩২। ভরত মহারাজের স্মৃতিচারণ (শঙ্করীপ্রসাদ বসু অনুলিখিত) তাং ১৮।২।৭৪

৩৩। ঐ ঐ ঐ

৩৪। তারাসুন্দরী কন্যা প্রতিভা খান্নার স্মৃতিচারণ ১১।২।৭৬

৩৫। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের পত্র (লেখকের কাছে) তাং ২৬।৪।৭৬

৩৬। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি।'
রূপ ও রঙ্গ—১৮ মাঘ ১৩৩১।

৩৭। ঐ ঐ ঐ

৩৮। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের পত্র (লেখকের কাছে) তাং ২৬।৪।৭৬

৩৯। 'শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ' : তারাসুন্দরী দাসী।
উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

৪০। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি।'
রূপ ও রঙ্গ—১৮ মাঘ ১৩৩১

৪১। 'পুণ্যস্মৃতি' : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। ৭১।

৪২। 'উদ্বোধন'—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১।

৪৩। ঐ ঐ

৪৪। কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র স্বামী শিবস্বরূপানন্দের কাছ থেকে কাহিনীটি শুনেছিলেন। স্বামী শিবস্বরূপানন্দ দীর্ঘ দিন শিবানন্দের 'সেবক' ছিলেন।

৪৫। শ্রীমতী প্রতিভা খান্নার বিবৃতি ১১।২।৭৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চরিত-চিত্র

॥ ১ ॥

১৮৮৫ সালের এপ্রিল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দৈহিক অসুস্থতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং সেপ্টেম্বরে জানা যায় তিনি দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত।

রোগ বৃদ্ধি হতেই তাঁর গতিবিধির ওপর শিষ্যেরা বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন—পানিহাটির উৎসবে যোগদান শিষ্যদের মতের বিরুদ্ধেই। সেখানে তাঁর নৃত্যে অংশ-গ্রহণ ও বার-বার সমাধির ফলে শারীরিক অসুস্থতা বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে তাঁকে কলকাতায় এনে চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্যে প্রথম বাগবাজারে, পরে শ্যামপুকুরে রাখা হলো। শিষ্যদের নিষেধ ও সতর্কদৃষ্টি সত্ত্বেও তাঁর এ-সময়ের দিনগুলি সাধারণ রোগীর মতো কাটে নি অবশ্য নিষেধ এড়িয়ে বাইরে যাওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল না। সুতরাং গত কয়েক মাসে তাঁর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। মে মাসে (১৮৮৫) গিরিশচন্দ্র যখন 'প্রভাস যজ্ঞ' মঞ্চস্থ করলেন তখন আর শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে সে অভিনয়ে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একালেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতার কালে গিরিশ আরও দু'খানি নাটক লিখেছেন: (১) বুদ্ধদেব চরিত ও (২) বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। 'বুদ্ধদেব চরিতে'র সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা তিনি আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন—গান শুনেও আনন্দলাভ করেছেন, আর 'বিল্বমঙ্গল' রচনা তাঁরই নির্দেশ। 'ভক্তমাল'-এর একটি কাহিনী অবলম্বনে এই-নাটকটি রচনার পূর্বে গিরিশচন্দ্র এর কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি—এমন কি অভিনয়েরও কিছু কিছু নির্দেশনা পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। 'ভক্তমালে'র মূল কাহিনীর সঙ্গে গিরিশ-রচিত নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করলে তাঁর মৌলিক সৃজন-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু এর পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা ও সহায়তা কতখানি ছিল তা বোঝা যাবে না।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটক রচনার পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত—তাঁর 'গিরিশচন্দ্র—মন ও শিল্প' বক্তৃতাবলীতে। কোনো একদিন গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ—সকাশে গিয়েছেন—নানাকারণে সেদিন তাঁর মন ভারাক্রান্ত। গিরিশের মানসিক

অবসাদ দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভক্তমালে' বিল্বমঙ্গল কাহিনী অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গল্প করে শোনালেন। কাহিনীর নাটকীয়তা, শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গী—সব কিছু গিরিশকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে গিরিশচন্দ্র স্থির করেন এ-কাহিনী তিনি নাট্যরূপায়িত করবেন।

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও আমরা জানতে পারি "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিয়া গিরিশ এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন।" (গিরিশচন্দ্র, দে'জ সং,—২২৫)।

অপরেশ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন "শুনিতে পাই ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদেশেই গিরিশচন্দ্র 'বিল্বমঙ্গল' লিখিয়াছিলেন।" (রূপ ও রঙ্গ, ১৮ মাঘ ১৩৩১)

বিল্বমঙ্গলের মূল কাহিনীতে দেখি, দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণবেণা নদীরতীরে লম্পট স্বভাব বিপ্র বিল্বমঙ্গল বাস করত। নদী পারে ছিল বারবনিতা চিন্তামণির আবাস।

একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ মৃত তিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি।

সারাদিন কোনোরকমে কাটলেও 'দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে' বিল্বমঙ্গল ঘরে থাকতে পারল না। সেদিন 'বৃষ্টি বরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত' কিন্তু বিল্বমঙ্গল সব কিছু অগ্রাহ্য করে নৌকার অভাবে সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে মনস্থ করলো। প্রবল স্রোতের বেগে তাড়িত-বিল্বমঙ্গল একটি কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে চিন্তামণির রুদ্ধদ্বার গৃহে উপস্থিত হলো। পিচ্ছিল উচ্চ প্রাচীর—কিন্তু সে বাধাও অতিক্রম করলো প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন একটি রজ্জুর সাহায্যে। অবশেষে চিন্তামণির কাছে যখন সে পৌঁছেছে—তখন বিস্মিত চিন্তামণি জানতে চেয়েছে কেমন করে সে প্রাচীর অতিক্রম করেছে। বিল্বমঙ্গলের বর্ণনায় কৌতূহলী চিন্তামণি রজ্জু দর্শনের অভিপ্রায়ে প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখেছে একটি প্রকাণ্ড বিষধর সাপ—রজ্জু মনে করে এটির অবলম্বনেই বিল্বমঙ্গল অতিক্রম করেছে উচ্চ প্রাচীর। তার গায়ে তীব্র দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে এসে দেখতে পেল একটি গলিত মৃতদেহ—যাকে অবলম্বন করে সে নদীপার হয়ে এসেছে। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে :

এ হেন অকার্য কর্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি না হইত চতুর্বর্গ-সেবাসার॥

চিন্তামণির ভৎর্সনা বাক্যে বিল্বমঙ্গলের জীবনে এসেছে পরিবর্তন। সে কৃষ্ণ প্রেমের সন্ধানে গৃহত্যাগ করে সোমগিরির কাছে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেছে। কিছু-

কাল পরে পরিব্রাজক বিল্বমঙ্গল এক গ্রামের বৃক্ষতলে অবস্থানকালে স্নানরতা এক বণিকপত্নীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে—তার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়েছে। স্নান শেষে রমণী নিজগৃহে ফেরার পথে বিল্বমঙ্গল তাকে অনুসরণ করে বণিকগৃহে উপস্থিত হয়ে বণিকের কাছে তার স্ত্রীকে দর্শনের অভিপ্রায় জানিয়েছে। বণিক আপন স্ত্রীকে বস্ত্র অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে বিল্বমঙ্গলের সম্মুখে উপস্থিত করলে সে তাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে আপনমনে নিজের চক্ষুকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে :

আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥
রক্ত মাংস ক্লেদ বিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক আচ্ছাদন মাত্র দরশ সুবহ॥

যে ইন্দ্রিয় এই বহিরঙ্গরূপের প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে—সে তার সাধন-পথের শত্রু। বণিক পত্নীর কাছে বিল্বমঙ্গলের অনুরোধ! 'তীক্ষ্ণ দুটি সূচ আনি শীঘ্র দেহ মোরে।' সেই সূচ দুটি তার চোখে বিদ্ধ করে দেবার জন্যে সে বণিকপত্নীকে বার বার অনুরোধ করায় অবশেষে বণিকপত্নী তার অনুরোধ রক্ষা করেছে। এবার নির্বিঘ্ন সাধনা। সেই সাধনার শেষে সে পেয়েছে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন—পেয়েছে পুন-র্দৃষ্টি। বিল্বমঙ্গলের গৃহত্যাগের পর চিন্তামণির মধ্যেও জেগেছে অনুশোচনা। সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে সে এসে বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছে—বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে। সে-ও লাভ করেছে কৃষ্ণ কৃপা।

এই কাহিনীর নাট্যরূপায়ণে গিরিশের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি 'সাধক' ও 'পাগলিনী'র। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন "এই নাটকের পাগলিনী চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি এবং বঙ্গসাহিত্যে ইহা একটি অপূর্ব দান।" সাধক ও পাগলিনী চরিত্র সংযোজনায় নাটকটি যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে, একথা বলেছেন এ-কালের নাট্য-সমালোচক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ : "বিল্বমঙ্গল ভক্তিসাধক চরিত্র হইলেও তাঁহার মানসিক ভাবাবেগের দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখান হইয়াছে, তাহার ফলে এই ভক্তিতত্ত্বমূলক নাটকের মধ্যে নাটকীয় রসের অভাব ঘটে নাই। বস্তুত নাটকটির মধ্যে একদিকে অধ্যাত্মরাজ্যের আকুতি, অন্যদিকে বাস্তব সমাজের আলেখ্য। বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মুগ্ধ বেশ্যা, শ্মশানচারিণী পাগলিনী, ভিক্ষুক চোর, কপট সাধু প্রভৃতি চরিত্র নাটকের মধ্যে যথেষ্ট বিচিত্র রস আনিয়াছে সন্দেহ নাই।" [বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ (১৯৭০)—২০৩]

অন্যান্য চরিত্রগুলি মূল কাহিনীতে পাওয়া গেলেও 'সাধক' ও 'পাগলিনী' সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি কার্যের পশ্চাতে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের দান। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই

বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য 'সাধক' চরিত্রের পরিকল্পনা। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন "ভক্ত চরিত্রের সহিত একটি ভণ্ড চরিত্রের অঙ্কনে তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধক চরিত্রের ইহাই মূল। পরমহংসদেব একদিন ভণ্ড সাধুদের হাবভাব গিরিশচন্দ্রকে হুবহু নকল করিয়া দেখাইয়াছিলেন।" (১)

এই ঘটনার কথা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বিবৃত করেছিলেন বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন গিরিশকে বলেছিলেন "এসব লোকের চিহ্ন কি জান? লম্বা জামা পরে, জামার আস্তানাটা কনুই পর্যন্ত থাকে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—সেগুলি আবার সোনার বা রুপার তারে গাঁথা। মাঝে মাঝে একটি প্রবাল বা অন্য দামী জিনিষ দেয়। কথাবার্তায় তারা সবজান্তা আর এইরূপ করিয়া তারা হাত নাড়ে।" হস্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি পর্যন্ত দেখিয়ে দিলেন : "ডান হাতের তর্জনী কিছু উঁচু করিয়া এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙুল নীচু করিয়া হাতের পাতাটা দুলাইয়া" সাধক চরিত্র-অভিনয়ের পুরো নির্দেশ নাই তিনি দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র এ সুযোগ ছাড়েন নি, "তিনি হুবহু সেইটা লিখিয়া লইলেন এবং অভিনয়কালে তদ্রূপই দেখাইতেন।" মহেন্দ্রনাথ বলেছেন "বিল্বমঙ্গলে সাধকের পালা যে এত উত্তম হইয়াছিল, কারণ তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদর্শিত পথ ছিল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।" (২)

বিল্বমঙ্গল চরিত্রে নিজের প্রতিচ্ছায়া থাকা সত্ত্বেও অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন সাধকের ভূমিকা। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-নির্দেশক মাত্র একজনেরই নির্দেশনায় অভিনয় করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন সেই একজনেরই "সর্ববিষয়ে উৎকর্ষ ছিল।" নট-নাট্যকার-পরিচালকের কাছে 'সর্ববিষয়ে'র মধ্যে 'নাট্যবিষয়' যে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত, একথা বলাই বাহুল্য।

গিরিশচন্দ্র আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের একটি "ভঙ্গী"তে কি পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁর কথা থেকেই জানতে পারি :

"একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে মাড়োয়ারিরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছিল। বলে টাকা দিতেছি, আপনি ভাণ্ডারা খুলুন, এ টাকা ত আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? একথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, আমি বল্লুম, না। আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় এতে আপত্তি কি?' তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্তকাল স্রোতে কেহ কখনও দেখে নাই, ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে), বলিলেন, ও মনে পড়বেক, আবার আসতে হবেক।" (৩)

যে ভঙ্গী গিরিশকে এতখানি অভিভূত করেছিল এবং যা দীর্ঘকাল তাঁর চিত্তে মুদ্রিত হয়েছিল, তার অনুকৃতি কোনো না কোনো নাটকে ঘটেছে, এমন অনুমান অসমীচীন নয়।

পাগলিনীর চরিত্র দুটি দিক থেকে বিচার্য।

চরিত্রটির মূল কাঠামো শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণিত একটি সত্যঘটনার ভিত্তিতে গঠিত। একদিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে গিরিশ প্রমুখ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব ব্যাখ্যা করছিলেন। প্রসঙ্গত এসেছে মধুরভাবের কথা এবং সেই সঙ্গে পাগলিনীর কথা। শ্রী-ম লিখেছেন :

"বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইয়া যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ম সঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেইজন্য সর্বদা বড় ব্যস্ত থাকতে হয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি) পাগলীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন কাঁদছিস ? তা বলে, মাথাব্যথা করছে (সকলের হাস্য)।

"আর একদিন গিছলো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, 'দয়া করলেন না ?' আমি উদার বুদ্ধিতে খাচ্চি। তারপর বলছে 'মনে ঠেললেন কেন ?' জিজ্ঞাসা করলুম 'তোর কি ভাব ?' তা বললে 'মধুর ভাব।' আমি বললুম, 'আরে আমার যে মাতৃ-যোনি ! আমার যে সব মেয়েরা মা হয় !' তখন বললে 'তা আমি জানি না।' তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম 'ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে শোন দেখি।' ওর এখনও সেই ভাব আছে।

"গিরিশ—সে পাগলী ধন্য ! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই থাক আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে ! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।" (৪)

সেই উন্মাদিনীই বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী।

কথামৃতে গিরিশের উপস্থিতিতে এই কাহিনী বর্ণনার দিন—১৬ এপ্রিল ১৮৮৬—অর্থাৎ 'বিল্বমঙ্গলে'র প্রথম অভিনয় রজনীর প্রায় আড়াই মাস পূর্বে।

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ও গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন "দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট বহু পূর্বে এক ব্রাহ্মণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে এক পাগলী যাতায়াত করিত। শুনিয়াছি, ইঁহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।"

পাগলিনী চরিত্রের বহিরঙ্গ পরিকল্পনায় রামকৃষ্ণ-কথিত কাহিনী—আর অন্তরঙ্গ পরি-

কল্পনায় আছে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র। এর সাক্ষ্য হিসাবে সংলাপ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি গানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

১৭ এপ্রিল ১৮৮৬, কথামৃতের দিনপঞ্জীতে দেখা যায়—কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ শায়িত। তিনি দোতলায় নিজের ঘরে শুয়ে ভক্তদের গান শুনছেন —নিচের তলায় ভক্তেরা কীর্তন করছেন। কীর্তন শেষ হতে সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হয়ে গান ধরেছেন—যেটি 'বিল্বমঙ্গলে'রই গান :

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগল **ছেলে**, মায়ের নাম শ্যামা।"

ঠিক কবে, কিভাবে গিরিশ গানটি রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনুমান করতে পারি, শ্যামা-ভক্ত সুরেন্দ্রের অনুরোধে অথবা ভাবতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ দর্শনে গিরিশ কোনো সময় গানটি রচনা করেন এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অথবা অন্য কেউ তাতে সুরারোপ করেন। গানটি ভক্তেরা (অন্তত পক্ষে সুরেন্দ্র) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত বলেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং গাইতেন। তারপর যখন 'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হলো (৩।৭।৮৬) তখন সেই গান শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবকল্পনা-উদ্বুদ্ধ পাগলিনীর কণ্ঠে আরোপ করলেন গিরিশচন্দ্র সামান্য পরিবর্তনের পর :

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগল **মেয়ে**, মায়ের নাম শ্যামা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিল্বমঙ্গল' নাটক দেখেন নি কিন্তু সেই নাটকের অন্তত একটি গান তিনি শুনেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র পাগলিনী চরিত্রকে কেবল মধুরভাবের নিদর্শন রূপেই রচনা করে ক্ষান্ত হন নি, তিনি সেই সঙ্গে সাধনা ও ধর্ম সমন্বয়ভাবের দ্যোতক রূপেও চরিত্রটির পরিকল্পনা করেছেন এবং সে-কল্পনারও উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির অঙ্গন থেকেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সব ধর্মসাধনাকেই ঈশ্বর লাভের পথ বলে মনে করতেন কিন্তু সব পথের শেষে সেই এককেই দেখেছেন। পাগলিনীর অমার্জিত সংলাপে সেই চিন্তারই প্রতিধ্বনি :

"আমি মা পাঁচ-ভাতারী ;—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা, আমি এক ভাতারী এয়ো।

আমার ভাতার সেই, মা, সেই
সে বিনা আর নেই, মা, নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের অন্বেষণের আর্তি পাগলিনীর সংলাপে মূর্ত :

হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে—
সে ত নাই লো এখানে,
পর্বত গুহায়, নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কতদিন।
কভু ভস্ম মাখি গায়
এ প্রাণেব জ্বালা না জুড়ায়
শূন্যে শূন্যে ফিরি
বুকে বজ্র ধরি
সে কোথায় দেখা তো হল না।

এই পাগলিনীই বিল্বমঙ্গলের কাছে চিন্তামণির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছে :

চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয়করা ভক্ত মনোহরা
শবোপবে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী…
কভু রজতভূধর…
কভু বাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা…
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি,…
কভু একাকার
নাহি আর কালের গমন,
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি-নাহি ফুরাইল বাক;—

বিল্বমঙ্গল থেকে কালাপাহাড়—এক গিরিশচন্দ্র থেকে অন্য গিরিশচন্দ্র, সঙ্গে সঙ্গে এক চিন্তামণি থেকে অন্য চিন্তামণি। কালাপাহাড়ের চিন্তামণি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ—তার সংলাপ কথামৃতের নাট্যীকৃত রূপ। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।

১৮৮৬সালের ১৫ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক 'রূপ সনাতন' (২১. ৫. ৮৭)।

'রূপসনাতন' নাটক প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন গিরিশ-জীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪র্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রীচৈতন্য কাশীধামে চন্দ্রশেখর-

গৃহে কীর্তনান্তে ভক্তগণের পদধূলি গ্রহণ করছেন—এ দৃশ্য যখন স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় তখন "কোনো-কোনো গোস্বামী বিরক্ত হন এবং মহাপ্রভুর এইরূপ ভক্ত পদধূলি শ্রীঅঙ্গে গ্রহণ অতি গর্হিত বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ, এমন কি গিরিশ-চন্দ্রকে কটূক্তিও করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের বিরক্তিতে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, 'আমি যে স্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্ত পদধূলি গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।' তিনি বলিতেন 'আমি স্বয়ং বিশেষরূপে উপলব্ধি না করিয়া কোনো কথা লিখি না। একদিন কোনো এক ভক্তের বাটীতে ভগবৎ প্রসঙ্গ ও সঙ্কীর্তনাদির পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই স্থানের ধূলি লইয়া অঙ্গে প্রদান করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিতে যাইলে ঠাকুর বলিলেন—কি জানো, বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নাম সঙ্কীর্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন। ভক্ত পাদস্পর্শে এই স্থানের ধূলি পর্যন্ত পরম পবিত্র হইয়াছে।"(৫)

রামচন্দ্র দত্তের স্মৃতিচারণে 'রূপ সনাতনের' একটি গানের উৎস সম্পর্কে জানতে পারা যায় : "ঠাকুরের কাছে আমরা রবিবারে রবিবারে যেতাম, তা শনিবার রাত্রি ৩টা-৩৷৷টার সময় উঠে হেঁটে পাড়ি দিতুম। কাশীপুর বরানগর গেলে তবে ফর্সা হতো। আবার তাঁর কাছ থেকে রাত্রি ১০টা ১০৷৷টার সময় বেরুতুম। বাড়ী আসিতে ১২৷৷টা ১টা হতো। এ হাঁটাহাঁটি ভ্রূক্ষেপই হতো না। এতটা তাঁর টান আর তাঁর দর্শনে এত আনন্দ! গিরিশদাদা রূপসনাতনে এই ভাবের একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন।"(৬)

'রূপসনাতন' নাটকে যে চিত্রের কথা রামচন্দ্র উল্লেখ করেছেন তা হলো :

বল্লভ : যখন গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হবে, তখন গৃহে থাকতে পারবেন না ; বলের প্রয়োজন নাই—স্রোতের তৃণ হউন ; গৌরাঙ্গ যখন আকর্ষণ করবেন, তখন সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হবে ; ঘরে যাব কি না যাব, এ কথা থাকবে না ;—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—উদ্বিগ্ন হবেন না।

(বল্লভের গীত)

যখন আসবে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে।
সে অকূল পাথার নাইক সাঁতার
কূলকিনারা কে পাবে ?
আগে ধীর তরঙ্গ বয়
তাতে হেলে দুলে খেলে আশা ভয়,
হয় কি না হয় কত হয় উদয়—
ক্রমে জোর বয়ে যায় দুকূল ভাসায়
টানের টানে কে রবে ?

বুঝতে নারি প্রেম তরঙ্গ চলে কি ভাবে।

(রূপসনাতন, ১ম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

রূপসনাতনের পরই গিরিশের নতুন নাটক 'পূর্ণচন্দ্র' (১৭. ৩. ৮৮)। গিরিশচন্দ্র নাটকটিকে 'ভগবদ্‌বিশ্বাসমূলক' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই নাটকের গোরক্ষনাথ চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগীশ্বর মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। মাত্র দু'মাস পরেই 'নসীরাম' নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণতর চিত্র ফুটে উঠলেও তাঁর সাধক ও যোগীর রূপ সেখানে অনুপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রকৃতিস্থ এক দার্শনিকের চেহারাই 'নসীরামে' প্রাধান্য পেয়েছে ; কিন্তু 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের গোরক্ষনাথে সিদ্ধ সাধকের মহান গাম্ভীর্য :

পরীক্ষায় হয় পার
সেই শ্রেষ্ঠ যোগী !
যার অঙ্গে নাহি বিঁধে অঙ্গনা নয়ন
কাঞ্চনে না টলে যার মন ;
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে
সেই নরোত্তম।

'নরোত্তমে'র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই গিরিশকে গোরক্ষনাথ চরিত্র পরিস্ফুটনে সহায়তা করেছে।

"মানবের শিক্ষা হেতু ধরি নরদেহ" স্বয়ংমহাদেবই গোরক্ষনাথরূপে আবির্ভূত। শিষ্যের কাছে তাঁর শেষ বাণী :

সংশয়রহিত চিত্ত যেই জন হয়
কামিনী কাঞ্চনে তার নাহি কোনো ভয় ;
যোগযাগ তপধ্যান বাহ্য আচরণ
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ যোগীর লক্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই প্রতিধ্বনি।

গুরুর সংস্পর্শে থাকাকালে এবং তাঁর তিরোভাবের পর গিরিশচন্দ্রের অন্তর্জীবনের পরিবর্তনের রূপ 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে প্রত্যক্ষ ভাবেই ধরা পড়েছে। এই সূত্রে মদ্যপান সম্পর্কে সেবাদাসের উক্তি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

সারী : এ খাওয়ালে কি হবে ?

সেবাদাস : কর পান, দ্রব্যগুণ হবে অবগত ;
অপার মহিমা সুরা পাপ সহচরী ;
উন্মাদ করিতে ধরা ধাতার সৃজন।...
সুরার সেবায় লোকধর্ম তখনি পলায়

হয় ভূপতি ভিখারী
অতি শান্ত নর-হত্যাকারী
বীর ধীর ত্যজি তরবারি
দাসত্ব শৃঙ্খল পরে
বিদ্যাবান হয় জ্ঞান হীন
শিশুসম আকারে প্রবীণ
জিতেন্দ্রিয়, নারীর ইঙ্গিতে ফেরে,
যোগী যোগ ত্যেজে কুক্কুরীতে ভজে
ধরে নর পশুর প্রকৃতি।

মদ্যপান সম্পর্কিত গিরিশের মনোভাব স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে এক বৎসর পরে রচিত 'প্রফুল্ল' নাটকে।

ব্যবসায়িক দিক থেকে 'পূর্ণচন্দ্র' যেমন সার্থক হয়ে উঠেছিল, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্ঘাটনেও এ নাটক যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। এক সময় পূর্ণচন্দ্র নাটকের পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হতো রামকৃষ্ণ মঠের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদের কাছে। (৭)

'নসীরাম' গিরিশচন্দ্রের ভাষায় "ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক"। পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে যেমন 'ভগবদ্বিশ্বাস' প্রাধান্য পেয়েছে, নসীরামে তেমনি 'ভগবদ্বাক্য'। নসীরাম কথামৃতেরই নাট্যীকৃত রূপ।

নসীরাম চরিত্রে রামকৃষ্ণের ছায়াপাত বহু আলোচিত বিষয়। হরিনাম প্রচারই নসীরামের জীবনোদ্দেশ্য। তার কাছে বিরজার প্রশ্ন : "প্রভু, আমার মতন পাতকীকে হরি দয়া করবেন ?"

উত্তরে নসীরাম বলে : দয়া কি রে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হল পতিত-পাবন ; যে আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে ; হরিগুণ গেয়ে বেড়া—হরি সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।"

এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই। 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটকেও এই পতিতোদ্ধারের আশ্বাসবাণী, যা তিনি পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নসীরাম চরিত্র নজিরহীন। গিরিশচন্দ্র রচিত 'নলদময়ন্তী' বা 'ধ্রুবচরিত্রে'র বিদূষক নাটক প্রয়োজনের দিক থেকে মূল্যহীন না হলেও এগুলির উপস্থাপনা দর্শককে আনন্দদানের জন্য মাত্র। সেদিক থেকে নসীরাম একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। পূর্ববর্তী বিদূষক চরিত্রগুলির সঙ্গে কালিদাসের বয়স্য চরিত্রের সাদৃশ্য যতখানি নসীরামের সঙ্গে তার সামান্য অংশও নেই। 'নসীরাম' নায়ক—নাটকের নামকরণও নাট্যকারের পরিকল্পনার সাক্ষ্য দেয়। বিদূষক হাসায়—নসীরাম হাসায়,

ভাবায়, কাঁদায়ও।

রামকৃষ্ণ চরিত্রের ভাবভঙ্গির বহুল ব্যবহার গিরিশ সর্বপ্রথম করলেন নসীরাম চরিত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের আচার-আচরণ সংলাপের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের নাট্যরস ছিল নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, এবং তিনি তা পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। তারপর কতভাবে কত নাটকে আজ পর্যন্ত এই চরিত্রকে নাট্যকারেরা ব্যবহার করে চলেছেন—কিন্তু তবু তার আকর্ষণ ম্লান হয় নি। এমনও শুনেছি, যাত্রার কোনো পালা যখন দর্শকের কাছে তেমন হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠছে না—ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন সুযোগমত রামকৃষ্ণ চরিত্রের সংযোজনার ফলে সেই পালা-ই বিপুল দর্শক সমাগমের কারণ হয়েছে ; কিন্তু সে-কথা পরে।

নসীরামের পর 'কালাপাহাড়ে' চিন্তামণি চরিত্রের পরিকল্পনা একই উৎসজাত। নসীরাম ও চিন্তামণি প্রকৃতপক্ষে একটিই চরিত্র—চিন্তামণি যে নসীরামের পরিণত রূপ তা চিন্তামণির কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালাপাহাড়ের কাছে চিন্তামণি আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেছে :

"যখন এই শরীর হামাগুড়ি দেয়, তখন শুনতেম কালো ; তারপর যখন শরীরের বয়স পাঁচ সাত বছর হলো তখন শুনতেম কালীকৃষ্ণ ; দিনকতক নসীরাম বলতো। এখন শুনি চিন্তামণি।"

স্মরণ রাখা দরকার গিরিশ নাটকে চিন্তামণি নামটি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র দু'বার।—প্রথম বিল্বমঙ্গলে চিন্তামণি নারী। নামটি তিনি 'ভক্তমাল' থেকেই পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় চিন্তামণির আভাস 'বিল্বমঙ্গলে' পাগলিনীর মুখেই প্রকাশ পেয়েছে—কালাপাহাড়ে সেই দ্বিতীয় চিন্তামণির আবির্ভাব। এর মধ্যেই রয়েছে গিরিশের ব্যক্তিগত জীবনে এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় উত্তরণের ইতিহাস। কালাপাহাড়ে চিন্তামণি যে ভাষায় কথা বলে তা কথামৃতের অবিকৃতরূপ :

"প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছু থাকে না, আর পুঁটুলি-সুটুলি হয়ে প্যাঁজটি হয়ে আছে—তেমনি আমি। খোসা ছাড়িয়ে যাও 'আমি' খুঁজে পাবে না।"

* * *

"কালাপাহাড়—মহাশয়, গুরু—কেমন তিনি ?
চিন্তামণি—ঘটক হে ঘটক, জুটিয়ে দেয়।"

* * *

"চাঁদ মামা সবারই মামা—ঈশ্বর সবারই ঈশ্বর।"

* * *

"আ মোলো ? লোকশিক্ষা দিতে এসেছ, অহঙ্কার ছেড়েছ ? দেখেছ ভাই অহঙ্কারের

ফের ? ও কি ছাড়ে ! নাহম্ নাহম—তুঁহু তুঁহু তুঁহু তুঁহু।"

* * *

"চিন্তামণি—লেটো তুই বড় হীনবুদ্ধি হয়েছিস !
লেটো—হয়েছি বইকি, এখন আরও কি হই, তা দেখ।
চিন্তা—ছিঃ, তুই ঠাকুর আর আল্লায় ভেদাভেদ করিস ?

এক বিভু, বহুনামে ডাকে বহুজনে
যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি
বোঝায় সলিলে, সেই মতো আল্লাগড,
নানাজনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান লক্ষণ, ভেদবুদ্ধি কর দূর ;
বহু নাম—প্রতি নাম সর্বশক্তিমান
যার যেই নামে প্রীতি-ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল হৃদয় যেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেই জন সেই নাম উচ্চারণে।..."

* * *

"চিন্তামণি—যবে জ্ঞান জাতি অভিমান নাহি.

রহে, খসে পড়ে পাকা ফল। ঘৃণা লজ্জা
ভয়—জ্ঞানবলে পরাজয় করিয়াছে
যেই মহাশয়, অহঙ্কারশূন্য জন,
তার নাহি জাতির বিচার।

॥ ২ ॥

বাংলা নাটকে এখান থেকেই কথামৃতের জয়যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপে যে বিচিত্র নাটকীয়তা রয়েছে গিরিশচন্দ্রই তা' প্রথম আবিষ্কার করেছেন এবং তাকে উপযুক্ত ভাবে নাটকে ব্যবহারও করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্-প্রকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন :
"ঠাকুর এমন এমন কথা ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহারা জীবন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো, খানিকটা কাটিয়া বাদ দিবার অথবা বদলাইবার উপায় নাই, সমালোচকের ভাষায় **'If you cut them, they bleed'** (যদি একটি কথাও কাটিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে)। ভাষার মধ্যে শুধু ভাবই একমাত্র সম্পদ নহে,

ধ্বনির ব্যঞ্জনাও অপূর্ব সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতকলায় পারদর্শী ছিলেন, গানের কান ছিল বলিয়া অনেক সময় তাঁহার ভাষা হইতে নূপুরের মতো মধুর ধ্বনি উত্থিত হইত।...

"শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব ছিল তাহার স্বাভাবিক পুরাতন রূপ। গ্রাম্য চলিত কথার ভিতর দিয়া গ্রাম্যজীবন, গ্রাম্য ছবি, গ্রাম্য সমাজ ফুটিয়া উঠিত, সহরের পরিমার্জিত লোকের নিকট তাহারা পুরাতন রোমান্সের সৃষ্টি করিত।...

"তৃতীয় প্রধান গুণ হইতেছে চিরন্তন আনন্দ প্রদান করিবার শক্তি।...যে চিন্তাধারা তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে ভাষায় তাহার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সে ভাব ও ভাষা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে। একদিন যেমন মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেইরূপ নিরক্ষর দক্ষিণেশ্বরবাসী রসিক ম্যাথরও [মেথরও] তাহার কর্ম ভুলিয়া নির্বাক বিস্ময়ে ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিল। তরল হাসিতে হয়তো কখনও ঘর ভাসিয়া গিয়াছে কখনও গভীর ধর্মানুভূতিগুলি শুনিবার জন্য মানুষের মতোই ঘরের বাতাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...

"শ্রীরামকৃষ্ণের রচনারীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে বস্তুবাচক শব্দের ব্যবহার। ভাষার মধ্যে যতই বস্তুবাচক কথা ও চিত্র ব্যবহার করা যায় ততই সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে।...নরেন্দ্রনাথ তখন অর্থকষ্ট পাইতেছেন, সংসারে সর্বদাই অনটন। ঠাকুর সেই কথা বলিবার সময় 'দারিদ্র্য' কথাটি ব্যবহার করিলেন না। 'নরেন্দ্র দরিদ্র হইয়াছে' তাহাও বলিলেন না; শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন 'তার তো কলাপোড়া খাবার সুন নেই।'

"শ্রীরামকৃষ্ণের কবিসুলভ কল্পনাশক্তি ছিল যাহার সহায়তায় তিনি কথার যোগাযোগ স্থাপন করিয়া নূতন সজীব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। এই কথাসৃজন শক্তি প্রকৃতপক্ষে কবির সাধনার জিনিষ—এই জন্যই অনেক সময় কবিতাকে **Speaking painting** কথাকহা চিত্র—বলা হইয়া থাকে।

"শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনাকৌশল তাঁহার সাহিত্যরস সৃষ্টির আর একটি প্রধান উপাদান। ছোট ছোট কয়েকটি কথায় একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সবাকচিত্রের মতো ঘটনাবলী চক্ষের সম্মুখ দিয়া একের পর এক চলিয়াছে, পাঠক আগ্রহ বিস্ময়ে তাহা দেখিতেছে, হয়ত জীবনের সঙ্গেও মিলাইতেছে।"(৮)

ঘটনা সংঘাতকে যদি নাটকের প্রাণ বলা হয়, তবে সংলাপকে বলতে হয় নাটকের দেহ। প্রাণহীন কায়া যেমন জড়বস্তু মাত্র তেমনি কায়াহীন প্রাণও অকল্পনীয়। নাটকের সংলাপ তার প্রাণস্পন্দনের আধার। কিন্তু সাধারণ কথোপকথন এবং নাটকীয়

সংলাপের মধ্যে পার্থক্য আছে। সংলাপের নাটকীয় সাফল্য নির্ভর করে দর্শকের বা শ্রোতার মনোযোগের ওপর। সেই মনোযোগ আকর্ষণের বিভিন্ন কৌশলই সংলাপ নাটকীয় করে তোলে। অভিনেতার কণ্ঠের উত্থান-পতন যেমন সংলাপকে হৃদয়গ্রাহী করে তেমনি সংলাপের নিজস্ব চিত্রধর্মিতা, সর্বজনীনতা, মাধুর্য—সবকিছু মিলে তাকে অভিনয়ের উপযোগী করে তোলে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সাহিত্য-সৃষ্টির (তাঁর সব সাহিত্যই মৌখিক) যে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন তাতে নাটকীয় রসের স্বাদই আভাসিত। এই সংলাপ স্বতই যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে আকৃষ্ট করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসেছেন, তিনি সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে বক্তার বিভিন্ন ভাবভঙ্গীও দেখার সুযোগ পেয়েছেন ; কিন্তু পরবর্তী নাট্যকারেরা যাঁরা সচেতন ভাবে অথবা অজ্ঞাতসারে সেই সংলাপ নাটকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে এর উৎস 'কথামৃত'।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাচনভঙ্গীর নাটকীয়তা ফুটেছে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ উত্তরদানের ক্ষমতায়। সেগুলি সহজ, সাবলীল—কোনো চিন্তা বা অতি-প্রয়াসের ছাপ নেই। 'কথামৃতে' এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের সঙ্গে নাটকীয়তার কি প্রকার যোগ তা দেখা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্যটিই গ্রহণ করা যাক। বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত নন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ঔদাসীন্যও সর্বজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধের অতিরিক্ত কিছু দাবী করে না। তাই এখানে উভয়ের স্বচ্ছন্দ চেহারাই ফুটে ওঠে :

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,"আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খালবিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।"

বিদ্যাসাগরের সহাস্য উত্তর "তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান।"

সপ্রতিভ শ্রীরামকৃষ্ণ "না গো ! নোনাজল কেন ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর ! তুমি ক্ষীর সমুদ্র।"

নিরুত্তর বিদ্যাসাগরের মুখে একটি কথাই ফুটলো 'তা' বলতে পারেন বটে।

আবার :

রামকৃষ্ণ—"…তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো, এও ভালো। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই !"

বিদ্যাসাগর—"মহাশয়, কেমন করে ?"

একটি স্নিগ্ধ হিউমার : "আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া।"

এবাব বিদ্যাসাগর ছাডলেন না—বললেন "কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।"

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণেব অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব : "তুমি তা নয় গো, শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পডা। না এদিক না উদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজব ভাগাডে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মডা খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসাবে। দযা ভক্তি বৈবাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।"

যিনি একাকী বাংলাদেশেব তাবৎ পণ্ডিত সমাজেব সঙ্গে পাল্লা কষে পরাস্ত পর্যুদস্ত করেছেন সেই দিগ্বিজযী পণ্ডিত এবাব নিরুত্তব।

এই উত্তর-প্রত্যুত্তবের মধ্যে যে নাটকীয বস রযেছে তা যে কোনো নাট্যকাবকেই আকৃষ্ট করবে, করেছেও।

এই দৃশ্যেব একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতিও দেখা দিযেছে—তার মধ্যেও আছে নাটকীয়তা। শ্রীবামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগবকে প্রশ্ন কবলেন "আচ্ছা তোমাব কি ভাব?"

বিদ্যাসাগর মৃদু হেসে উত্তর দিযেছেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা এক-দিন বলব।"

সৌজন্য রক্ষা কবেও এতক্ষণ বিদ্যাসাগর যে দূরত্ব বজায বেখেছিলেন এই মুহূর্তে সেটুকু ঘুচে গেল। একটি গভীব নৈকট্যেব ইঙ্গিত ক্রমপরিণতি স্বচ্ছ কবে তুললো।

প্রথম সাক্ষাতে বিদ্যাসাগব উঠে দাঁডিযেছেন—স্বাভাবিক সৌজন্যবোধেব খাতিবে কিন্তু বিদায মুহূর্তে?

শ্রীম বর্ণনা কবেছেন "ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে সিঁডি দিযা নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিযা আছেন। বিদ্যাসাগব স্বজন সঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি পথ দেখাইযা আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমিব মধ্য দিযা সকলে বাতিব ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকেব দিকে আসিতেছেন।"

অবশেষে "বিদ্যাসাগব ও অন্যান্য সকলে ঠাকুবকে প্রণাম কবিলেন।

গাডী উত্তবাভিমুখে হাঁকাইযা দিল। ...এখনও সকলে গাডিব দিকে তাকাইয়া আছেন।" (৯)

এই একটি-দৃশ্যেব মধ্যে একই ব্যক্তিত্বেব প্রকাশ কত বিচিত্রভাবেই না দেখা দিযেছে। নির্মল পাণ্ডিত্য, গভীর ব্যঞ্জনাময় বাক-বিন্যাস (ব্রহ্ম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি "সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে···কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই" শুনে সাহিত্যা-চার্য বিদ্যাসাগব সহর্ষে বলে উঠেছিলেন বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম), সুমধুর সঙ্গীত (যা' সংলাপের অংশ)—সব কিছুর সঙ্গে গভীর তন্ময়-

তায় সমাধি! এক মুহূর্তের জন্যও দৃশ্যটি একঘেয়ে হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সমস্ত কিছুকেই ধারণ করে আছে নাটকীয় বাক-সংঘাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি নট্ট-কোম্পানীর সত্বাধিকারী শ্রীমাখন লাল নট্টের একটি অভিজ্ঞতার কথা। বিদ্যাসাগর পালা যখন নট্ট কোম্পানী অভিনয় শুরু করলেন তখন যথেষ্ট জনসমাদর পায় নি। এবং এর জন্যে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় প্রখ্যাত নাট্যকার মহেন্দ্রগুপ্তের পরামর্শ ক্রমে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ—বিদ্যাসাগরের উপরি উক্ত (এবং একমাত্র) দৃশ্যটি সংযুক্ত করেন। এই একটি দৃশ্যই নাটকটির সৌভাগ্যের সূচনা করল। সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন এই বিশেষ দৃশ্যটির জন্যে। 'বিদ্যাসাগর' পালা নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান ঘটলো। দীর্ঘকাল প্রবল আগ্রহে দর্শক বিদ্যাসাগর পালা গ্রহণ করেছে। (১০)

শ্রীম-বর্ণিত আরও একটি ঘটনার নাটকীয় সংলাপের কথা বলি। এখানে সমকালীন বাংলাদেশের আর এক দিকপাল বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের বিবরণ। সহজে পরাজয় মেনে নেবার মতো মানুষ বঙ্কিম নন। তীব্র আত্মাভিমান তাঁকে আগাগোড়া ঘিরে রেখেছে। লঘু পরিহাসের মধ্যে দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণের কথার জবাব দিয়েছেন—হয়ত তার মধ্যে সাহিত্য সম্রাটের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সেই কথোপকথনের পরিণতি কি?

"রামকৃষ্ণ—তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নেই, ডুবলে অমর হয়।

"এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন—বিদায় গ্রহণ করিবেন।

"বঙ্কিম—মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধূলা—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

"বঙ্কিম—সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।"

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণের পালা। এতক্ষণ চোখা কথা বলে বঙ্কিম পরিস্থিতিকে নিজের মুঠোয় রাখতে চেয়েছেন, যদিও মনে সন্দেহ জেগেছে, এই অশিক্ষিত মানুষটি বোধহয় তাঁকে আহাম্মক ঠাউরেছেন। বিদায় নেবার আগে তাই যথেষ্ট নম্রভাবে কথা বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পিঠোপিঠি সহাস্য জবাব দিলেন, "কি গো, কি রকম ভক্ত সব সেখানে? যারা 'গোপাল গোপাল—কেশব কেশব' বলেছিল, তাদের মত কি?"(সকলের হাস্য)" এবং সেই ভণ্ড-বৈষ্ণব স্বর্ণকার ও তার কর্মচারীদের গল্পটি শুনিয়ে উপস্থিত সকলের হাসির ফোয়ারা খুলে দিলেন।

কিন্তু আরও একটু নাটক আছে। সে-নাটক বর্ণনা করেছেন শ্রী-ম :

"বঙ্কিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হয়ে কি ভাবিতেছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। গায়ে শুধু জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাহার হস্তে দিলেন।"(১১)

দৃশ্যান্তরের যবনিকার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপটি দর্শক-শ্রোতার অন্তরে মুদ্রিত হয়ে যায়।

এখন চলুক গিরিশ-নাটক প্রসঙ্গ।

নসীরাম বা চিন্তামণির (কালাপাহাড়) সংলাপের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা Image এ যুগের পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে কারণ তাঁর নিজস্ব বাক্-ভঙ্গি, গল্প বলার বিশিষ্ট ধরণ কথামৃতের কল্যাণে আমাদের কাছেও প্রত্যক্ষ। এই বাক্-রীতি বাংলা নাটকে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছে। 'নসীরাম' ও 'কালাপাহাড়ে'র মধ্যবর্তী নাটকগুলির সংলাপে ক্বচিৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা গৃহীত হলেও এইসব নাটকের কোনো কোনোটিতে ভাবগত প্রভাবই প্রধান। এই প্রসঙ্গে 'জনা' এবং 'করমেতি বাই'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নসীরাম থেকে গিরিশ-নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবেশ স-বাক্।

গিরিশচন্দ্রের ছোট একটি গীতি-নাট্য 'নন্দ দুলাল'। গোষ্ঠে রাখালবালকগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লুকোচুরি খেলার দৃশ্য :

"বসুদাম—তবে ভাই লুকোচুরি খেলি আয়। তুই খুঁজে বার কর।

"সুবল—তাতে আমি রাজী আছি।

"বসু—কে বুড়ী হবে ভাই ?

"কৃষ্ণ—আমি হব ভাই।

বসু—না ভাই, তোকে খেলতে হবে, তুই কেন বুড়ী হবি ভাই ?

বলরাম—জানিস নি শ্রীদাম, ভবে এসে চোরের মত সকলেই বাঁধা আছে। যে কানাইকে ছোঁয়, তারই বন্ধন খোলে। অনন্তকালে সে আর চোর হয় না। নইলে চোরের মত সকলেই বাঁধা থাকবে।

বসু—কেন ভাই, আমাদিকে তো কেউ বাঁধে নাই !

বল—তুই জানিস নি ভাই। এ মহামায়ার সংসারে মহাপাশের বন্ধন—এ বন্ধন কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু নাক ফোঁড়া বলদের মত যেদিকে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, সেই দিকে ঘোরে। কানাইকে ছুঁলে, নাকের দড়ি কেটে যায়, আর কেউ তাকে ঘোরাতে পারে না, ভবের ঘোর তার একেবারে কাটে।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প :

"শ্রীরামকৃষ্ণ : সংসারে বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা।.....আবার ঘুড়ী লক্ষের

দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি। লক্ষের মধ্যে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়। বাকী সবাই মার ইচ্ছায় বদ্ধ আছে।

চোর চোর খেলা দেখ নাই। বুড়ীর ইচ্ছা যে খেলাটা চলুক। সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে তাহলে খেলা আর চলে না।……" (কথামৃত ২য় খণ্ড—পৃঃ ১৬৭)

এই চিত্রকল্পটি কথামৃতের বহু স্থানেই ব্যবহৃত। রাখাল বালকদের খেলায় গিরিশচন্দ্র কথামৃতের বাক্-ভঙ্গিতেই সেটিকে সরস করে পরিবেশন করেছেন।

আবার কোথাও ভাব ভাষা মিলে মিশে একাকার।

পারস্য-উপন্যাস থেকে কাহিনী আহরণ করে গিরিশের 'মনের মতন' নাটক। তাতেও ফকির চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাব লক্ষনীয় ভাবে বর্তমান। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের ক্রোড়পত্র। স্থান নহবৎ। ফকীর গাইছেন সন্ধ্যাসূচক গীত—সে গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা :

গিয়া দিন চলা ক্যা সাথ লিয়া
কুছ মালুম হ্যায় ?
লিয়া লিয়া পরমায়ু লিয়া
কাঁহা গিয়া কোই পাত্তা বাতায় !
আজ দিন গিয়া ভাই
দিনকা চিজ কুছ মূল লিও
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
দুনিয়াকি কামসে ঘুমতে রহো
আয়েগা দিন সো ভুল গিও ;
যো গিয়া সো গিয়া ঘুমে নেহি
আবি সামার না হুঁসিয়ার রহি
ছোড় না ঘোর, খাড়া হ্যায় চোর
চোর নিদিয়া লাগায়
চোর নিতি চোরায় !

ফকীরের আর একখানি গান :

লাগা রহো মেরি মন
পরমধন কি মিলে বিন যতন।…
ওহি আপনা সবভি বেগানা
সমজ লেনা কো আপন
এক হ্যায় উও পরমধন।

ফকীরের সাধনার উদ্দেশ্য আত্মমোক্ষ নয়। অন্তত গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের মধ্যে সে ফকীরী দেখেন নি—দেখলে, বলতে পারতেন না :

ব্যথিতা হেরে ধরণী এসেছ কি সকাতরে !

'মনের মতন'-এর ফকীরও আত্মমোক্ষের পথিক নয়। তার উক্তি :

"যদি কেবল ধ্যানধারণা ফকীরের কার্য হতো, তাহলে যদি অনশন বা অর্ধাশন হয়—তাতেই সুখ ছিল। কিন্তু হে গুরুদেব, তোমার কঠোর উপদেশে আমি বুঝেছি যে আত্মত্যাগে মানবকষ্ট দূর করাই ফকীরের কার্য, এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য।"

বাদশাগিরি ও ফকীরী—এই দুয়ের ব্যবধান ঘুচে যায় যখন সংসারে থেকেই পরহিতব্রত জীবনের সাধনা হয়ে ওঠে। ফকীর মির্জানকে সেই সাধনাতেই উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে :

"মানবের হিতসাধন ফকীর এবং সংসারী উভয়েরই কার্য।···বাদশা, বুঝতে পেরেছে—সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাকলে, ভগবানের সংসার—প্রেমের সংসার রূপ জ্ঞান হলে—কার্যের নিমিত্ত কার্য করলে—পরহিত সাধন করলে—ফকীর আর বাদশা দুই সমান।"

সংসারে থেকেই ফকীরী—গুরুর কাছে গিরিশচন্দ্র এই শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। মোক্ষ নিতে সবাই দৌড়বে কেন ? কার জন্যে কোন্‌টা—কোন্ জনের পেটে কোন্‌টা সইবে—একথা জানেন জননীই। তাই তাঁর বিভিন্ন সন্তানের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা—কিন্তু তার প্রাপ্য থেকে কেউই বঞ্চিত হবে না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'শঙ্করাচার্য'—উৎসর্গ করলেন কালীপদ ঘোষকে। উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন :

"আনন্দময় সহচর আনন্দধাম নিবাসী, কালীপদ ঘোষ

"ভাই আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ।"

শঙ্করাচার্য শিবের অবতাররূপে পরিচিত। বৌদ্ধ জ্ঞানমার্গের আধিপত্যকালে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই দিকটির দিকে লক্ষ্য রেখে গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে শঙ্করাচার্যের চরিত্র সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন। ফলে দক্ষিণেশ্বরের 'মূর্তিমান বেদান্ত' ও বিশ্বপটভূমিকায় বেদান্ত ভাষ্য, সমন্বিত হয়েছে 'শঙ্করাচার্য' নাটকে। শঙ্করাচার্য এসেছেন বারাণসীর ঘাটে গঙ্গাস্নানে। চণ্ডালবেশী মহাদেব তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য কয়েকজন চণ্ডাল-চণ্ডালিনীর সঙ্গে মত্ত অবস্থায় সেই ঘাটে শুয়ে আছেন।

শঙ্করাচার্য আপন সংস্কার ও শুচিতাবোধে তাঁদের সম্ভাব্য স্পর্শ এড়াবার জন্যে তীব্র ভাষায় পথ থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে তাঁদের আদেশ করছেন। নাটকে এই দৃশ্যে দেখি চণ্ডাল কণ্ঠে বেজে উঠেছে শ্লেষের সঙ্গে তীব্র ভৎর্সনা :

"গঙ্গাজীতে যে সূর্য আর হাড়িয়ার সরাপে যে সূর্য চমকে এ কি জুদা জুদা সূর্য ? এ বাতটা বুঝে না, সোনার কলসীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির বিচে আকাশটা জুদা জুদা বলছে। ওকে ফারাক দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে !"

সেই ভৎর্সনা বাক্যে এবং তাঁদের কথায় শাস্ত্রীয় যুক্তির উল্লেখ দেখে শঙ্করাচার্যের চৈতন্য হয়েছে।

এই দৃশ্য পরিকল্পনায় কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কথিত কাহিনীর প্রভাব দেখা যায় :

"কাশীতে গঙ্গাস্নান করে শঙ্করাচার্য সিঁড়িতে উঠছেন—এমন সময় কুক্কুর পালক চণ্ডালকে সামনে দেখে বললেন, এই তুই আমায় ছুঁলি। চণ্ডাল বললে, ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই—আমিও তোমায় ছুঁই নাই ; আত্মা সকলেরই অন্তর্যামী আর নির্লিপ্ত। সুরাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব আর গঙ্গাজলে সূর্যের প্রতিবিম্ব, এ দুয়ে কি ভেদ আছে ?"(১২)

এই সঙ্গে খেতরীর রাজার সন্তানলাভ উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীত আসরে বাইজীর যে গানটি বিবেকানন্দের মনে আলোড়ন তুলেছিল সেটির কথাও মনে পড়ে :

..."ইক জীব ইক ব্রহ্ম কহবত সুরদাস ঝগেরো
অজ্ঞান সে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥"

শঙ্করাচার্যের সমাধি অথবা তাঁর দেবদেবী ও মূর্তিপূজার উপযোগিতা ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীরামকৃষ্ণকে :

যতদিন দেহবুদ্ধি রহে
পূজাস্তব যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন।
মুক্ত আত্মা রহেন পূজারত
যতদিন দেহবুদ্ধি রয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়।
এই হেতু মুক্ত আত্মাগণে
নিয়ত রহেন দেবদেবীপূজারত।
মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তি পথে হয় অগ্রসর
উপাস্য বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান
ধ্যান মগ্ন অহর্নিশি রহে

ইষ্ট মূর্তি হেরে সে হৃদয়ে
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়
উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি ;—

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে পরক্ষণেই ধ্বনিত হয় বিবেকানন্দের কণ্ঠ :

"শান্তি—প্রভু, আপনার কথা ভারি গোলমেলে, যদি এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন ?

শঙ্কর— হীন বুদ্ধি নরে, বিদ্যাদম্ভভরে :
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধনেরে।
অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়
সত্য উপলব্ধি মাত্র, কেবল তাহার।……
দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যপ্ত চরাচরে
ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজ সম
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে।
অস্তি, ভাতি, প্রিয় – এই মহাবাক্যত্রয়
করিতে স্থাপন, মম তর্ক প্রযোজন,
ইহার অধিক নাহি শাস্ত্র শিক্ষা আর।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরিত্রের সমন্বয় সাধন অথবা একই চরিত্রে উভয় ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন কোনো অবাস্তবতার সৃষ্টি করে নি। অন্তত গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ। এর পাঁচ বছর আগে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

"…পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। মহামহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান আবরণে আবরিত হইতেন। ……জ্ঞান ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,—ভক্তি পরমহংস অভেদ।" (১৩)

শঙ্করাচার্যের শরীরের ব্যাধির আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের দুরারোগ্য গলরোগ সম্পর্কে গিরিশের বিশ্বাস,—ভক্তদের, বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রের জীবনের সমগ্র পাপ তাঁর গুরু স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর ব্যাধি। এক সময় নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি আপন শরীরে গ্রহণ করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাঁর কাছে। (১৪) শঙ্করাচার্যে সেই ভাবের প্রকাশ :

"সনন্দন—ভাই, পবিত্র দেব শরীরে কিরূপে দুষ্ট ভগন্দর রোগ প্রবেশ করলে ?

মণ্ডন—ভাই, এ সকল আমাদেরই পাপের ফলাফল। গুরুদেব আমাদের পাপ গ্রহণ করে এই ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করছেন। আহা, দেখ দেখ—রোগের তাড়নায় গুরুদেব শীর্ণ হয়েছেন। আমি অনেক অনুসন্ধান করলেম, এ দেশে তো সুচিকিৎসক নাই।

সনন্দন—রাজা সুধন্বা দুইজন ভীষক লয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বলেন, এ রোগ তাঁদের অসাধ্য।

(হস্তামলক ও শঙ্করাচার্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শঙ্কর—কি হস্তামলক ?

হস্তা—প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

শঙ্কর—তুমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পুরুষ, তোমার আবার প্রার্থনা কি ?

হস্তা—প্রভু, আমি আপনার দাস, আমায় বঞ্চনা করবেন না।

শঙ্কর—ওহে তোমরা শোন শোন—আজ মৌনী হস্তামলক আমার নিকট কি প্রার্থনা করছে।

আনন্দ—গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু বস্তু প্রার্থনীয় আছে।

শঙ্কর—এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো ?

আনন্দ—আপনি অন্তর্যামী, আপনিই জানেন।

শঙ্কর—বাতুল আমার ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করে ! আরে বাতুল রোগ তোমায় কিরূপে প্রদান করব ?

হস্তা—প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ করে লই।

শঙ্কর—(ব্যস্তভাবে) না না হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্ত হলে আমি রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণে যন্ত্রণা পাব।

তপোবল গিরিশের শেষ নাটক। মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১) মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হলো। এ নাটকও গিরিশচন্দ্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ এবং ভগিনী নিবেদিতার আগ্রহে রচনা করলেন (১৫)—উৎসর্গ করলেন সদ্য লোকান্তরিতা ভগিনী নিবেদিতাকেই :

পবিত্রা নিবেদিতা ! বৎসে !

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায় ? কাল দার্জিলিঙ যাইবার সময় আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে "আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।" আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎস দেখা করিতে আইস না ? শুনিতে পাই মৃত্যুশয্যায়

আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার স্নেহপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

১৩নং বোস পাড়া লেন
বাগবাজার কলিকাতা
৩রা পৌষ ১৩১৮ সাল

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

'তপোবল'কে সাধারণ পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। পৌরাণিক কাহিনীর ছায়ামাত্র অবলম্বনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আদর্শ এই নাটকে রূপায়িত করেছেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বলাভ শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সে ব্রাহ্মণত্বে জন্ম বা কুল পৌঁছে দেয় না। সে লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রয়োজন তপস্যার। তপস্যার বলেই মানুষ লাভ করতে পারে জীবনের মহত্তর সিদ্ধি। মনুষ্যত্বের গৌরব নির্ভর করে আত্মত্যাগে। আত্মত্যাগ সমুজ্জ্বল সাধনাই বরণীয়। এই চিন্তার আলোকেই তপোবলের পৌরাণিক কাহিনীটি পরিবেশিত হয়েছে। সদানন্দ চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াপাত সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য কোনো একসময় তিনঅঙ্কের একটি নাটিকা রচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। সেই 'নিত্যানন্দ বিলাস' নাটিকা সম্ভবত অভিনীত হয় নি। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রকাশিত গিরিশ গ্রন্থাবলীতে এটি মুদ্রিত হয়েছে। রচনাটির বহুস্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র ও কথামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট। নিত্যানন্দের অবতারত্ব সম্পর্কে নাটকে ঘনশ্যাম চরিত্রের কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

"নিতাই কখনই মানুষ নয়, আমি খুব ঠাউরে দেখেছি—পাতকী উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং ভগবান দেহ ধরেছেন। ছেলেবেলা থেকে মদ খেয়েছি, একদিন মাতাল বলেছিল বলে মনে বড় ধিক্কার হয়েছিল, মদ ছেড়ে দিলুম। একদিন গেল—দু'দিন গেল—তিনদিনের দিন মদের জন্যে প্রাণে যে কি কষ্ট হয়েছিল, তা বলতে পারিনে। মনে হলো বুঝি মদ না খেলে সেই মুহূর্তেই মারা যাব। ভাবলুম যা থাকে অদৃষ্টে, এখন তো একটু খেয়ে প্রাণ বাঁচাই; আবার ভাবলুম যখন খাবনা বলেছি,—যদি মরেও যাই, তাও স্বীকার, তবু খাবনা। এমন সময় নিতাই এসে বললে 'কি রে মদ খাবি? তা এত ভাবনা কেন; তোর ঐ ঘটিতে যে মদ রয়েছে খা না।' শুনে আমার মনটা একরকম হয়ে গেল, ভাবলুম, লোকটা বলচে কি? বড় তেষ্টা পেয়েছিল, তাই গঙ্গা থেকে একঘটি জল এনে খেয়েছি, সেই জলেরই যা কিছু ঘটিতে আছে। ঘটিতে মদ বলছে কি! খেয়ে দেখি না, কি বলে। ঘটি ধরে যেমন খেতে যাব মদের গন্ধ পেলুম—মদ! ঘটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিতাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলুম। নিতাই আমার হাত ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন!"

ঘনশ্যামের জবানীতে গিরিশ নিজের কথাই ব্যক্ত করেছেন।

ঐ নাটকেরই আর একটি দৃশ্য।

ঘনশ্যামকে মাতাল বলায় প্রবল অভিমানে সে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। স্ত্রী বিমলা তাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাচ্ছে। অবশেষে :

"বিমলা—তুমি যদি বাড়ি না যাও, তবে আর আমি কার জন্যে বাড়ি যাব ? আমারই বা কিসের বাড়ি ? চল—আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব—তোমার যে গতি আমারও সে গতি।

"ঘনশ্যাম—আমার সঙ্গে যাবে ? চল, আমি বারণ করব না।…

" বিমলা—…আমি ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তাতে তো তোমার আপত্তি নাই।

"ঘনশ্যাম—না,—তবে আর দেরী কেন, এস ; যখন যাব বলে বেরিয়েছি, তখন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ? (ঘনশ্যাম ও বিমলার প্রস্থান)

"হারাধন—আচ্ছা মশায়, আমি তো এদের ভাব কিছু বুঝতে পারলুম না। এই সামান্য কথায় এঁরা দু'জনে সংসারত্যাগী হলেন ?

"অবিনাশ—ও কিছু বলা যায় না, যাদের হয় তাদের ঐ রকমই হয়।"

চিনতে ভুল হয় না, এটি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই তীব্র বৈরাগ্যের বহুকথিত গল্পটি নাট্যাকারে পরিবেশিত : স্বামী স্নান করতে চলেছে, স্ত্রী বললো—'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে—এক এক করে ষোলজন স্ত্রীকে ত্যাগ করছে।' কথা শুনে স্বামী বললো,—'একটু একটু করে কি ত্যাগ হয় ! আমি ত্যাগ করতে পারব—এই দেখ, আমি চল্লুম।'—সেই অবস্থায় কাঁধে গামছা ফেলে সে সংসারত্যাগ করে চলে গেল।

'মিলন-কানন' একটি অসমাপ্ত গীতি-নাট্য। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন "গীতি-নাট্য খানি ১৩১৭ সালের চৈত্রমাসে লিখিতে আরম্ভ করেন।" প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য পর্যন্ত লিখিত রূপকধর্মী এই রচনাটির প্রধান চরিত্র 'উদার'কে সামান্য পরিসরেও চেনা যায়। 'পাগল করা বনে' সম্মোহিনী, বিলাসিনী চতুরা ও চপলা—অপ্সরা চতুষ্টয়ের কুহকে সকলেই পাগল হয়। বন্ধুদের অন্বেষণে এসে উদার এদের সাক্ষাৎ পায়—স্থির করে এদের মোহজাল ছিন্ন করে সে তার বন্ধুদের উদ্ধার করবে ! উদার বুঝেছে তার বন্ধুরা "প্রাণহীনা চতুরাগণের ছলনায় আত্মহারা হয়ে বেড়াচ্ছে। এরা কারা ? কদাচ মানবী নয়, নইলে মানব হৃদয়ের বেদনা বুঝতো। এরা রাক্ষসী বা পিশাচী—মানব-মানব হৃদয় লয়ে এদের খেলা। আমি নিরাশ হব না—এদের মোহজাল ছিন্ন করে এ অভাগা যুবকদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করবো।…মাতৃস্নেহ—মার পদধূলি আমার ভরসা। পিশাচীগণের কুহকে কদাচ মুগ্ধ হব না।"

অপ্সরাদের সমস্ত ছলাকৌশল যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সম্মোহিনীর সখেদ উক্তি—
"...আজ এ সামান্য মানুষের কাছে পরাস্ত হলুম।"
"বিকাশিনী (অন্তরালে হইতে স্বগত) কে বলে মানুষ দুর্বল ? যার হৃদয়ে এমন উচ্চ-প্রকৃতি বাস করে, যে প্রকৃতি মদনশরে আহত হয় না, যে দুর্বল সে দুর্বল, কিন্তু এ যুবা দুর্বল নয়।"

॥ ৪ ॥

গিরিশের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব শুধু নাট্যরচনা বা অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংগীত—এমন কি নৃত্যপরিকল্পনা ও প্রয়োগেও সে প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। নাটকের প্রযোজনা ও প্রয়োগ-পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র শুধু যে নট-নটীকেই নির্দেশ দিতেন এমন নয়। নৃত্যগীতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল—নৃত্যশিক্ষক, সংগীত পরিচালকও তাঁর পরিকল্পনামতো নৃত্যরচনা, সুর সংযোজনা করতেন। গিরিশচন্দ্র লিখছেন "নেপেনের (প্রখ্যাত নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রনাথ বসু) সহিত নৃত্য সম্বন্ধে প্রায়ই নানা-রূপ আলোচনা হইত। নেপেন বুঝিল, যাহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হয় সেই সকল নৃত্যের ভাবভঙ্গী।...নৃত্য সামান্য কলাবিদ্যা নয়—মনোযোগের সহিত নেপেন এই সকল কথা শুনিত।" (১৬) নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে নৃত্য-পরিকল্পনার যে আদর্শের সন্ধান গিরিশচন্দ্র দিয়েছেন তা যে পরবর্তীকালে তাঁর নাটকে এবং নৃপেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত অন্যান্য নাটকে প্রযুক্ত হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নৃত্য চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন কি ?
সে যুগে রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত থিয়েটারী নৃত্যের গতানুগতিক রীতি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র উপরোক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর নৃত্য-ভাবনাকে যে শ্রীরামকৃষ্ণই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন এ কথাও তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন "কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে, গৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, —এ কথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নৃত্য দেখিয়াছি ! 'নদে টলমল টলমল করে মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে ; রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন ; যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন,—আমরা দর্শন করি-য়াছি, আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করি—যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা !—কেবল নদে টলটল করিতেছে না—সমস্তই টলটলায়মানা ! যে, সে নাচ দেখিয়াছে, তন্ময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর-শক্তি ! সৌন্দর্য যে তাহার ভিত্তি।" (১৭)

শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য দেখার সৌভাগ্য গিরিশের বহুবার ঘটেছে। গিরিশের 'গানের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করেছেন কিন্তু পানিহাটীর উৎসবে তাঁর অভিজ্ঞতা সর্বাপেক্ষা চিত্তস্পর্শী। সৌন্দর্যই যে নৃত্যের ভিত্তি এই বিশ্বাস তাঁর গড়ে উঠেছিল সেদিনের দুর্লভ অভিজ্ঞতায়। পানিহাটীর উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ তাঁর "লীলাপ্রসঙ্গে"। সারদানন্দ লিখেছেন "ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য-মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাস-ময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রী-পুরুষের হাবভাব-ময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্র-মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে-দুলিতে ছুটিতে থাকিত, তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল-তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে।"(১৮) প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্র সেদিনই বুঝেছিলেন "নৃত্য সামান্য কলাবিদ্যা নয়।"—সেই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন নৃপেন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিতে গিয়ে। এতদিনের গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে অভিনবত্ব এনে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন করেছেন।

॥ ৫ ॥

এক গ্রীষ্মের সকালে গিরিশচন্দ্রের বাড়ির ছাদে বসে গুন্ গুন্ গান করছিলেন নরেন্দ্র-নাথ। গান শুনে গিরিশ-অনুজ অতুলচন্দ্র মোহিত হয়ে গেলেন। শুধু সুরের জন্যে নয়—এ গানের ভাব-ভাষা সবই তাঁর কাছে বিস্ময়কর। এ গান রচনা করল কে? মেজদা (গিরিশচন্দ্র)? মুগ্ধ অতুলবাবু রায় দিলেন "এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড়লোক—এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।" কিন্তু গান রচনা করলো কে? নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসেন কিন্তু মুখ খোলেন না। অতুল-

চন্দ্র একে একে সকলের কাছেই জিজ্ঞাসা করেন "ঐ যে গানটা নরেন গাইছিল :

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি : নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥

ওটা কার লেখা ?

শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিলেন শরৎ-মহারাজ : ও ত নরেনেরই লেখা।(১৯)

গানটি শুধু অনুজকেই নয় অগ্রজকেও যে কি ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তার প্রমাণ তাঁর বিভিন্ন নাটকের চারখানা গান। 'করমেতি-বাঈ' নাটকে ফকীরের গান তো এর হিন্দী ভাষান্তর বলেই মনে হয়।

সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া, কাঁহা ছিপায়া তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া, মন কাঁহা তোমারা।
আসমান সে আসমান মিলায়া—ছায়া ছায়া ছায়া
কাঁহা ফিন আসমান মিলায়া, পাত্তা নেহি কুছ পায়া,
সমজো তব যব সমজ আওয়ে ভাই
কুছ নেই কুছ নেই কেয়া
দেল না বোলে, বাৎ না চলে সমজ কোই কুছ লিয়া
ফাঁক হায় সব কুছ, ভর্তি সব কুছ পুরা পুরা পুরা।

দু'বছর পরে মায়াবসান নাটকের সমাপ্তি সংগীত :

মেদিনী মিশিল তরল সলিলে তপন শুষিল বারি
তপন নিভিল—অনিল বহিল—বিপুল ব্যোমচারী ॥
নীরব রব শূন্য শরীরে শূন্যে শূন্য মিশিল ধীরে
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে-মায়া কায়াহারী ॥

নাট্যায়িত 'সীতারাম'-এ জয়ন্তীর গান :

উদার অম্বর শূন্য সাগর শূন্যে মিলাও প্রাণ
শূন্যে শূন্যে ফোটে কতশত ভুবন
তারকা চন্দ্রমা কত শত তপন
শূন্যে ফোটে অভিমান
অহম অহম ইতি শূন্যে বিভাসিত
শূন্যে বিভাসিত মনোবুদ্ধিচিত
মদ মাৎসর্য, ভোক্তা ভোজ্য, শূন্য সকলি এ ভাণ ॥

অশোক নাটকে অন্ধ কুণালের একটি প্রার্থনা গীত :

…শ্বাস বায়ু তুমি জীবন প্রাণ

নাথ, হর অহমিতি অভিমান
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে
চাহে চাহে যায় বিশ্ব মিলাইয়ে
বিস্তৃত জীবন বিস্তৃত প্রাণমন
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ তমহারী··· ॥

ইতস্ততঃ বিবেকানন্দ চরিত্রের ছায়াপাত ঘটলেও স্পষ্টতরভাবে গিরিশ-নাটকে স্বামীজীর আত্মপ্রকাশ 'ভ্রান্তি' নাটকে।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী দেহত্যাগ করলেন। পনেরো দিন পরে ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের নতুন নাটক 'ভ্রান্তি'র প্রথম অভিনয়। নাটকের শিরোনামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর পরিচয়বোধক একটি শ্লোক ভগবদ্গীতা থেকে :

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

[এই-ক্রমে ব্রহ্মভূত ও অন্তরাত্মাতে আবির্ভূত আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া যতি কোনো বিষয়ে শোক করেন না এবং কিছুই আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতের সুখ ও দুঃখ নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায় দর্শন করেন। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি সদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ উত্তম ভক্তি লাভ করেন। জগদীশ্বরানন্দ]

সদ্য লোকান্তরিত বিবেকানন্দের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গতার কত কথাই না তাঁর মনে এসেছে। মনে এসেছে একত্রে রামকৃষ্ণ সন্নিধানে কত তর্ক, কত মতান্তর, আবার কত সৌহার্দ্য। বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও নরেন্দ্রনাথ গিরিশের বন্ধু হয়ে উঠেছেন—আবার গুরুর অবর্তমানে স্বামীজীকেই বসিয়েছেন তাঁর শূন্য আসনে। স্বামীজীর বিদেশযাত্রা এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন মতভেদ ঘটেছে, যখন কেউ কেউ নরেন্দ্রনাথের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরোধী বলেও মনে করেছেন, তখন গিরিশই এগিয়ে গেছেন সে ভ্রান্তি দূর করতে—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অভেদত্ব প্রমাণ করতে। সেই নরেন্দ্রনাথ আজ লোকান্তরে। শোকার্ত গিরিশের 'ভ্রান্তি' নাটকে রঙ্গলালের আচ্ছাদনে স্বামীজীর কণ্ঠই ধ্বনিত হলো।

'ভ্রান্তি' নাটকে রঙ্গলাল একটি পার্শ্বচরিত্র কিন্তু নাটকটির মূল আকর্ষণ এই অভিনব চরিত্রটিকেই কেন্দ্র করে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এবং নিজের কথায় তার চরিত্র ফুটে উঠেছে।

"গঙ্গা—আচ্ছা, তোমার পরের জন্যে এত মাথাব্যথা কেন? তুমি তো ধর্মকর্ম ছাই মানো। এই তো মায়ের সামনে একবার মাথাটাও নোয়ালে না।

"রঙ্গলাল—মার কোলে ছেলে থাকে, ক'বার প্রণাম করে বল? ক'বার স্তবস্তুতি

করে ? ক'বার বলে,—তুমি হ্যান, তুমি ত্যান ? ক্ষিদে পেলে, দরকার হলে, এসে—মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না তাতে কি মা ব্যাজার ? তবে সৎমা হলে নানা কথা কইতে হয় বটে।...

"গঙ্গা—তুমি নাস্তিক না কি ?

"রঙ্গলাল—আমি নাস্তিক ? যে বলে সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ ! আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর।

"গঙ্গা—কে তোমার দেবতা শুনি !

"রঙ্গলাল—মানুষ আমার দেবতা ! যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে, ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে, এ কথার তর্ক-বিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ ;—যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না—ভালো করেছি কি মন্দ করেছি—যে দেবতার পূজায় কোনো শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই। দেখ বিবিজান, একবার মানুষের সেবা করে দেখ, প্রাণ তর হয়ে যাবে।...

"গঙ্গা—আমি ঠিক ঠাউরেছি, তুমি নাস্তিক।

"রঙ্গলাল—কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস ভটচায্যিকে জিজ্ঞাসা করো,—বলতে হবে, সকল মানুষেই মা আছেন ; বড় বড় মোল্লা মানবে—খোদার সকল অংশে সবাকার জান্ ; পাদরীতে বলবে ; তাহলে আমি নাস্তিক কি করে বল ? 'মা সর্বময়ী মা সর্বময়ী' বলে পূজা দিয়ে গেল, মুখে বলেন সর্বভূতে মা আছেন, আর জীব-জন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরি দেন।...তার মা বলা তাতেই থাক, অমন মা আমি বলতে চাই নে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হোন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হোন, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমিও আশীর্বাদ কর, আমি যেন দু'একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে, তাকে একখান কম্বল দিতে পারি, তাহলেই আমি চরিতার্থ হব।"

নর্তকী গঙ্গা বারবিলাসিনী। তার সঙ্গে রঙ্গলালের সাক্ষাতের ও পরিচয়ের কথা গঙ্গার মুখ থেকেই শুনতে পাই।

"গঙ্গা—আজ ক'বছরের কথা—আমি ঠাকুরতলায় সর্দিগর্মি হয়ে রাস্তায় মূর্ছিত হয়ে পড়ি ; বেশ্যা বলে ঘৃণা করে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়িতে নিয়ে এলে। আপনি নীচে শুয়ে, নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন করলে ভালবাসার লোকও সে রকম করে না। আমি তখন মনে করেছিলুম যে,

তোমার মনের কথা বুঝি কিছু আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের গোলামের মতো সেবা করে···ভেবেছিলেম, বুঝি তুমিও সেই একরকম। তারপর যখন ভালো হয়ে বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না।"

রঙ্গলালের আচরণে গঙ্গার মনের এই বিস্ময় থেকেই জন্মেছে তার প্রতি আকর্ষণ। সেই টানেই সে রঙ্গলালকে একটি নারীর মন নিয়ে আপন করতে চেয়েছে। যে নারীত্বের অপমৃত্যু ঘটেছিল, রঙ্গলালের সান্নিধ্যে তারই পুনরুজ্জীবন। সে টানেই সে রঙ্গলালের লোকহিতব্রতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করে যায়—নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে অসমসাহসিক কাজে এগিয়ে যায়—ক্রমে ক্রমে তার জীবনে আসে পরিবর্তন—আত্মরতি সুস্থিত হয় বিশ্বরতিতে। নাটকের অন্তিমলগ্নে রঙ্গলালকে বলতে শুনি :

"বিবিজান, সংসারে এই প্রেমের খেলা। এ খেলায় তোমার আমার কাজ নাই। ভ্রান্তি-ভ্রান্তি-ভ্রান্তি—আগাগোড়া ভ্রান্তি। তবে কাজ করতে এসেছি, কাজ করে বেড়াই এসো। পরের দায় মাথায় নিলে, আপনার দায়ে নিশ্চিন্ত হব, অতটা ঘোর থাকবে না।"

উত্তরে গঙ্গা বলেছে "ঠিক বলেছিস বামুন।"

রঙ্গলালের ধর্মবোধ, ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে স্বয়ং নবাব মুরশিদকুলি খাঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছে :

"মুরশিদ—আচ্ছা, তুমি হিন্দু কি মুসলমান ?

"রঙ্গলাল—নবাব সাহেব, আপনি কি হিন্দু না মুসলমান ?

"মুরশিদ—আরে এ ক্যা বাৎ ! হামি তো মুসলমান হায়। তোমবি মুসলমান হো গিয়া। হামারা ঘর মে খিচড়ি খায়া, তোমারা জাত মার দিয়া।"

'ভাতের হাঁড়িতে ধর্ম' রঙ্গলাল বিশ্বাস করে না—সে উত্তর দেয়

"জনাব, খানা খেয়ে যদি হিন্দু মুসলমান হয়, তাহলে আপনিও হিন্দু হয়েছেন। আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল রে ধে খাইয়েছি।

"মুরশিদ—লেকেন তোম ব্রাহ্মণ হোকে মুসলমান কা খানা খায়া। তোমার জাত গিয়া।

"রঙ্গলাল—একে একে তো সব যাবে নবাব সাহেব, শরীরটাও যাবে, না হয় জাত গেছে !"

নবাবের কাছে রঙ্গলালের একটি মাত্র প্রার্থনা :

"নবাব সাহেব, তুমি আমায় কিছু দিতে চাচ্ছিলে, তোমার কাছে মেগে নিচ্ছি, মানুষকে ভালবেসো। মানুষ বড় দুঃখী।"

মানুষের জন্যে এই তীব্র বেদনার রূপটাই গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন বিবেকানন্দের মধ্যে। দার্শনিক বিবেকানন্দের চেয়ে মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দই তাঁর কাছের মানুষ। এক-

দিনের কথা। স্বামীজী মঠে শিষ্যদের কাছে বেদ ব্যাখ্যা করছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত। বেদপাঠ থামিয়ে তখন বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজীর ক্ষণিক রহস্যালাপ। এবং তার বেদনাকরুণ পরিণতি :

"কি জি. সি, এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্টবিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!

"গিরিশবাবু—কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও সব বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও-সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই।…

"স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন 'হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরচে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে?'…গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

"ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'দেখলি…কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল…এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।…মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদবেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

কিন্তু শিষ্যের মনে ক্ষোভ—এমন চমৎকার পাঠের আবহাওয়াটাই গিরিশবাবু নষ্ট করে দিলেন মাথায় জগতের কতকগুলো ছাইভস্ম এনে। বললেন :

"আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষাই শুনিতে ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান কিনা! কিন্তু এই শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

"গিরিশবাবু—বলি, জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায়? আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দেখ না তোর গুরু [স্বামীজী] যেমন পণ্ডিত, তেমনি প্রেমিক।…এই দেখনা স্বামীজী এত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যেই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন।" (২০)

এই প্রেমিক বিবেকানন্দকেই গিরিশচন্দ্র ভালবেসেছিলেন, যিনি অধ্যাত্মরাজ্যের শীর্ষাসীন হয়েও অকুতোভয়ে বলতে পারেন "যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন

করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"

সেই বিবেকানন্দ নেই! সদ্য বিয়োগবেদনার মাঝখানে নাটক রচনা করতে বসে গিরিশ-চন্দ্র সেই মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দকেই স্মরণ করেছেন।

'ভ্রান্তি' নাটক প্রথম অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র রঙ্গলালের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই অভিনয়ে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তি কতখানি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, তা আজ অনুমান করতে পারি—প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।

'সৎনাম বা বৈষ্ণবী' নাটকের ফকীর চরিত্রেও বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তমঃ-আচ্ছন্ন মানুষকে ফকীর জাগাতে চায়—তার মধ্যে রজোগুণের প্রকাশ দেখতে চায়। মহান্তের সঙ্গে কথোপকথনে যেন বিবেকানন্দের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি:

"ফকীর—কেন মহান্তজী, তোমরা টোল করে করে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছ যে, নির্বাণ লাভ করো। কেউ যদি মারে, সে কিছু নয়, স্বপ্নমাত্র। বাড়ী কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সে-ও স্বপ্নমাত্র। স্ত্রী নাই—বাড়ীও নাই। একমাত্র পুত্রকে না খেতে দিয়ে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন—কিছুই নয় মায়া। খালি নির্বাণ হবার চেষ্টা করো! তা আওরঙ্গজেব বাদসা সুমেরু হতে কুমেরু পর্যন্ত হিন্দুর আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্বাণ মুক্তি দান করবেন।···

"মহান্ত—ব্যঙ্গ রাখ, তোমার কথাটা কি? আওরঙ্গজেব বাদসা কি হিন্দুদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

"ফকীর—আরে ক্রুদ্ধ কেন? দেখছেন হিন্দুরা বহুকাল হতে সাধন করে করে মনুষ্যাকার বৃক্ষপ্রস্তর হয়ে সব সহ্য কচ্চে, কেন না, শেষে মুক্তিলাভ করবেন। এতদিনে বোধ-হয় সাধন ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে···

"মহান্ত—আচ্ছা ফকীর, তুমি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, কিন্তু শাস্ত্রের কথা নিয়ে দিনরাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?

"ফকীর—কে বল্লে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি এমন চমৎকার শাস্ত্র ব্যাখ্যা! মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জানতো যে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ পাঠ করে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনুষ্যাকার গাছ পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, তাহলে বোধহয় শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং নিজের তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

"মহান্ত—তোমার বিবেচনায় কি শাস্ত্রকারেরা ভ্রান্ত?

"ফকীর—ভ্রান্ত নয়? ঘোর ভ্রান্ত! তাদের বোঝা উচিত ছিল, কালে দিগগজ দিগগজ পণ্ডিত হবে, শাস্ত্রের ওপর টীকা চালাবে; যে অর্থে শাস্ত্র লিখেছেন সে অর্থ আর

থাকবে না।

"মহান্ত—ফকীর, বৃদ্ধ হলে আজও বুঝলে না, যে রজোগুণে মুক্ত হয় না, রজোগুণে কার্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, জীবকে বাসনায় জড়িত করে।

"ফকীর—আর তমোগুণে জড় হয়ে বাসনার হাত এড়ায়।

"মহান্ত—মূর্খ, আমি সে কথা কি বলছি। তমোগুণে অলস জড় হয়।...সত্ত্বগুণ উদয় হলে তবে পরমার্থ লাভ হয়।...রজোগুণী রাবণ—দেব কন্যা, নাগকন্যা হরণ, এই তো তার ফল।

"ফকীর—আপনার কি ধারণা, যে হিন্দুরা সকলে সত্ত্বগুণী তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়—একবার চক্ষু খুলে দেখ যে ঘোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন—অলস কুম্ভকর্ণের মত জড় হয়ে আছে! অনলস হয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হলে তবে সে জড়ত্ব দূর হবে। ভগবান বলেছেন, কার্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ করতে পারে? সৎকার্য ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্বাণে অধিকারী।...বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।"

ভাব, এমন কি ভাষার দিক থেকেও স্বামীজীর বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য কত স্পষ্ট! 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বামীজী লিখেছেন :

"সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃ প্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে—এই সত্ত্ব-প্রধান হয়েছে কি তমঃ প্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পরে ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব আর দিতে হয় ?...

"আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে ঢোক গিলে-গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা, সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ দিয়ে কি কথা বেরুল দেখ—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ; শেষ—'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'। ঐ জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি।" (২১)

আবার 'স্বধর্ম' 'জাতিধর্ম' ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেই লিখছেন। "ঐ 'জাতিধর্ম স্বধর্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধু-রাম যা জাতিধর্ম বলে বুঝেছেন সেটা উল্টো উৎপাত।...

"প্রথম পুরাণ পুঁথি পাটা বেশ করে পড় গে, তখনি দেখতে পাবে যে শাস্ত্র যাকে

জাতিধর্ম বলছে, তা সর্বত্রই প্রায় লোপ পেয়েছে।" (২২)

মোক্ষের পথ যতই ভালো হোক তা যে সর্ব সাধারণের জন্য নয়এই কথাটাই স্বামীজীর রচনায় (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) পরিস্ফুট হয়েছে :

"তুমি গেরস্থ মানুষ তোমার ও-সব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর' এ কথা বলেছেন হিন্দুরশাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত-লাফাতে পার না লঙ্কা পার হবে। ··তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।···হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্ম বধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক।" (২৩)

লক্ষ্য করার বিষয় স্বামীজীর কথাগুলিতে যেমন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে—গিরিশচন্দ্রও তা অবিকৃত রেখে স্বামীজীর প্রকাশ ভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ফকীর চরিত্রে।

পরিশেষে একটা কথা স্মরণ রাখা দবকার, শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ চরিত্রের সম্পূর্ণ নাট্যরূপায়ণ সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র যত বড প্রতিভাই হোন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মত অ-সাধারণ চরিত্রের রূপদান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া যে নাটক সাধারণের জন্য সে নাটকের চরিত্রও সাধারণের মধ্য থেকেই গ্রহণীয়—না হলে তা সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতো চরিত্রের কদাচিৎ মানুষের ইতিহাসে সাক্ষাৎ মেলে। তারা এত ঊর্ধ্বে যে তাঁদের সাধারণ রঙ্গালয়ের সামগ্রী করে তোলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। গিরিশচন্দ্র সে চেষ্টা করেন নি। তিনি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে, পরিচিত চরিত্রকেই স্থাপন করেছেন—তারই মধ্যে তাদের চিন্তায়, বাক্যে বা আচরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছায়াপাত ঘটেছে মাত্র—কোথাও কম, কোথাও বেশি। সুদূর ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে নাটক রচনার যে সুবিধা আছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে সে সুযোগও ছিল না। গিরিশচন্দ্র সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই, কাছের মানুষ হয়েও তাঁদের জীবনভিত্তিক কোনো নাটক রচনার চেষ্টামাত্রও করেন নি।

॥ ৬ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র গানও লিখেছেন। গিরিশচন্দ্রের সব গানগুলি সনাক্ত করা কঠিন। যেগুলি নির্ভুলভাবে গিরিশচন্দ্রের বলে প্রমাণিত, সেইরকম প্রচলিত গানগুলিই কেবলমাত্র উল্লেখ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে গিরিশের 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে' গানখানি বহু প্রচলিত। 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' পত্রিকা এবং 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বা ঠাকুরের নামামৃত' পুস্তিকার কয়েকটি গান যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক রচিত! ১৩০৬ সালের 'তত্ত্ব-মঞ্জরী'তে (পৃষ্ঠা ১১১)প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় :

"দ্বিতীয় বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্যন্ত ভক্ত শ্রীগিরীশ [গিরিশ] চন্দ্র এই উপলক্ষে [রাম কৃষ্ণোৎসব] কীর্তন রচনা করিয়াছেন!"

'তত্ত্বমঞ্জরী' (১৩০৯)-তে তৃতীয় বার্ষিক রামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে রচিত গিরিশচন্দ্র-কৃত নিম্নলিখিত গানটি প্রকাশিত হয়েছে :

আমি সাধে কাঁদি
হৃদয় রঞ্জনে না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে
ফুল্ল ফুল হারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হল বাদী॥
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা
ঢলে ঢলে ঢলে, নাচ কুতুহলে, এস গুণনিধি সাধি॥
চলে গেলে আর এলে না, জীব ত হরি নাম পেল না
পার পাবে না ঋণে, যদি দীনহীনে, কর পদে অপরাধী॥

'তত্ত্বমঞ্জরী' (ভাদ্র ১৩২৪)-তে 'যোগোদ্যানে মহোৎসব' সংবাদে গিরিশের একটি গানের উল্লেখ আছে। মনে হয়, পূর্ববর্তী কোনো বৎসরের রামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে গানটি রচিত। সংবাদে বলা হয়েছে "...প্রাণে প্রাণে অমর গিরিশচন্দ্রের [১৩১৮ সালে গিরিশের লোকান্তর] সেই অমর সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল" :

গগনভেদী উঠেছে জয়রব
আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ উৎসব॥
মত্তধরা সসাগরা পরশে শ্রীপদ
নাই তো আর ভবসিন্ধু, হয়েছে গোষ্পদ॥
ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম সম্পদ॥

এই দুটি গান ছাড়াও 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীতে' গিরিশ-রচিত আরও দুটি অপ্রচলিত গানের সন্ধান পাওয়া যায় :

(১) আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ।
হয়েছি রতন হারা বিহনে যতন॥
সেই রবিশশীতারা সেই ধরা ফুল হারা
বহিছে সময় ধারা বহিত যেমন।

সেই পক্ষীকুল কল অনিলে দোলে কমল
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥
রসিক প্রেমিকবর জনমন ফুল্লকর
ধরেছিলে কলেবর আমার কারণ।
তব প্রেম নাহি মনে ভুলে আছি তোমা ধনে
শত ধিক এ জীবনে ধিক তোরে মন ॥
(২) যদি স্মরণ নিতে পারি রাঙা পায়
নাম নিলে তার হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পলায় ॥
নাম কলঙ্ক ভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তার করুণায় ॥
যে জন করুণা যাচে, (ঠাকুর) আসেন তার কাছে,
অভয়চরণ তার তরে আছে,
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায় ॥

সঙ্ঘজননী সারদাদেবী সম্পর্কে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একটি ছত্র লিখেছিলেন 'পোহাল দুখ রজনী'—সেটিকে অগ্রে রেখে গিরিশ নিচের গানটি রচনা করেন :

'পোহাল দুখ রজনী'
গেছে আমি আমি ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবনমরণ
হের জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি শমন বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী কেঁদ না
রামকৃষ্ণপদ দেখ না
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা,
হের মম পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে
ভুবনতারণ গুণমণি ॥
[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—সেবাদাস।
তত্ত্বমঞ্জরী, বৈশাখ ১৩১৮]

বিবেকানন্দ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র রচিত 'তারা উজ্জল শশি ধরা পর'—গানটি সুবিখ্যাত ও বহুপ্রচলিত। চিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতা ও পাশ্চাত্যে জয় গৌরব লাভের পর

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়, সেই সভার জন্য গিরিশচন্দ্র একটি গান রচনা করেন। অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সেই গানটি হল :

ভুবন ভ্রমণ কর, যোগীবর, যাঁর ধ্যানে
তাহারি সন্তানগণে, চেয়ে আছে তব পানে।
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা
মোহিলে মানবচিত, প্রভুর গৌরব গানে
নানাদেশে নানাভাবে, জয়ধ্বনি একতানে।
রামকৃষ্ণে হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর
ইষ্ট পূজা পূর্ণ তব, পুলক আলোক দানে।
জনমন পুলকিত ঘোর নিশা অবসানে ॥

[কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ-সরলাবালা সরকার।
'দেশ' ১০ আষাঢ় ১৩৬২]

স্বামীজী সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের আর একটি গান:

কে রে এ নরেন্দ্রবর বীরেশ্বর দেহধারী
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যা বিনাশকারী ॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি
বিলাইতে জ্ঞান জ্যোতি, কে এনেছে সহকারী ॥
রহি পরহিতে রত, শিখাতে কি মহাব্রত
এসেছ আশ্রিতরত, জনমন তাপহারী।
গুরুপদে বলিদান, জীবন যৌবন মান,
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন ভিখারী॥

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবনে ও নাটকে :
অমৃতলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল।

॥ ১ ॥

"তখন আমরা কলেজে পড়ি ; বেলুড়মঠে মহোৎসব হইবে শুনিয়া বড়বাজার হইতে হোরমিলার কোম্পানীর স্টিমারে বেলুড়মঠে আসিতেছিলাম। সেই সময় রঙ্গরাজ স্টিমারে নানারূপ হাসির কথা বলিতেছিলেন ; তখনও তাঁহাকে চিনি নাই, সাধারণ লোক বলিয়াই মনে হইতেছিল। কিন্তু স্টিমার ঘুসড়ীর মোড় ফিবিলে বেলুড়মঠ চোখে পড়িবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় 'জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। তখন জানিলাম, তিনিই অমৃতলাল বসু, রঙ্গরাজ। শ্রীশ্রীঠাকুরেব আশীর্বাদ পাইয়া তিনিও ধন্য হইয়াছেন।" বেলুড়মঠের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের একটি অভিজ্ঞতা। (১)

অমৃতলালের জন্ম ১৭ এপ্রিল ১৮৫৩—পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। কলকাতার জেনাবেল য়্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে কিছুকাল ডাক্তারী পডেছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের শুরু থেকেই যোগদান কবেছেন বঙ্গমঞ্চে। কিছুকাল এ. ভি স্কুলে শিক্ষকতা, পুলিশের চাকরী অথবা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সত্ত্বেও তিনি রঙ্গমঞ্চেই কাটিয়েছেন সমস্ত জীবন। গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম অভিনেতা, পরে নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন—থিয়েটারে অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্যের মর্যাদা লাভ করেছেন। এ কালের নাট্যসাহিত্যেরইতিহাস রচয়িতার দৃষ্টিতে অমৃতলালের প্রতিভা "পুরাপুরি প্রহসন ও রঙ্গনাট্যের প্রতিভা ; গভীর গম্ভীর নাটক রচনা তাহার পক্ষে 'পরধর্মের মত ভয়াবহ' হয়েছিল। (২) এক সময় তাঁর সামাজিক কমেডি 'খাস দখল' 'বিবাহবিভ্রাট' 'রাজাবাহাদুর' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কয়েকখানি পৌরাণিক বা আধা-ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে অমৃতলালের নাম প্রহসন রচয়িতা হিসাবেই খ্যাত।

অমৃতলালের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন এসেছে রঙ্গমঞ্চ থেকে। শৈশবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে প্রাপ্ত ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তি—যৌবনে রূপান্তরিত হয়েছে ঔদাসীন্যে।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব তাঁকে পৌত্তলিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আর থিয়েটারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন-ছেঁড়া জীবনযাত্রার মধ্যে অশুচিতাবোধের আত্ম-গ্লানি তাঁর মধ্যে জমে উঠেছিল—যেন দেবতার অঙ্গনে প্রবেশাধিকার তিনি চির-কালের মতো হারিয়ে ফেলেছেন ! নাট্যাচার্য হিসাবে তিনি গিরিশকে শ্রদ্ধা করেন—এক সঙ্গে থিয়েটার করেন—উচ্ছৃঙ্খল জীবনেও সেই গুরু গিরিশচন্দ্রই তাঁর সঙ্গী। অমৃতলাল অকপটে স্বীকার করেছেন :

আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়িতে গিয়ে খেতাম 'বীয়ার'॥

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্টার থিয়েটারে আসতেন তখন তাঁর প্রতি অমৃতলাল কি মনোভাব পোষণ করেছেন বা কি আচরণ করেছেন তা আমরা তাঁর স্বীকৃতি থেকেই আগে জেনেছি।

কিন্তু একদিন গিরিশের প্রভাবেই তাঁর মধ্যে দেখা দিল পরিবর্তন। পরবর্তীকালে অমৃতলাল সে কথা স্বীকার করেছেন :

"গিরিশচন্দ্রকে আমি গুরু বলিয়া ভক্তি ও সম্বোধন করিতাম, তাহার কারণ নাট্য-শিক্ষা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর।" (৩)

গিরিশের জীবনে যখন পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে তখনকার একদিনের একটি ঘটনা অমৃতলালকেও বিচলিত করে তোলে। সেদিন দু'জনে থিয়েটারে আসছিলেন একসঙ্গে। গিরিশ তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রত্যেকটি দেবস্থানে প্রণাম করতে করতে আসেন। অমৃতলালের মুখেই শুনি সেদিনের ঘটনা :

"পথিমধ্যে বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী তলায় দাঁড়াইয়া গিরিশবাবু মাকে প্রণাম করিলেন ; আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রণাম শেষ করিয়া যাইতে যাইতে গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রণাম করিলে না ?' আমি বলিলাম 'না'। পরে শোভাবাজারে যে পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছেন গিরিশবাবু আবার সেখানে প্রণাম করিলেন, আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পথে চলিতে আরম্ভ করিলে এবার গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওখানে ঘাড়টা ফিরিয়ে ছিলে কেন ?' আমি উত্তর করি-লাম, 'ও বাবাঠাকুরটি অপয়া।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'অপয়া বলিয়া তোমার বেশ বিশ্বাস আছে ?' আমি বলিলাম, 'সকলেই তো বলে, কাজেই বিশ্বাস করিতে হয়।' গিরিশবাবু বলিলেন 'বেশ, ঐ বিশ্বাসই ঠিক রেখো, ও ঠাকুরের মুখ আর দেখো না।" (৪)

গিরিশের এই শেষ কথাটিই অমৃতলালের মনে এক সমস্যার সৃষ্টি করলো। অপরের কথার উপর নির্ভর করে যদি 'অপয়া' বলে বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তবে তাদেরই কথায়

নির্ভর করে 'পয়মন্ত'-কেও স্বীকার করবো না কোন্ যুক্তিতে ? এতদিন ধরে গড়ে-ওঠা ধারণায় আঘাত লাগলো তাঁর। গিরিশচন্দ্র তখন থিয়েটার জগতের সম্রাট—তাঁর কণ্ঠে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত মাতৃনাম তাঁর সাম্রাজ্যের সকলকেই প্রভাবিত করেছিল। অমৃতলালও তা থেকে মুক্ত থাকতে পারলেন না। কিন্তু সে-ত যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র—কোনো দৃঢ়প্রত্যয়ের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। একদিন কথাটা বলেই ফেল্লেন গিরিশকে। সেদিন রিহার্সালের পর সন্ধ্যায় থিয়েটারে সকলের সঙ্গে বসে গিরিশবাবু ভক্তিচর্চা করছিলেন। সুযোগ পেয়ে অমৃতলাল বললেন, "মশাই, 'মা' 'মা' করে ডাকি কিন্তু তাতে প্রাণের ভিতর যেন আরও ফাঁক পড়ে যায়, এর চেয়ে না-ডাকা ছিল ভাল।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন গিরিশচন্দ্র; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অমৃতলালকে ডেকে নিয়ে গেলেন স্টেজের মাঝখানে—যেখানে দুটো 'সীন' জোড়া হয়ে অন্ধকার হয়ে আছে। সামনাসামনি বসলেন দু'জনে। গিরিশচন্দ্রের কথায় অমৃতলাল তাঁর হাত দুটি রাখলেন গিরিশের দুই উরুতে। গিরিশচন্দ্রও স্পর্শ করে রইলেন অমৃতলালের উরু। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে গিরিশচন্দ্র আরম্ভ করলেন শ্যামাস্তোত্র আবৃত্তি—তাঁর নির্দেশমত অমৃতলালও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। বার বার আবৃত্তি করছেন দু'জনে। ক্রমে অমৃতলালের দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল, কি একটা অব্যক্ত অনুভূতিতে সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ-চমকের মতো এক আশ্চর্য শিহরণ। গিরিশের পা জড়িয়ে ধরে কম্পিতকণ্ঠে অমৃতলাল বললেন 'গুরু, গুরু—আজ তুমি আমায় মাকে ডাকিয়েছ। এ উল্লাস, এ আনন্দ আমি আর কখনো অনুভব করিনি।'

অমৃতলাল বলেছেন "লোকে জানে, গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু, আমি জানি তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু।" (৫)

গিরিশের সহায়তায় তিনি পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। গিরিশচন্দ্র বার বার অমৃতলালকে নিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। অমৃতলাল লিখেছেন :

"ভক্তি তেজে তপ্ত রক্ত গিরিশ আসক্ত ভক্ত
কভু না বিরক্ত ল'তে প্রভু পদপ্রান্তে।
নাট্যগুরু ছদ্মবেশে যেতে পাদপদ্ম দেশে
গুরুরূপে উপদেশ দিয়াছেন ভ্রান্তে॥"

তারপর একদিন :

"চুকেছে ভোজন-পালা শূন্যস্থালী পাকশালা
অনাহারে আমি আর মিত্র এক অন্য
ব্যস্ত সে গিরিশ ঘোষ পাছে করি আপশোষ
পাতের প্রসাদ আসে শ্রীমুখের অন্ন॥"

অমৃতলাল উপলব্ধি করেছেন :

"অহেতু কৃপার দান অন্নপূর্ণা মা জোগান
চেতন বিগ্রহ গ্রাহ্য ভুক্ত অবশেষ ॥
দেখেনি এ দীন নেত্র পুণ্যতীর্থ পুরীক্ষেত্র
তার তরে নাহি মনে আর কোন কষ্ট।
নিজে প্রভু জগন্নাথ চক্ষু অগ্রে সু-সাক্ষাৎ
প্রসাদ মাহাত্ম্য দেন বুঝাইয়া স্পষ্ট ॥ (৬)

গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটকে অমৃতলাল গ্রহণ করেছিলেন 'নসীরামের' ভূমিকা। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করে এ-ভূমিকার উপযোগী অভিজ্ঞতা তিনি অবশ্যই লাভ করেছিলেন। সেই 'নসীরাম' চরিত্রেরই ছায়াপাত ঘটেছে অমৃতলালের 'আদর্শ বন্ধু' নাটকে 'চট সাঁই' চরিত্রে।

আপাত পাগল চট সাঁইয়ের দার্শনিকতা এবং সরল অথচ গভীর অর্থব্যঞ্জক কথাগুলি 'নসীরাম' ও 'চিন্তামণি'র (কালাপাহাড়) কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :

"চট সাঁই……বাবা দুদিন বিদেশে এসে সব ভুলে যাচ্ছ ; চ, চ, দেশে যাবি চ-চ।

এক রাজার প্রজা মোরা, এক চালাতে ঘর করি
একটি ঘাটে দেয় রে খেয়া, একখানি বই নাই তরী ॥
ফেলে বিষয় আশয় আপনার জনে
কলার বাসনা চড়ে এসেছিরে ঘোর বনে ॥
এখন আঁদাড়েতে পাঁদাড়েতে
দিনে রেতে ঘুরে মরি।
কাজ নাই আর ছদ্মবেশে এ বিদেশে
চুপটি করে সরে পড়ি ॥

পৃথ্বী—কোথায় তোমার দেশ শুনি ?

দিনকর—ওহে পৃথ্বী, বুঝতে পারছ না, চট সাঁই পরকালের কথা বলছেন। ওঁর কি সংসারে মায়া আছে ?

চট সাঁই—না, তোদেরই আছে ; ওকি সহজে যায়, ও রক্তবীজের ঝাড়, যত কাটি তত বাড়ে। মনে করলুম, একেবারে দুটোকে পারব না, 'মা' বেটাকে রাখি। তা, মা বেটী করলে কি না জীব বেটার ওপর চড়ে না বসে বল্লে, যাবি কোথা—থাক না ; 'মা' কাটালি, দিন কতক 'মা' 'মা' বল না, পাঁচজনকে শোনা না, ঐ 'মা' এসে 'মা'-র ডাইনে বসলো, আর নে যায় কে ? চল ছুটে পালাই, ছুটে পালাই, নইলে যেতে পারব না।

দিনকর—সাঁইজী, যা বলছ সত্য, কিন্তু কাজ ফুরোবার আগে পালাবার এক্তার কি ? সংসারে যতদিন থাকতে হবে, ততদিন তো কর্তব্য পালন কত্যে হবে।

চটসাঁই—কর্তব্যটা কি শুনি ; 'আমি' আর 'তুমি' বলে দুটো পুতুল গড়ে, মাথা ঠোকাঠুকি করান, তা বুঝেছি, তোর এখন ঠোকাঠুকির স্বাদ মেটেনি, তা কর, খুব ঠোকাঠুকি কর। আমার কথায় কাজ কি ? আপনি আগুন জ্বালাবি, পুড়বি, পোড়াবি, তা পোড পোড—পুড়তে পুড়তে খাদ কেটে যায়। দেখ যদি আপনার খাদ কাটিয়ে পরের খাদ কাটাতে পারিস।" (৭)

চটসাঁই সম্পর্কে সাধারণের ধারণা, সে সিদ্ধ পুরুষ। ভবিষ্যত দর্শনের ক্ষমতা আছে তার—এক রহস্যময়তার আড়ালে সে বাস করে—কথাবার্তা তাই প্রহেলিকাময়।

"দিনকর—কি সাঁইজী যে, আপনি তো মহাজ্ঞানী—

চটসাঁই—তা ঠিক, জ্ঞানের আমার অবধি নাই তা না হলে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে ঘুরে মরি ?

দিন—আপনি যে যথাতথা ভ্রমণ করেন, তা জীবের হিতের জন্য।

চট—এ বদনাম কেন বাবা ! কোনোদিন তোমার কি হিত করেছি ? খামাখা একটা দাবী ঘাড়ে চাপাও কেন ? তুরভী বাজীতে আগুন দিয়েছ, জ্বলন্ত ফোয়ারা ফুল কাটছে, বারুদও ফুরুবে, অন্ধকারে খোলটা পড়ে থাকবে।

দিন—কিন্তু আপনার ঐ তুরভীর আলোয় অনেকে পথ দেখতে পায়।

চট—আর খুদে খুদে পোকামাকড় বিস্তর মারা পড়ে।

প্রধান সর্দার দিনকর রাও যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে, তখন শেষবারের মতো তার স্মৃতিপথে উদয় হচ্ছে স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা। চট সাঁই তাকে শোনায় :

— কত শাস্ত্র পড়েছিস, জানিস ত সব মায়া।

দিনকর— জানি বটে এ সংসার মায়াময়
দারাপুত্র কেহ কারু নয়
আছে এই আজি নানাভাবে সাজি
এই চলে যায় যেন ছায়াবাজী প্রায়।
সবই বুঝি সবই জানি
তবু মন বারিবারে নারি ;…
বুদ্ধি তর্কে না কুলায় আর ;
পরমাত্মা সদা নির্বিকার
তবে কেবা করে আকুল পরাণ ?

চট— আছে চিতের ভিতরে চিত
গেড়ে মস্ত ভিত, করে বুদ্ধির উপর জিত।

এই হাড় আর মাসে ফেলে কাঁদে
খানিক হাসে খানিক কাঁদে
সেটা কেউ নয়
তোর হৃদয়, তোর হৃদয়।
তারে ফেলবার নয়—ভোলবার নয়,
সে সকল কয়, সকল সয়
সে একেই পাঁচ—একেই ছয়
ওই তোর হৃদয়—তোর হৃদয়। (৮)

আগেই বলেছি অমৃতলাল মূলত প্রহসন রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের সংখ্যা সামান্যই। শ্রীরামকৃষ্ণের আলেখ্য অঙ্কনেও কোনো গভীরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বাহ্যিক দু'একটি বৈশিষ্ট্য এবং অর্থবোধক বাক্যে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ও ফুটে ওঠে নি।

অমৃতলালের উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ব্যক্তিগত। তাঁর আত্মসমর্পণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। যাঁরা সমাজঘৃণিত—পাপবোধে তাড়িত, তারা সহজেই ভালবাসার কাছে ধরা দেয়, করুণার স্পর্শে আকুল হয়। কিন্তু অমৃতলালের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ধরনের।—যাঁরা বুদ্ধিজীবী, ব্যঙ্গপ্রিয়, অবিশ্বাসী কিংবা সিনিক তাঁদের পরিবর্তন সহজে আসে না। অমৃতলাল সেই ধরনেরই মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর মানসিক পরিবর্তন স্বতন্ত্র তাৎপর্যমণ্ডিত।

॥ ২ ॥

শ্রাবণ ১৩৩৪ (ইং জুলাই ১৯২৭),'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হলো নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মৃত্যু সংবাদ :

"আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে জানাইতেছি, আমাদের পরমবন্ধু, শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলির গৌরবস্থল, নিষ্ঠাবান তপস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদবিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিগত ৩রা জুলাই ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরমপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এক তান্ত্রিক সাধক বংশে ক্ষীরোদ প্রসাদের জন্ম। তাঁর পিতা গুরুচরণ ভট্টাচার্য শিরোমণি তখনও গুরুবংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। সুতরাং পারিবারিক সূত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে শাক্ত সাধনায় ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস গড়ে ওঠাই সহজ ছিল কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের ফলে তাঁর পারিবারিক ভক্তি-বিশ্বাসকে অতিক্রম করাও অস্বাভাবিক ছিল না। সর্বোপরি সমকালীন ভাবধারার

সঙ্গে যোগাযোগ তাঁকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের প্রতি আগ্রহশীল করে তুলেছিল। কর্ম-জীবনে তিনি প্রবেশ করেছেন জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (বর্তমানে স্কটিশ-চার্চ কলেজ) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে।

বিজ্ঞানসাধক ক্ষীরোদ প্রসাদ যখন নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অপরিসীম। অবশ্য গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল যে-ভাবে মঞ্চের সঙ্গে সংশিষ্ট থেকে নাটক লিখেছেন ক্ষীরোদ প্রসাদ ততখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন না, তবু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাতে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের গুরুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় তাঁর অজানা ছিল না। তিনি যে অঞ্চলে বাস করতেন, সেখানে যেমন সেকালের সুবিখ্যাত নাট্যকার ও শিল্পীদের আবাস, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকেন্দ্রও প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত না থাকলেও, শেষ পর্যন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ রঙ্গমঞ্চের গুরুকেই নিজের অধ্যাত্ম-জীবনের গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পক্ষে সে কাজ বড় সহজ ছিল না। জীবনের গোধূলি লগ্নে তাঁর সেই মানসিক বিবর্তনের ইতিবৃত্তই তিনি রচনা করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'নরনারায়ণে'। 'উদ্বোধনে'র সম্পাদকীয় রচনায় (সম্পাদক: স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ) এই কাহিনীই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে: "তাঁহার শেষ নাটক 'নরনারায়ণ' সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। কারণ তাঁহার আজীবনের সমস্ত সাধনার ফল এই রত্ন পেটিকার মধ্যে তিনি সযত্নে রাখিয়া গিয়াছেন। ক্ষীরোদবাবু বহুদিন বহুবার আমাদের বলিয়াছেন 'কর্ণ চরিত্রে আমি নিজের চরিত্রই আঁকিয়াছি। আমি প্রথমে শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না, তাই কর্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি নিজেরই সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছি:

অন্তর্যামী বিভু নারায়ণ। বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়, ওই
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা, এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান
তুমি। এই যে আমার দেহ আবরণ—
এই বর্ম—সহজাত, দেবের (ও) অচ্ছেদ্য—
এ ত পারিবেনা—কোন মতে পারিবে না,
এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা!
এই সত্য আবিষ্কারে করেছি সর্বস্ব
দান পণ। এই সত্য আবিষ্কারে, আমি

জীবনমরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায় !
হে স্বরাট, যদ্যপি বিরাট সত্য তুমি,
নিশ্চয় একথা জান—নরের অবধ্য
হয়ে এসেছি ধরায়। শুধু নর ? শ্রেষ্ঠ
ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ রামের সে কথা যদ্যপি
সত্য হয়, হে মায়ামনুষ্য নারায়ণ
তোমারও অবধ্য আমি। সেই আমি
কবচকুণ্ডলধারী রাধার নন্দন
যদি মরি অর্জুনের বাণে—যদি—যদি
মরি, তবে, সেই মৃত্যুমুখে বাসুদেব
তোমারে বলিব নারায়ণ।

কবিবর উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিতেন 'একদিন—তখন এখানে প্রথম আসা যাওয়া করি, পূজনীয় শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ঠাকুরকে আপনার কি মনে হয় ? আমি বলেছিলাম :

মানব, মানব, তবে
মুক্ত কণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব মানব।
ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হতে আজিও পর্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।

তারপরই তিনি হাসিয়া বলিতেন, কিন্তু ঠাকুর শেষে কৃপা করে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাই কর্ণের জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমি জেনেছি :

আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব।.....তুমি ভগবান !" (৯)

১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণকে নাট্যকারের লেখা একটি পত্র থেকে বোঝা যায় 'নরনারায়ণ' নাটক রচনার পরিকল্পনা তাঁর বহুদিনের। তিনি লিখেছেন : "আমি এবারে নিজের মনোমত করিয়া এ পুস্তক লিখিতেছি। অভিনয় হউক বা না হউক কাহারও কোন Suggestion লইতে ইচ্ছা নাই। এই পুস্তকই মনে হইতেছে আমার শেষ।...

"কর্ণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, সেইটাই

পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা।...পয়সার জন্য তাহা কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা নাই। কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈবনিগৃহীত বোধ করিতেছি। সুতরাং ভাই, তার চরিত্র রহস্যই আমার এখন প্রিয় বোধ হইতেছে।" (১০)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বললেন "গিরিশচন্দ্র যেমন 'নসীরাম' লিখেছিলেন রামকৃষ্ণকে দেখে, ক্ষীরোদ প্রসাদ 'নরনারায়ণে' নারায়ণ চরিত্র এঁকেছেন তেমনি রামকৃষ্ণকে দেখে। মাঝে মাঝে ভাবসমাধি পর্যন্ত।" (১১)

আমার মনে হয়, এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের 'কালাপাহাড়' নাটকের সঙ্গে নরনারায়ণের অধিকতর সাদৃশ্য। গিরিশ কালাপাহাড় চরিত্রে আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন—চিন্তামণি তার পথের দিশারী। 'নরনারায়ণে' কর্ণ চরিত্রে ক্ষীরোদ প্রাসাদ নিজ চিত্ত-প্রতিকৃতির সম্মুখে স্থাপন করেছেন কৃষ্ণকে—আত্মোপলব্ধিতে কাহিনীর উপসংহার। শ্রীকৃষ্ণের ভাবসমাধি ও ব্যুত্থান দৃশ্যে নাট্যকার রামকৃষ্ণ-জীবনের এমন একটি দিক উপস্থিত করেছেন যা গিরিশচন্দ্রেও অনুপস্থিত। এই ভাবসমাধি নাট্যকারের নিজস্ব সংযোজন —মহাভারতে কৃষ্ণের ভাব-সমাধির কোনো উল্লেখ নেই।

স্বামী শিবানন্দকে উৎসর্গীকৃত এই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল "এক দৈবনিগৃহীত পূর্ণ শক্তি-ধর মহাপুরুষের জীবন কাহিনীর উপস্থাপনা। কিন্তু নাটক রচনার সময় নাট্যকারের উদ্দেশ্য দ্বিধাবিভক্ত। সমাপ্তির পূর্বে দৈব নিগৃহীত কর্ণ কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দেবতারূপে সম্বোধন করেছে এবং এই উপলব্ধি নাটককে শান্তরসে পরিসমাপ্ত করেছে। কৃষ্ণ চরিত্রের প্রাধান্যে কর্ণের সম্ভাব্য ট্র্যাজেডি ম্লান। নাট্যকার কৃষ্ণ চরিত্র অবলম্বন করে একটি স্বতন্ত্র নাটক রচনাও শুরু করেছিলেন কিন্তু তা অসমাপ্ত থেকে যায়। "মৃত্যুর ২।১ দিন পূর্বে (জুলাই-১৯২৭) তিনি বলিয়াছিলেন 'কৃষ্ণ চরিত্র যতই উপলব্ধি করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি যে "কৃষ্ণ" চরিত্র এ পারে লিখিবার নহে।" (১২) উপলব্ধির প্রত্যক্ষ উপাদান শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র। নাট্যকার কর্ণের ভাগ্য বিড়ম্বনার মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন—কিন্তু তাঁর জীবনেও দৈববিড়ম্বনার বেদনাকে অতিক্রম করে এক পরম প্রাপ্তির তৃপ্তি দেখা দিয়েছে। কর্ণের কণ্ঠে যেন স্বয়ং নাট্যকারই বলেছেন :

কর্ণ—তুমি ভগবান।
কৃষ্ণ—ওকি কথা ভাই
মানুষ কি হয় ভগবান ?
কর্ণ—ভগবান হয় ভগবান।
কিন্তু ভাই—ভগবান যদি ইচ্ছা করে (অধরে হস্তদান)
এই মত—প্রাণাধিক, ঠিক এই মত
মূর্তি ধরে।

কৃষ্ণের সমাধিভঙ্গের পর দ্রৌপদীকে বার বার নমস্কার শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অতি-পরিচিত ভঙ্গিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় :

—"তবে লহ মোর নমস্কার।
নমস্কার! জান না কি নমস্যা আমার
তুমি? তবে? আবার নমস্কার।"—

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক 'বঙ্গে রাঠোর'।

রতিলাল সরদিয়ার জমিদার। তার গোপাল মন্দিরের চূড়া জায়গীরদার সাদী খাঁর বেগমমহলে কিরণ নিক্ষেপ করে, এই অজুহাতে প্রধান চূড়াটি ভেঙে দিল সাদী খাঁ। নিরুপায় রতিলাল প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করে দেশ ত্যাগ করে এবং ধর্মত্যাগ করে হলো সাবাজ। বাইশ বছর পরে সে ফিরে এলো সরদিয়ায়। শুনলো, সাদী খাঁ গোপাল মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছে। সরদিয়ার রায়দীঘির গোপাল-মন্দিরে এক গোপাল ভক্তফকীর থাকে—নাম, নসীর মামুদ। এই নসীর মামুদ চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় চিন্তার প্রকাশ :

"নসীর মামুদ—ঠিক হয়েছে - ঠিক হয়েছে। গোপাল, তারা তোমার এই অপূর্বকারু-কার্যময় মন্দিরের মধ্যচূড়া ভেঙে দিয়েছে। ঠিক হয়েছে! তারা অজ্ঞ, তারা কি জানে? তুমি তো কৃপা করে তাদের দেখাও নাই যে, তোমার নিত্যমন্দিরের চূড়া ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশ ভেদ করে চলে গেছে।···তুমি তো তাদের কৃপা করে শোনাও নাই চিন্ময় নাম--চিন্ময় ধাম—নামের বেষ্টনে অনন্ত রূপের লীলায় তুমি দুনিয়াকে মোহিত করে রেখেছ। তারা ত জানে না—অনন্ত মত তোমার কাছে পৌঁছিবার অনন্ত পথ। তোমাকে না জেনে তারা অজ্ঞ বালকের মত পথ নিয়েই মারামারি করছে। সেই মোহের বশে হজরতের উপদেশের মর্ম বিস্মৃত হয়ে ফকীরী ধর্মের অঙ্গে আজ তারা বাদশাহী বিলাসিতার আবরণ দিতে ব্যগ্র হয়েছে। তার ফলে পরধর্মের প্রতি দ্বেষ আজ স্বধর্মের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করেছে।···কিন্তু লীলাময়, জীবের এই ক্ষণ-ভঙ্গুর লীলামধ্যে আমি তোমার এক অপূর্ব মধুময়ী লীলার আস্বাদ পাচ্ছি। আমার মন বলছে, এই পাঠান মোগলের পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষের কেন্দ্র মধ্যে তুমি এক অপূর্ব মিলনগান শোনাবার জন্য—এ গোলাম দরবেশকে তোমার মন্দির পার্শ্বে টেনে এনেছ।"—

নসীরের কাছে রতিলাল-পুত্র জৈনুদ্দিনের জিজ্ঞাসা

—"ওগো, কেমন করে তাকে পাব?

"নসীর—তা বলতে পারি না। গোপালের অহেতুকী করুণা।···সাধু মুখে শুনেছি

পেতে হলে তাঁর নাম বীজ লয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ডাকতে—ডাকতে—ডাকতে তাঁর কৃপা হলে তাঁকে পাওয়া যায়।

"জৈনুদ্দিন—সে নাম-বীজ কেমন করে পাব? দাও হজরত বলে দাও—তুমি জান—তুমি জান। বাঃ—বাঃ! এই যে আমি পেয়েছি—এই যে আমি পেয়েছি (নসীর-মামুদকে বেষ্টন) তোমাকেই যে গোপাল দেখছি। গোপাল! গোপাল!!

"নসীর—তাই তো গুরু, গোলামকে কি বিচিত্র লীলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলে! অরূপের সন্ধানে আমি দুনিয়া ঘুরে এলুম—আমাকে কিনা এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দিলে।" (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

ক্ষীরোদ প্রসাদের 'উল্‌পী' নাটকের সংলাপের অংশ :

"নারদ—বাসুদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুর আর তোমাকে দেখতে পাইনা কেন? ঠাকুর হেসে বললেন, নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে নেই, যোগীর হৃদয়ে নেই। যেখানে আমার ভক্ত—আমি সেইখানে আছি। যেখানে ভক্ত, সেখানে আমায় অন্বেষণ কর, আমাকে দেখতে পাবে। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই ভগবান।" (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

শ্রীরামকৃষ্ণের বহু উদ্ধৃত একটি কথা মনে পড়ে :

"তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাস স্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" (১২)

বিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব ও পরিণতিই যেন 'মিডিয়া' নাটকে বিজ্ঞানসাধক জিবার চরিত্রে পরিস্ফুট। জিবার জড় প্রকৃতির সাধনায় পাঁচ বছর লোকজীবন থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিল। প্রত্যাবর্তনের পর জানতে পারল—বন্ধু নিহত, রাজ্য আলমনসুরের হস্তগত। বন্ধু-কন্যা মিডিয়ার সাহায্যে সে প্রতিশোধ নিতে চায় কিন্তু আলমনসুরের প্রতি মিডিয়ার অনুরাগ তার অভীপ্সিত পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জিবারের নতুন উপলব্ধি :

"আগে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পেরেছি, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি জড়া-প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধুবর্ষণ করেন।.....মাতৃরূপে সর্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে জগতে শান্তি বিতরণ করেন।" (১৩)

'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়-নিবন্ধে সম্পাদক লিখেছেন "ক্ষীরোদ-প্রসাদের সমস্ত জীবন সাহিত্য সাধনার একটি অখণ্ড অনবদ্য ছবি। কিন্তু তাঁহার

কাব্যজীবনের অন্তরালে যে অধ্যাত্মজীবন ছিল, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ জানিতেন না। তিনি আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে কতবার আমাদের বলিয়াছেন, 'মায়ের কৃপায় আমি অভয় পেয়েছি। সংসারে পুনরাবর্তে আমায় আর আসতে হবে না।" (১৪)

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল যে-যুগে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-যুগে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের মতো দ্বিজেন্দ্রলালের ওপরে ও সে প্রভাব এসে পড়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোনো পরিচয় চোখে পড়ে নি।

১৯ জুলাই ১৮৬৩, কৃষ্ণনগরে এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল এম. এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করার জন্যে বিলাত যান। এই বিলাত যাত্রার ফলে যেমন আমাদের নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলাব সুযোগ তিনি পান তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে যে সামাজিক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁর মন শুধু বিরূপ হয়ে ওঠে নি—হিন্দুসমাজ ও তৎকালীন ধর্মনেতাদের প্রতি তিনি উদাসীনও হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম জীবনে 'একঘরে' (১৮৮৯) রচনায় তাঁর তাৎক্ষণিক ক্ষোভ অত্যন্ত তীব্রভাবে ব্যক্ত। এই রচনায় হিন্দুসমাজের ওপর তাঁর কশাঘাত নির্মম হয়ে উঠেছে :

"হিন্দুসমাজ পচিতেছে—

"পৃথিবীর লজ্জা মনুষ্য জাতির আবর্জনা, প্রতাড়িত পদাহত হিন্দুসমাজ—আজ পচিতেছে।

"জীর্ণ শীর্ণ ভাঁড় হিন্দুসমাজ—আজ পচিতেছে।

"শঠতার ভাণ্ডার, মিথ্যাকথার ওস্তাদ, লুকোচুরির সর্দার, ভীরুতার সেনাপতি হিন্দু-সমাজ আজ পচিতেছে—

"এ মিথ্যা, এ প্রতারণা, এ ভাঁড়ামি, এ নির্মমতা, এ নির্বিবেকতা, সে পচার দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু।" (১৫)

'এমন ধর্ম নাই' নামক হাসির গানে ধর্মের ও ধর্মনেতাগণের প্রতিও কটাক্ষ—অবশ্য তা সমাজকে আক্রমণের সূত্রেই :

"ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর হো !

কার্তিক গণপতি—
আর দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী
লক্ষ্মী সরস্বতী—
আর শচী উষা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি যম ;
সবই আছে হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম ?
(কোরাস) ছেড়ো না ক এমন ধর্ম
ছেড়ো না ক ভাই
এমন ধর্ম নাই আর দাদা এমন ধর্ম নাই।...
ঐ কৃষ্ণ রাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর
হন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার ;
ব্যস—বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর
ছেড়ো না ক...ইত্যাদি (১৬)

অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সরল, উদার, আবেগ-প্রবণ মানুষের পক্ষে এই মনোভাব রক্ষা করা স্বাভাবিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের পথে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন—এবং সেই মুক্তি তাঁকে এনে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণই। দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমারের 'স্মৃতিচারণ' ও দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য অবলম্বন করে তাঁর পরিবর্তনের পটভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে গিরিশ-রচনাবলীর (সংসদ সংস্করণ) ভূমিকায় ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "যশস্বী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের স্বভাবতই রেষারেষি ছিল।" ডক্টর ভট্টাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির একটি মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন "গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজুবাবুর সদ্ভাব ছিল না।" অবশ্য শেষের দিকে যে উভয়ের মধ্যে হৃদ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দেবকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রজীবনী থেকে তার উপযুক্ত সাক্ষ্যও তিনি উপস্থিত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশ প্রতিভাকে অস্বীকার করেন নি। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন অপরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর গ্রন্থে (পৃঃ ৬২)। স্টারের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় দ্বিজেন্দ্রলাল 'মিনার্ভা'য় এলেন 'রাণা প্রতাপ'-এর অভিনয়ের জন্যে—গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভায়। হঠাৎ স্থির হলো স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 'মিনার্ভা'-তেও 'রাণা প্রতাপ' অভিনয় হবে। রিহার্সালের সময় দ্বিজেন্দ্রলালও উপস্থিত।"

"রিহার্সাল আরম্ভের পূর্বে গিরিশচন্দ্র রায়মহাশয়কে [দ্বিজেন্দ্রলাল] বলিলেন 'রিহার্সাল তবে আপনিই আরম্ভ করুন। আপনার লেখা আপনি পড়িয়া দিন।' দ্বিজুবাবু বলিলেন—'সে কি কথা ? যেখানে আপনি ও অর্ধেন্দুশেখর উপস্থিত, সেখানে আমি কি রিহার্সাল দিব ? আপনিই রিহার্সাল দিন, আমি বরং শুনি।"

কিন্তু অনেক সময় প্রতিভাবান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি চক্র গড়ে ওঠে, যার স্তাবকতাকেন্দ্রীয় মানুষটিকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে। এ বিভ্রান্তি থেকে তিনি সহজে বেরিয়ে আসতে পারেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখন গিরিশচন্দ্র পূর্ণশক্তিতে বিরাজিত। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালকে তাই গিরিশ-বিরূপ করে তোলা সহজ ছিল এবং সেই সহজ-পথেই দ্বিজেন্দ্র-সুহৃদেরা অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ দেখা দিল দ্বিজেন্দ্র-ভাগিনেয় বাণী বিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর। নির্মলেন্দু তখন ছাত্র, কলকাতায় এসেছেন কলেজে পড়তে—থাকতেন মাতুলালয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। পিত্রালয়ের ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ নির্মলেন্দু কলকাতায় এসে গিরিশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। নাট্যকার অভিনেতার অন্য এক পরিচয়ে মুগ্ধ নির্মলেন্দু তাঁকে মনে মনে প্রতিষ্ঠা করলেন গুরুর আসনে।

বন্ধুবৎসল দ্বিজেন্দ্রলালকে ঘিরে যে চক্রটি গড়ে উঠেছিল তারই এক জনের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে নির্মলেন্দুর প্রত্যক্ষ বাদানুবাদের নালিশ গেল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। বন্ধুর অপমানে দ্বিজেন্দ্রলালের ধৈর্যচ্যুতি হলো, ফলে নির্মলেন্দু এক তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। সেদিনকার ঘটনার বিবরণ শোনা যাক দিলীপকুমারের কাছ থেকে :

"দেখলাম পিতৃদেবের মুখ গম্ভীর। নির্মলদাকে [নির্মলেন্দু লাহিড়ী] দেখেই বললেন —তুমি অমুককে অপমান করেছ ?

"নির্মলদা (রুখে উঠে) তিনি আগে আমাকে অপমান করেছেন।

"পিতৃদেব—না। তিনি বললেন, তোমাকে তিনি কিছুই বলেন নি।

"নির্মলদা—গিরিশবাবু সম্পর্কে ঠেস দিয়ে কথা—

"পিতৃদেব—সে তাঁর মত—তার জন্যে তুমি তাকে যা-তা বলতে পার না। তিনি আমার বন্ধু মনে রেখো। আর শোনো নির্মল, তোমার বাবা তোমাকে আমার এখানে পাঠিয়েছেন পড়াশুনো করতে। আমি চাই না তুমি থিয়েটারী দলে মেশো।

"নির্মলদা—গিরিশবাবুর কাছে আমি যাই থিয়েটারী দলে মিশতে না—সৎকথা শুনতে।

"পিতৃদেব—(উচ্চস্বরে) কথার উপরে কথা কোয়ো না। শোনো এখানে যদি থাকো

আমার কথা শুনতে হবে।" (১৭)

জেদী নির্মলেন্দু নিজের অন্তরের কথা শোনার তাগিদে মাতুলালয় পরিত্যাগ করে এক সস্তা মেসে গিয়ে উঠেছিলেন—সেই সঙ্গে মাতুলের কথা শোনার দায় থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। যাবার সময় রেখে গিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে তীব্র ভাষায় লেখা একখানি চিঠি, যার শেষ ক'টি কথা হলো :

"I love Girish Babu, I adore Girish Babu, but I am sorry I can't say the same about your flawless friends—who are not fit to lace his shoes…" (১৮)

এই ঘটনায় দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে দেখা দিল এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া। গিরিশচন্দ্র। নাটক লেখে—থিয়েটার করে। তার জন্য একটা আঠার-উনিশ বছরের ছেলে তার নিরাপদ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, দীর্ঘ আত্মীয়তার আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে পারে কেমন করে, যদি মানুষটির অন্য কোনো আকর্ষণ না থাকে? কোথায় যেন দ্বিজেন্দ্রলালের একটা ঠিকে-ভুল হয়েছে। গিরিশচন্দ্রকে নির্মলেন্দু গুরুরূপে বরণ করেছে একথা আগেই তিনি শুনেছিলেন দিলীপকুমারের কাছে—বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু আজ আর অবিশ্বাস করার মতো কিছু পেলেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র—গুরু!! কিসের গুরু? কি তার পরিচয়?

পরিচয়টা উদ্ঘাটন করলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। মাঝে মাঝে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ি 'সুরধামে' আসতেন। সেদিনও গিরিশচন্দ্র এলেন, কিন্তু যাবার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তাঁর নতুন পরিচয়ের ছাপ মুদ্রিত করে দিয়ে গেলেন। সেদিন খোলাখুলি আলোচনায় তাঁদের এতদিনের মনের মালিন্য ঘুচে গেল। অভিভূত দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রকে বললেন, "আপনি তো আমাদের গুরু। বাস্তবিক আপনাকে অনুসরণ করেই তো এই যা দু'একখানা নাটক লিখতে শিখেছি।…আপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বিশ্বাস করবো সে কি সম্ভব?" (১৯)

নটগুরু, নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র নিশ্চয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের গুরু। কিন্তু আরো এক গিরিশ আছেন, তাঁকেও দ্বিজেন্দ্রলাল চিনলেন সেই দিন। দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপকুমার রামকৃষ্ণ-ভক্ত, সেই সূত্রে গিরিশচন্দ্র তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। গিরিশের ভক্তিনম্র হৃদয় দ্বিজেন্দ্রলালকে স্পর্শ করলো। তিনি জানতেন, পুত্র দিলীপ নির্মলেন্দুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যায়, বেলুড় যায়, কিন্তু সেখানকার মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে যিনি আছেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে গভীরভাবে কিছু জানবার ইচ্ছা হয় নি তাঁর।

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের মতো দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থেকে নাটক লেখেন নি—তাই তাঁর পরিচয়ও ঘটে নি বঙ্গরঙ্গমঞ্চ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। আজ নট-

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র শুধু নিজের নতুন পরিচয় তাঁকে দিয়ে গেলেন না, সেই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন মঞ্চগুরুকেও। নির্মলেন্দুর গৃহত্যাগের প্রকৃত মর্ম আজ তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল। আর ঠিক এই সময়ই দিলীপকুমার পিতার হাতে তুলে দিলেন—এ যুগের গীতা—'কথামৃত।'

সেই 'কথামৃত' পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশকে আরো স্পষ্ট করে বুঝলেন—গিরিশের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয়ও হলো স্পষ্টতর।

সেই সময়ই তাঁর সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত। রক্তের চাপ পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা প্রমাদ গণলেন।—অবসর নেবার পরামর্শ দিলেন। সেই দুর্যোগের অন্ধকারের মধ্যে 'কথামৃতে'র অগ্নিকণা তাঁর কাছে পৌঁছে দিল আলোর সন্ধান। পুত্রের সঙ্গে এই সময়কার সংলাপের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করি দিলীপকুমারের রচনা থেকে :

"[দিলীপকুমার]—শ্রীম-কে দেখে এলাম বাবা।

"পিতৃদেব (হেসে)—কে, তোর ঠাকুরের বসওয়েল ?—বেশ, বেশ। বল কি হল ?

"আমি (হেসে) নির্মলদার সঙ্গে কাল হঠাৎ তর্ক বাধল। আমি পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি বটে—আরো সেদিন আপনার ভরসা পেয়ে—

"পিতৃদেব—রোস, রোস, আমার ভরসা মানে ?

"আমি—বাঃ আপনি সেদিন বলেন নি যে, পরমহংসদেব সাধু একথা জলজ্যান্ত সত্য, যেমন সত্য—ঐ দোরটা দোর।

"পিতৃদেব (প্রসন্ন) বলেছি, আর বলার পরে কথাটা শুধু যে ফিরিয়ে নেব না তাই নয় আরো একটু জুড়ে দেব—তাঁর ভাবে-ভোলা ছবি দেখলে মনে না হয়েই পারে না যে তিনি মহাপুরুষ।...

"আমি (সংক্ষেপে)—আমি বলি, তিনি মহাপুরুষ, অপাপবিদ্ধ সবই মানি কিন্তু তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান এ-এ গোঁড়ামি নয় ? বলুন তো ?

"পিতৃদেব (হেসে)—কী করে বলি বল ? আমার চোদ্দপুরুষেও কেউ ভগবানকে চর্মচক্ষে দেখেনি যে রে।

"আমি (চমকে গিয়ে বিজ্ঞভাবে)—তা বটে, তবে কি বলবো—আমার বলা উচিৎ নয় যে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান হতে পারেন না ?

"পিতৃদেব—নিজের ধারণা বলবি না কেন ? তবে বেশি জোর করে বলা ভালো নয় তিনি কি হতে পারেন আর কি হতে পারেন না। তবে এ আমার কথা নয় বাবা। সেদিন তোর দেওয়া 'কথামৃতে'ই পড়েছিলাম—যাকে পরমহংসদেব বলতেন মতুয়ার বুদ্ধি, আর পড়ে একটু চমকে উঠেছিলাম।" (২০)

আর একদিনের কথা।

'সুরধামে' গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র মিলনের সময় গিরিশচন্দ্র তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁর নতুন নাটক 'শঙ্করাচার্য' দেখবার জন্যে। দ্বিজেন্দ্রলাল সপুত্র গেলেন নাটক দেখতে। দিলীপকুমারের সেদিনের অভিজ্ঞতা :

"নাটকটি দেখতে দেখতে তাঁর মুখ-চোখের ভাব দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। থেকে থেকে কেবল 'আহা-আহা' আর দ্বিতীয় উক্তি নেই। মনে আমার কী যে পুলক জেগে উঠল।...কথামৃতের বটিকাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে অবধারিত।" (২১)

দিলীপকুমারের দেওয়া 'কথামৃত' ছাড়াও যে তিনি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছ থেকে ঐ একই বই এবং রামকৃষ্ণ জীবনী গোপনে সংগ্রহ করে পড়েছেন তা' জানতে পারা যায় দেবকুমারবাবুর সাক্ষ্য থেকে :

"এই সময়ে তিনি যথার্থ ভগবদ্‌জন—সাধু মহাত্মা ও ভক্তদের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়েন। পরমারাধ্য ভক্ত-ভগবান শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং সিদ্ধদেবতা পরমহংস রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে তিনি এই সময় যে কতদূর ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন—আমি নিজে তাহার অনেক পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি গোপনে সাধারণ বন্ধুদের অগোচরে, উক্ত মহাপুরুষদের অমূল্য জীবনী, উপদেশ ও কথামৃত অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত, বহুবার আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাঠ করিয়াছেন।"(২২)

'সাধারণ বন্ধুদের' কাছে ধরা না-দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রলাল ধরা পড়ে যেতেন, এমন একটি ঘটনার কথাও দেবকুমারবাবু উল্লেখ করেছেন :

"কথায় কথায় সেদিনও খুব তর্ক জমিয়া উঠিল ; কিন্তু আশ্চর্য এই—আগে যেমন হার্বার্ট স্পেন্সারের Eternal Energy [ইটারন্যাল এনার্জি] ছাড়া ভগবানের আর কোনো সত্তার অস্তিত্ব স্পষ্টতই অস্বীকার করিতেন, সেদিন আর ততদূর গেলেন না। বরং মুখে বার বার 'মানি না' 'জানি না' এই রকম নানা কথা বলিলেও শেষে, যেই আমি কোন কোন মহাপুরুষ বা মহাত্মার উক্তি তাঁহার সমক্ষে উত্থাপিত করিলাম অমনই তিনি আর কোনোরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, সহসা লাফাইয়া উঠিয়া চিরঞ্জীব শর্মার সেই

"আমি চিনি না, জানি না, বুঝি না, তথাপি তাঁহারে চাই
আমি সজ্ঞানে, অজ্ঞানে, পরাণেরি টানে কারপানে ছুটে যাই—

এই অনুপম মধুময় গানটি তারস্বরে গাইতে সুরু করিয়া দিলেন।" (২৩)

কথামৃত, রামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ মন্থনের এই পটভূমিকায় শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখেছেন মাত্র তিনখানি। দু'খানি সামাজিক নাটক—'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' এবং অপরটি পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম'। 'এমন ধর্ম নাই' নামক হাসির

গানে যে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গ করেছিলেন :

"যদি চোরই হও কি ডাকাতই হও
তা গঙ্গায় দাও গে ডুব
আর গয়া কাশী পুরী যাও সে
পুণ্যি হবে খুব—"

তিনিই 'ভীষ্ম' নাটকে লিখলেন :

"পতিততোদ্ধারিণী গঙ্গে
শ্যামবিটপীঘন তটবিপ্লাবিনী
ধূসর তরঙ্গভঙ্গে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি। জাহ্নবি! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনী গঙ্গে।"

তাঁর এই পরিবর্তন সম্পর্কে দিলীপকুমার লিখেছেন : "তাঁর হাতে তখন বিস্তর কাজ। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা বেরুবে, তিনি 'ভারত আমার, ভারত আমার' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' জাতীয় গান ও প্রবন্ধ লিখছেন। তবু আমার উপরোধে 'কথামৃত' দু'খণ্ড পড়ে ফেললেন। ঠিক এর পরেই তিনি কয়েকটি অপরূপ শরণাগতির গান বাঁধেন।..."

"পরিহরি ভব দুঃখ মা
শায়িত অন্তিম শয়নে..."

দিলীপকুমার এই স্তবকটি যখন গাইতেন তিনি নিজেও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন কারণ এর মধ্যেই শুনতে পেতেন অনিবার্যের পদধ্বনি। তিনি লিখেছেন : "সঙ্গে সঙ্গে মনে হতো যে পিতৃদেবও টের পেয়েছিলেন তাই বুঝি তাঁর বিখ্যাত 'নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো' গানটিতে দিনের শেষে চেয়েছিলেন মায়ের কোলে পরম শরণাগতি :

সাঙ্গ আমার ধুলা খেলা
সাঙ্গ আমার বেচাকেনা
দিইছি করে হিসেব নিকেশ
যাহার যত পাওনা দেনা।
এখন বড় ক্লান্ত আমি
ওমা কোলে তুলে নেনা

যেখানে ঐ অসীম সাদায়
মিশেছে ঐ অসীম কালো।" (২৪)

গানটির সঙ্গে একটি কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবিতাটি স্বামী বিবেকানন্দের "My play is done" :

"Open the gates of light, O Mother, to me Thy tired son···
Take me, O Mother, to those Shores
where strife for ever cease ;
Beyond all sorrows, beyond tears,
beyond e'en earthly bliss ,···
Let never more delusive dreams
veil off thy face from me.
My play is done, O Mother,
break my chains and make me free ! (২৫)

দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব এই সঙ্গীতগুলি কত সহস্র প্রাণকে উদ্বেল করেছে আমরা সবাই জানি—অনেক সময় এই সব গানগুলির মধ্যে দিয়েই তিনি অনেকের কাছে পরিচিত কিন্তু আমরা কি জানি, এগুলির পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কতখানি ? তাঁর পুত্রের সাক্ষ্যের চেয়ে জোরালো প্রমাণ আর কি হতে পারে ? দিলীপকুমার লিখেছেন : "এই সময় তাঁর আর একটি কথা মনে পড়ে পরমহংসদেব সম্পর্কে। বোধ হয় মা'র ছেলে মা-র কোলে ফিরবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন বলেই তিনি আমাকে বলেছিলেন সহজ উচ্ছ্বাসে 'ওরে কথামৃত পড়লে মনে সন্দেহ থাকে না যে তিনি ছিলেন নিখাদ সোনা।" (স্মৃতি-চারণ—২০৭)

'ভীষ্ম' নাটকের আরও একটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের কাছে চাণক্যের মাতৃ-প্রশস্তি কূটনৈতিক কৌশলমাত্র, কিন্তু 'ভীষ্ম' নাটকের মাতৃপ্রশস্তি গভীরতর উপলব্ধির সংবাদ বহন করে আনে। অম্বার মধ্যে মাতৃচেতনার উদ্বোধনে ভীষ্মের উক্তি :

তুমি কি বুঝিবে ?
মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে ?
কত অর্থ যাহা কোনো অভিধানে নাই,
কত সুধা যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে ;
কণ্টক-শয্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়
যবে মা বলিয়ে ডাকে—অর্ধেক যন্ত্রণা
যেন সে অমৃতহ্রদে গলে যায়।

মাতৃনামে পশু বশ হয়। মাতৃনাম
শোকতপ্ত বক্ষস্থল সুশীতল করে ;
শ্রবণবিবরে বর্ষে স্বর্গের সঙ্গীত।
মাতৃনাম আনন্দবিহ্বল রসনায়
জড়াইয়া যায়। ইহা তপ্ত ওষ্ঠাধরে
বিকম্পিত হয়। ইহা বায়ুর উপরে
নৃত্য করে। মাতৃনামে ধরণী পবিত্র হয়।
মাতৃনামে ধন্যা হন স্বয়ং ঈশ্বরী।" (তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য)

আরও প্রত্যক্ষভাবে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তিনি 'পরপারে' নাটকে। 'পরপারে'র মঞ্চ সাফল্য ও নাটকীয় সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে উঠেছেও ; কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-মানসের বিবর্তন এ-নাটকে যে-ভাবে ধরা পড়েছে, তা অন্যত্র ততখানি স্পষ্টভাবে দেখা যায় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রথম সামাজিক নাটক (অবশ্য 'বঙ্গনারী' পূর্বেই লিখিত হয়েছিল —প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে)। 'পরপারে' নাটকে এমন একটি নারী চরিত্র প্রাধান্য লাভ করলো যা তাঁর এতদিনের ধারণাকে অতিক্রম করে গেছে। 'পরপারে'র শান্তা বারবনিতা। সেই শান্তা-চরিত্রের মহত্ত্ব ও পরিবর্তন দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে দেখিয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত বারবনিতা সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করে এসেছেন 'কথামৃত' পাঠের পর তার পরিবর্তন ঘটেছে। দেবকুমার রায়চৌধুরী সাক্ষ্য দিয়েছেন :

"প্রথম প্রথম রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাঁর যেরূপ ধারণাই থাক না, শেষ বয়সে আমরা দেখিতেছি যে, তিনি এ দেশীয় সামাজিক অবস্থানুসারে এই সব পতিতা রমণীর দ্বারা অভিনয় করানো অপরিহার্য ও এক হিসাবে উচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিতেন সংক্ষেপে তাহার মর্ম এই যে, আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থানুসারে এই ব্যবস্থা শুধু যে অনিবার্য তাহা নহে— এই সব অভাগী রমণীদের পক্ষেও হিতকর বটে। সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থার নরনারীর মধ্যেই ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। এই সব অসহায়া পতিতাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অনুতপ্ত কিংবা সৎভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত রঙ্গালয় তাহাদের জীবিকার্জনের একটা উপায় করিয়া দিয়া বরং অতি উদার ও সঙ্গত, সাধু কর্তব্যই সম্পন্ন করিতেছে।...তিনি স্বীয় জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন 'বরং থিয়েটারে গিয়া ভালো বইয়ের অভিনয় দেখিলে লোকের মন তাহাতে উন্নত ও পবিত্র হয়। আমি নিজে ভুক্তভোগী ; তাই এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি। 'চৈতন্যলীলা' 'বিল্বমঙ্গল' 'নন্দবিদায়' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' 'প্রফুল্ল' 'স্বর্ণলতা' 'বলিদান' প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়া নিজের মন যে কত মার্জিত, পবিত্র, উন্নত হইয়াছে,

তাহা মনে করিলে আজও আমার উপকার হয়।" (২৬)

বারবনিতা সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং থিয়েটারের লোক-শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধীয় অভিমত সমকালীন চিন্তার বিরোধী—'কথামৃত' ও রামকৃষ্ণ জীবনী-পাঠের ফলেই যে তাঁর সুদৃঢ় মতামত গড়ে উঠেছে, এ কথা সুনিশ্চিত ভাবে মনে করা যায়। এই উদার দৃষ্টির আলোতেই তিনি দেখেছেন শাস্তাকে।

শাস্তার মানসিক পরিবর্তনের আকস্মিকতা নিয়ে একদা শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন "তোমার বাবা তাদের সঙ্গে ঘর করেন নি তো, তাই জানবেন কেমন করে যে গণিকারা ঠিক ও ভাবে বদলে যায় না।" দিলীপকুমার সে কথা মেনে নিয়েছেন। (২৭) কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যে জেনেছেন "হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যখন আলো আসে তখন একটু একটু করে আসে না।"—এ কথা সব মানুষের পক্ষেই সত্য এবং গণিকাদের মানবিক স্বীকৃতি দিতে তাঁর কুণ্ঠা নেই আর।

কিন্তু শাস্তা চরিত্র কি সত্যই অসম্ভব?

অভিনেত্রী সুশীলা সুন্দরীর অকালমৃত্যু—১৯ পৌষ ১৩২১। এটা কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়—স্মরণীয় সাল তারিখও নয়। অভাবনীয় হলো, তাঁর মৃত্যুতে থিয়েটার-দর্শকেরা শোকগাথা লিখে, ছাপিয়ে, মিনার্ভা থিয়েটারে বিলি করলেন দর্শকদের মধ্যে। একজন দর্শক, বিভূতিভূষণ ঘোষাল তাঁর শোকোচ্ছ্বাসে লিখলেন :

কলঙ্কতমঃ করিয়া বিনাশ
পুণ্যের আলো জ্বলিত প্রাণে
অনলশুদ্ধ স্বর্গের মতো
হৃদয় তাহার কষিত শানে।..
কবির লেখনী তাহার চরিত
গেছে চিরতরে অমর করি
'শান্তা'র সেই পবিত্র কথা
অঙ্কিত তারি চিত্র ধরি—
পতিতা হয়েও সতীর মহিমা
গিয়াছে দেখায়ে আপন কাজে
বঙ্গের প্রতি গৃহে গৃহে আজি
অতুল তাহার কীর্তি রাজে। (২৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর গিরিশচন্দ্র মঞ্চত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। নিষেধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—বলেছিলেন, 'না-না, ও বেশ আছে—ওতে অনেকের উপকার হচ্ছে।' গিরিশচন্দ্র পরে এ কথার তাৎপর্য বুঝেছিলেন। সেকালের রঙ্গমঞ্চের পতিতা

অভিনেত্রীদের জীবনের অনালোকিত দিকটির যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

শান্তা চরিত্র দুর্লভ হতে পারে—অসম্ভব নয়। যে উদার দৃষ্টি দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, সে দৃষ্টি তিনি লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে, যেখানে 'নিখাদ সোনা' 'অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ'-এর কৃপা থেকে পতিতা নারীও বঞ্চিত হয় নি। ঘৃণা দিয়ে নয়—করুণা দিয়েই তিনি তাদের জীবনে এনে দিয়েছেন নতুন আলোর সন্ধান। অনুপ্রাণিত দ্বিজেন্দ্রলাল শান্তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

"বেশ্যাদের ঘৃণা করবেন না। তারা বড় অভাগিনী। তাদের অনুকম্পা করুন। তাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, বন্ধু নাই। তারা যেন অন্ধকার রাত্রিকালে পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, দু'ধারে দেখতে পাচ্ছে দরিদ্রের কুটিরে আলো জ্বলছে ; দম্পতির প্রেমের মিলন-হাস্যের ফোয়ারা উঠেছে। শিশুরা স্নেহের নীড়ে নিদ্রা যাচ্ছে।···কোটি কোটি জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে তারাই লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর ন্যায় ছুটে চলেছে।···তারাই নিজেদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। তার ওপর আপনাদের ঘৃণা আর চাপাবেন না।" (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

সে যুগে সেই স্তূপীকৃত ঘৃণার মধ্যে থেকে তাঁদের "আনন্দময়ী মাতৃরূপে" দর্শন করে চৈতন্যলাভের আশীর্বাদ করেছিলেন একজনই—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

'পরপারে' নাটকে ভবানীপ্রসাদ চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের মানসবিবর্তনের সবচেয়ে জোরালো সাক্ষী। ভবানীপ্রসাদ শ্যামা-ভক্ত উদাসী মানুষ। মাতৃ নাম-গান করে সে শান্তি পায়, অপরকেও শান্তি দেয়। নাটকে তার গান তিনখানি :

(১) এবার তোরে চিনেছি মা
আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা
(এবার) পাঠিয়ে দিইছি যমের বাড়ি।···
ভবার্ণবে দিশাহারা
পাচ্ছিলাম না কূলকিনারা
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা
(অমনি) তারা বলে দিলাম পাড়ি।

(২) আর কেন মা ডাকছ আমায়
এই যে এইছি তোমার কাছে
নাও মা কোলে দাও মা চুমা
এখন তোমার যত আছে।

(৩) পেয়ে মাণিক হারালাম মা
আমি অতি লক্ষীছাড়া
আঁধারে পথ দেখতে পাই নে
কোথা আছিস দে মা সাড়া।

এ গানগুলি শুধু ভবানীপ্রসাদ চরিত্রকেই পরিস্ফুট করে নি—দ্বিজেন্দ্র হৃদয়কেও উদ্‌ঘাটিত করেছে। এ-গুলি তাঁর অন্তরমথিত প্রার্থনামন্ত্র।

'ভবার্ণবে দিশাহারা' দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের গোধূলি-লগ্নে পেয়েছেন 'ধ্রুবতারা'র সন্ধান। একদিনের একটি ঘটনা তার বড প্রমাণ। দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন:

"একদিন আমার বেশ মনে পড়ে 'পরপারে' নাটকের সদ্য রচিত একটি গান ('আর কেন মা ডাকছ আমায়—এই যে এইছি তোমার কাছে' ইত্যাদি) আমাকে শুনাইতে গিয়া কয়েক কলি গাইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল ভগ্নজড়িত স্বরে (স্বর চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে) একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলেন,...আমি তাঁহার অতখানি পরিবর্তন দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, কিছুক্ষণ তাই, আমারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না।" (২৯)

যে সদ্যরচিত গানখানি গাইতে গিয়ে সেদিন তিনি আত্মবিস্মৃত হযেছিলেন সে গানে ছিল তাঁরই আত্মআকুতি:

"...আঁধার ছেযে আসে ধীরে
বাহু দিযে নাও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি
মা তোমার ঐ বুকের মাঝে
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা
আর তো তোমায় ছাড়ব না মা
ওমা ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।"

এ সময় কালীঘাটে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের দেবীমূর্তির কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও উপস্থিত করেছেন জীবনীকার।

দেবকুমারবাবু লিখেছেন "তাঁহার পরপারে নাটকের সেই একমাত্র ভবানীপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো নাটকেই তিনি ভক্তির চিত্র অঙ্কন করিয়া যান নাই।" ভক্তিচিত্র না থাক, তাঁর জীবনের শেষ দুখানি নাটকেই ভক্তের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'পরপারে'র মধ্যে ভবানীপ্রসাদ তার ভক্তিকে উৎসারিত করেছে প্রত্যক্ষভাবে আর 'বঙ্গনারী'তে কেদার করেছে প্রচ্ছন্নভাবে। কেদার পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছে, নিজের সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে, পরের জন্যে কারাগার পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে

সে পাগল, কিন্তু তার পাগলামির মধ্যে আছে সারল্য ও নিষ্কাম কর্মের উজ্জ্বলতা। কারাগারে ঘানি ঘোরানোর সময় দূর থেকে ভেসে-আসা গানটি নাট্যকার ব্যবহার করেছেন তার অন্তর-প্রক্ষেপরূপে :

ঘোরো ঘোরো আমার ঘানি।
আমি শুধু চক্ষু বুজে কেবল টানি
—কেবল টানি।…
আমরা ভবঘোরে মর্ছি ঘুরে
কেন ঘুরি নাহি জানি
জন্মজন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে
প্রাণটা হেঁচড়ে টেনে আনি।
এ প্রাণের তবুও তো যায় না ক্ষুধা
কেন জানেন ভগবানই—
হোক,—তবু যদি তোমার
পানে চক্ষু থাকে
—তবেই ঘোরা ধন্য মানি।

ক্ষেপামির ঝোঁকে কেদার কখনো নাচে, কখনো বিচিত্র ভাষায় গালি দেয়, কখনো দোয়াত-কলম নিয়ে তখনই লিখে রাখে 'ঈশ্বর আছেন', পাছে ভুলে যায়, কখনো বা নিজেকে শাসন করে 'কেদার সভ্য হও'। সদানন্দ (অপর একটি চরিত্র) তার এই অ-সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পায় বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব। সে বলে :

"না কেদার ! সভ্য হয়ো না। বড় খাঁটি জিনিষ আছ। আগে এ রকম সরল গোঁয়ার ভট্টাচার্যি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষার সঙ্ঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তারই দু'এক টুকরো এখানে ওখানে পড়ে আছে।…এ জিনিস ভারতের নিজস্ব। পায়ে চটি জুতো, পরণে সাদা ধুতি,—শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি—মুখে সারল্যের জ্যোতি :—এ আর কোনও দেশে নাই।" (পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

"তোমার মহৎ হৃদয়ের গুণে পৃথিবী জয় করেছ, কেদার, পুরাণে অনেক চরিত্র পড়েছি, ইতিহাসও অনেক ঘেঁটেছি কিন্তু এরকম সরল, গোঁয়ার, ত্যাগী, অস্থির, সদানন্দ চরিত্র আর দেখিনি।"

একটি পাষণ্ড চরিত্রের শেষ উপলব্ধি :

"কেদারবাবু, ঋষি সংসারে যদি কেউ থাকে, ত আপনি। নিজের জন্য কখনও ভাবেন নি ; পরের জন্যেই ভেবেছেন।" (পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)

এ-রকম পুরাণ-ইতিহাস-বহির্ভূত ঋষি চরিত্র গিরিশচন্দ্রের রঙ্গলালের (ভ্রান্তি' নাটক—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচিত) কথাই মনে পড়িয়ে দেয় ; কিন্তু হিন্দুসমাজ-লাঞ্ছিত দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন যে সমাজকে অস্বীকার করে নিজের বেদনা ও বিদ্বেষে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যেই কোথায় পেলেন এমন চরিত্রের সন্ধান !

দ্বিজেন্দ্রলালের দু'খানি সামাজিক নাটকই তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। যে ঘরের বন্ধ দুয়ার থেকে একদিন তিনি অনেক বেদনা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন আসন্ন জীবন-সন্ধ্যায় সেই ঘরেই তিনি ফিরতে চেয়েছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন—এখানে শুধু নিষেধের অন্ধকারই সত্য নয়—মুক্তির আলো হাতে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য দুই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত হয়ে আছে। দিলীপকুমার লিখেছেন : "নির্মলদা ও আমার মাধ্যমে তাঁর ভক্তি জীবন কিছু খোরাক পেয়েছিল—তাঁর দৃষ্টি ঐ দিক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল পরমার্থিক আলোকে যার প্রধান উপজীব্য ভক্তিসুধার নিত্য রস।" (৩০)

দ্বিজেন্দ্রতনয়ের দুঃখ—"এই শ্রেষ্ঠ বিকাশের উষালগ্নেই—কাল তাঁকে আমাদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে গেল—নৈলে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতাম আরো কত অনুপম ভক্তির নাটক, শরণাগতির গান, মহৎ চরিত্র।" (৩১)

সে দুঃখ আমাদেরও।

উনিশ শতকের নবম দশক থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন প্রধানত গিরিশচন্দ্র—দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং কোনো কোনো দিক থেকেও অমৃতলালও। এই চার প্রধান পুরুষের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করলে দেখতে পাই, তাঁরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, যে-ভাবেই রামকৃষ্ণ-জীবন ও চিন্তার সংস্পর্শে আসুন না কেন, প্রভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। তবে প্রভাবের মাত্রা কোথাও কম, কোথাও বেশি। এ-যুগের অপ্রধান নাট্যকারদের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে। এখন কয়েকজন অপ্রধান নাট্যকারদের বিষয়ে আলোচনা শুরু করি।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবনে ও নাটকে :
অমরেন্দ্রনাথ—মনোমোহন—হারাণচন্দ্র

॥ ১ ॥

মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যপরিচালক ও নট হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যতখানি খ্যাতিলাভ করেছেন, নাট্যকার হিসাবে ঠিক ততখানি নয়। তাঁর মৌলিক নাটকের সংখ্যা বেশী নয়—এর মধ্যে প্রহসন ও গীতিনাট্য জাতীয় রচনারই প্রাধান্য। মঞ্চপ্রধান হিসাবে বা নাট্য-পত্রিকার পরিচালকরূপে অমরেন্দ্রনাথের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। ব্যক্তিগত জীবনে ও নাটকে এই প্রভাব স্বতই বিস্তৃত হয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১ এপ্রিল ১৮৭৬। চোরবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের দ্বারকানাথ দত্তের তৃতীয় পুত্র অমরেন্দ্রনাথ ১২ বছর বয়সে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "নসীরাম" নাটক দেখে থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হন। সখের থিয়েটার থেকে ক্রমশ পেশাদারী থিয়েটারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে 'ক্লাসিক থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতির ইতিহাসে অমরেন্দ্রনাথের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"তিনি [অমরেন্দ্রনাথ] ছিলেন কর্মবীর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, লোক চরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং দুর্জয় সাহস,—উন্নতি করিবার এই সকল সদগুণ তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়া পুরাতন প্রচলিত পন্থার অনুসরণ সর্বথা করেন নাই ; তখনকার থিয়েটারী ব্যবসায়ের যে ধারা, তাহা তিনি বদলাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যিনি লিখিবেন তিনি দেখিবেন—বাঙ্গলা নাট্যশালা বাহ্যিক ও আর্থিক সৌষ্ঠব ও উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী।" (১)

এক সময় দর্শক যে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে কি পরিমাণ মেতে উঠেছিল তা অমরেন্দ্রনাথের একটি অভিমত থেকেই বোঝা যায় : "আমার বিশ্বাস, আমি যদি বনে গিয়া থিয়েটার খুলি সেখানেও আপনাদের (দর্শকদের) সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।" ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে যুক্তভাবে মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। শেষ জীবনে স্টার থিয়েটারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং ১৯১৬ সালের ৬

জানুয়ারি মাত্র ৪০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অমরেন্দ্রনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ একাধিক নাট্যপত্রিকার প্রকাশ ও পরিচালনা। গিরিশচন্দ্রের সহযোগিতায় 'সৌরভ' পত্রিকা প্রকাশ ও পরে 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির' তাঁর নাট্যানুরাগের নিদর্শন।

ধনীর সন্তান অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটারী জীবন গৌরবময় হলেও পারিবারিক জীবন বিশেষ সুখের ছিল না। তাঁর আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ'-এ ব্যক্তিগত জীবনের স্খলন ও পতনের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় এক অভিনেত্রীর কুহকে পড়ে নিজের স্ত্রীর প্রতি অবহেলার জন্য তাঁর তীব্র অনুশোচনা। যখন পরবর্তীকালে সেই অভিনেত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর মোহ দূর হয়েছে তখন হারিয়েছেন নিজের প্রিয়তমা পত্নীকে। সেই মৃত্যু দৃশ্যটির বিবরণ অমরেন্দ্রনাথ রেখে গেছেন, এবং তা থেকে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ও কিছু আভাস পাই :

"মৃত্যুশয্যায় হেমনলিনী শায়িতা, যুগ্মনেত্র নিমীলিত,—সন্ধ্যার মন্দ পবন আসিয়া গৃহের দীপশিখাকে যেমন ধীরে ধীরে কম্পিত করে, সেই সতী সাবিত্রীর কমললোচনদ্বয় এক একবার অতি সন্তর্পণে সেইরূপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল ; মহিমার দর্পণ সুগঠিত ললাটে চন্দন-খচিত 'রামকৃষ্ণ'—জীর্ণ ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, আশাহীন, আলোকহীন, সুখহীন, শান্তিহীন বক্ষের উপর অমরেন্দ্রনাথের একখানি প্রতিমূর্তি"…(২)

অমরেন্দ্রনাথের 'অভিনেত্রীর রূপ' উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় হয় স্টার থিয়েটারে ২৬ ডিসেম্বর ১৯১৪। এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি প্রথম নাট্যমন্দিরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রাবণ—১৩২০ সংখ্যায় পরবর্তী মাসে উপন্যাসটি শেষ হবে বলে ঘোষিত হলেও শেষাংশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি—একেবারেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীর নায়ক নলিনী—স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ (অভিনয় কালেও তিনি এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিলেন)। এই কাহিনীর নাট্যরূপ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি—পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করেই নাটকের সম্ভাব্য চেহারা অনুমান করে নিতে পারি।

বাস্তব জীবন ও চরিত্রের ভিত্তিতে রচিত কাহিনীর শেষাংশ অমরেন্দ্রনাথের কল্পনা প্রসূত। পত্নীশোকে উদভ্রান্ত, তীব্র অনুশোচনা বিক্ষত নলিনী উপস্থিত হয়েছে সন্ন্যাসী বিমলানন্দের কাছে।

"বিমলানন্দ কহিলেন—'বৎস নলিনী। মহামায়ীর সম্মুখে উপবেশন কর।'

"আদেশ প্রতিপালিত হইল।

"চক্ষু মুদ্রিত কর।

"তাহাই হইল।

"বিমলানন্দ—'কি দেখিতেছ' ?

"নলিনী—'অন্ধকার'।

"বিমলা—কি দেখিতে চাও ?

"নলিনী কথা কহিল না।

"বিমলা—অভিনেত্রীর রূপ ?

"নলিনী কথা কহিল না।

"বিমলা—বুঝিয়াছি। অভিনেত্রীর রূপ লইয়া তোমার জীবনের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। বিশ্ব অভিনেত্রীর রূপ দেখাইয়া তোমার জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করাইব।

"নলিনী কথা কহিল না।

"বিমলা—মনে মনে তিনবার মা মা বলিয়া ডাক।

"প্রাণের সহিত মন মিলাইয়া দিয়া নলিনী ডাকিল 'মা মা, মা'।

"বিমলা—কি দেখিতেছ ?

"নলিনী—সংসার নাট্যশালা।

"বিমলা—নাট্যশালায় কোনও রূপ অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছ ?

"নলিনী—অগণন নরনারী নানা সাজে সাজিয়া নানারূপ অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে। অভিনয় মাত্র ! যবনিকা পড়িলে যে যার খেলা ভুলিয়া যাইবে।

"বিমলা—খেলা খেলাইতেছে কে ? তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ ?

"নলিনী—পাইতেছি।

"বিমলা—কে ?

"নলিনী—কালী করালিনী—কপালমালিনী—শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী **বিশ্ব অভিনেত্রীর** রূপ ধরিয়া চরাচরকে অভিনয় কার্য শিখাইয়া, রণরঙ্গিনী মূর্তিতে খড়্গ ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন।

"বিমলা—পদতলে বসিয়া পূজক ও সাধকরূপে **বিশ্ব অভিনেত্রীর** পদে কাহাকেও জবা তুলিয়া দিতে দেখিতেছ কি ?

"নলিনী—দেখিতেছি।

"বিমলা—কে তিনি ?

"নলিনী—**ভগবান রামকৃষ্ণ**।

"বিমলা—আর চিন্তা নাই, আজ হইতে তুমি নূতন পথের পথিক হইলে। এই আমি তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া তোমার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। আমার দিকে চাহিয়া দেখ।

"নলিনী এইবার চোখ চাহিল।

"বিমলানন্দ কহিলেন 'বল জয় ভগবান রামকৃষ্ণের জয়।'

"নলিনী—জয় ভগবান রামকৃষ্ণের জয়।

"বিমলা—জয় বিশ্ব অভিনেত্রী কালী করালীর জয়।

"নলিনী—জয় বিশ্ব অভিনেত্রী কালী করালীর জয়।" (৩)

'অভিনেত্রীর রূপ' উপন্যাসের একটি নারী চরিত্র চন্দ্রা। বাস্তবে ইনি একজন ধাত্রী, নাম পূর্ণিমা। উপন্যাসে এই পতিতা রমণীকে নতুন জীবনের পথ দেখান সিস্টার অপরাজিতা। 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ'-এর রচয়িতা রমাপতি দত্তের মতে চরিত্রটি সম্ভবত সিস্টার নিবেদিতার ছায়াবলম্বনে পরিকল্পিত। (৪)

অমরেন্দ্রনাথের একটি আত্মচিন্তামূলক রচনা 'মন'—'থিয়েটার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ' এর প্রায় সমসাময়িক। উপন্যাসের শেষাংশে অমরেন্দ্রনাথের মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে প্রবন্ধটিও সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে :

"এত করিয়াও বুঝিলাম না—মন! তুমি কি চাও? কিসে তোমার তৃপ্তি? কিসে তোমার আনন্দ।.....তোমার গূঢ় রহস্য অবগত হইবার জন্য তোমাকে প্রাণপণ আগ্রহে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়াছি, আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাতে ডুবিয়া গিয়াছি—কিন্তু কই মন! তুমি তো ধরা দিলে না, তোমার সঠিক অস্তিত্বের অণুমাত্রও ত' অনুমিত হইল না!...ভালো হউক, মন্দ হউক তুমি যখন যেদিকে ছুটিয়াছ, আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছি; যখন যে দ্রব্যে তোমার আকিঞ্চন জন্মিয়াছে, আমিও কিছুমাত্র হিতাহিত চিন্তা না করিয়া, তখনই তোমাকে তাহাই জোগাইয়াছি। কিন্তু যেই তোমার কার্য সিদ্ধ হইল, যে মুহূর্তে তুমি তোমার অভীষ্ট বস্তু করায়ত্ত করিলে, তখনই সেখান হইতে একেবারে ছুট মারিয়া, অন্য দেশে গিয়া উপস্থিত হইলে। আমি তোমার ক্রীতদাস—অনেক টাকায় আমাকে কিনিয়া লইয়া দাসখৎ লিখাইয়া লইয়াছ, সুতরাং আমার আর উপায় কি?—আমিও তোমার সঙ্গে নতুন দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম।—সেখানে আবার নতুন খেলা জুড়িয়া দিলে, নতুন খেয়াল তুলিলে—আমিও তোমার দালাল হইয়া, তোমার প্রবৃত্তির পোষকতা করিতে লাগিলাম।...

...তুমি এমন অশান্ত হইয়া বেড়াও কেন জান?—অতৃপ্ত কামনা লইয়া নিজে জর্জরিত হইয়া, আমাকেও তিলে তিলে সংহার করিতেছ কেন জান? 'আনন্দ' 'আনন্দ' করিয়া অমূলক আনন্দের সমস্ত উপকরণ উপভোগ করিয়াও, নিরানন্দের কলুষ নেত্র—আরও কলুষিত করিতেছ—এবং আমার সর্বাঙ্গে কলঙ্কের ছাপ দাগিয়া দিতেছ কেন জান? তুমি সুখের জলধি সৃষ্টি করিয়া—সাঁতার কাটিয়া পার হইতে চাও।...

নিজেও পুড়িতেছ, আমাকেও পোড়াইতেছ। নিজেও যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছ—আমাকেও প্রাণঘাতী যন্ত্রণা দিতেছ! নিজেও কখন আলোর মুখ দেখিতে পাইলে না, আমাকেও চির অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিলে।

সব রকম তো করা গেল, সব রকম তো দেখা গেল, এইবার মন! যা থাকে অদৃষ্টে—একটা নতুন পথ ধরিতেই হইবে,—নবজাগরণে জাগিয়া উঠিয়া, আলোড়িত সংসার সমুদ্রের মধ্যস্থলে পড়িয়া, কাণ্ডারীহীন জীর্ণ তরী লইয়া 'ধ্রুবতারা?'—কেমন করিয়া মিলিবে?—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ?—খুঁজিতে হইবে না—বেশীদূর-এ যাইতে হইবে না—'তারা' আপনি উদয় হইয়াছে!! ওই যে—ওই যে—তোমার মস্তকে, তোমার বামে, তোমার দক্ষিণে, তোমার সম্মুখে, তোমার পশ্চাতে—

ভগবান রামকৃষ্ণ।" (৫)

'হরিরাজ' নাটকের একটি গান 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বা ঠাকুরের নামামৃত' পুস্তকে গৃহীত হয়েছে। 'হরিরাজ'—রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। অমরেন্দ্রনাথ নাটকের সর্বস্বত্ব কিনে নিয়ে নাটকটিকে অভিনয় উপযোগী করেন। 'হরিরাজে'র গানগুলি অমরেন্দ্রনাথেরই রচনা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবদ্যোতক যে গানটি 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীতে' গৃহীত হয়েছে সেটি হ'ল :

বঁধু ধরহে ধরহে পর এ হার
আমি সকলি সঁপেছি যা' ছিল আমার॥
কণক আসন বারেক ত্যাজিয়ে
আমার হৃদয় আসনে বস হে আসিয়ে।
পূজিব চরণ সাধ মিটাইয়ে বরষি নয়নাসার॥ (৬)

॥ ২ ॥

অমরেন্দ্রনাথের বন্ধু এবং তাঁরই সম্প্রদায়ের নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী। মনোমোহনের জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ৬ নভেম্বর ১৯২০। বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম গ্র্যাজুয়েট নট হিসাবে তাঁর যোগদান সে সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নাট্যকার হিসাবেও মনোমোহন সেকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে রচিত অমৃতলালের একটি কবিতায় মনোমোহনের নাট্য প্রতিভার স্বীকৃতি দেখতে পাই :

যশঃ মান লভি নাম রেখে কবি
স্বধামে গিয়াছে সে মনোমোহন। (৭)

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'The Bengali Stage' নাম প্রবন্ধে গিরিশ-প্রসঙ্গ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে লিখেছেন :

"But it would be neither just nor fair to leave unmentioned other illustrious workers who have also contributed their share in enriching the dramatic literature and supplying nourishment to the Stage. Notable among them are the late Rajkrishna Roy, the late Atul Krishna Mitra, the late Dwijendralal Roy, the late Amarendranath Dutta, the *late Monomohon Goswami,* Amritalal Basu and Kshirode Prosad Vidyabinode. (৮)

মনোমোহনের 'সংসার' নাটক এক সময় "কিভাবে মিনার্ভার ভাগ্য প্রসন্নতার" সূচনা করেছিল এবং "যে সকল নবীন অভিনেতা 'সংসারে' অভিনয়" করতেন তাঁরা "বাজারে প্রতিষ্ঠালাভ" করেছিলেন তাঁর বিবরণ দিয়েছেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। (৯) অমরেন্দ্র নাথ দত্ত গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের উদ্বোধন করেন মনোমোহনের 'পৃথ্বীরাজ' নাটক দিয়ে এবং নাটকটির সাফল্য গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের সুপ্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর 'কর্মফল' নাটকের সাফল্য সম্পর্কে রমাপতি দত্ত লিখেছেন—"ত্রুটি-হীন অভিনয় কৌশলে সমস্ত নাটকখানিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। পুলিশ কর্তৃক ইহার অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করা হইতেই এ নাটক যে কতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।" (১০)

অভিনেতা ও নাট্যকার মনোমোহন সমাদর লাভ করলেও একালের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত। এ উপেক্ষার বড় কারণ হলো, নাট্যকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাবকালে বাংলা নাটকের সাম্রাজ্য গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের দখলে। সেখানে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় না দিয়ে তাঁদের আসনচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে পরিচয় দেওয়ার জন্য সে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তার সুযোগ তিনি পান নি। পূর্বসূরী ও সমসাময়িক নাট্যকার-দের প্রভাব অতিক্রম করে স্বকীয়তা অর্জনের পূর্বেই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সেই স্বল্পপরিসরে তিনি যে ক'খানি নাটক লিখেছেন রাজরোষে তার বেশীর ভাগ বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এই নিষিদ্ধ নাটকের একটি 'কর্মফল'—পরে পরিবর্তিত আকারে 'সাধনা' নামে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সাধনাই একমাত্র নাটক যা শ্রীরামকৃষ্ণকে উৎসর্গীকৃত হয়েছে—অন্তত অনুরূপ দ্বিতীয় কোনো নাটকের সন্ধান আমি পাই নি। নাটকটি ১০ পৌষ ১৩২৩ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

২৮ বৈশাখ ১৩১৪, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত মনোমোহনের 'সমাজ' নাটকে রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসীদের সেবাকার্য ও কর্মধারার পরিচয় স্থান পেয়েছে। ইতিপূর্বে

স্পষ্টভাবে রামকৃষ্ণ-মিশনের নামোল্লেখে সেবাকার্যের বিবরণ অন্য কোনোও নাটকে দেখা যায় নি। গিরিশচন্দ্র বা অন্যান্য নাট্যকারেরা স্বামী বিবেকানন্দের সেবাব্রত আদর্শরূপে স্থাপন করলেও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কথা মনোমোহনই স্পষ্ট-ভাবে প্রথম উল্লেখ করেছেন। অর্থগৃধ্নু জমিদার হরনাথের সঙ্গে তার পুত্র পরেশের মতভেদের কারণ পুত্রের উদারতা। পরেশের স্ত্রী কমলা দরিদ্র দীনবন্ধুর কন্যা। দীনবন্ধু উপযুক্ত পরিমাণে যৌতুক দিতে না-পারায় হরনাথ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে; কিন্তু হরনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীনবন্ধুর মৃত্যুশয্যায় পরেশ ও কমলা উপস্থিত থাকার জন্য পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গেও হরনাথ সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। পরেশ উত্তরাধি-কারসূত্রে মাতামহের যে অলঙ্কার পেয়েছিল সেগুলো বিক্রয় করে পিতার জমিদারীতে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার সেবা ও সাহায্যের কাজে এগিয়ে যায়—সহকারিণী, স্ত্রী কমলা। এখানেই তাদের সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর সঙ্গে যিনি সেবাকার্যের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেবাকার্যের একটি দৃশ্যে :

"পরেশ—যাক, এখন এদিক-কার খবর কি বলুন।

"স্বামীজী—জলকষ্ট দূর হয়েছে। যে কয়টি পুষ্করিণী খনন করান হয়েছে সব ক'টি সুস্বাদু জলে পূর্ণ হয়েছে। যে দু'খানা আটচালা বাড়াতে বলেছিলেন তা করা হয়েছে কিন্তু তাও কাঙালিতে ভরে গেছে, আর বাহিরের মাঠেও ২০০।৩০০ লোক পড়ে আছে।"

দুর্ভিক্ষের দুঃসহ দিনগুলি শেষ হয়েছে। এবার স্বামীজীর ফিরে যাওয়ার পালা :

"সুধীর—পরেশ! স্বামীজী চলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন।

"স্বামীজী—হ্যাঁ পরেশবাবু আমার অনেক কার্যক্ষতি হচ্ছে। আমোদপ্রমোদে কালাতি-পাত করা আমার কর্তব্য নয়! ঈশ্বর কৃপায় আপনাদের হৃদয়ে লুপ্তশক্তি ফিরে এসেছে, —প্রার্থনা করি এই শান্তিসুধা চিরকাল আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।

"পরেশ—স্বামীজী! সার্থক ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পরোপকার যাঁদের ইষ্টমন্ত্র, ত্যাগ-স্বীকার যাঁদের ধ্যানজ্ঞান, তাঁদের তুল্য মহানুভব আর কে? পরমহংসদেবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। স্বামীজী ধন্য আপনি।

"সুধীর—আমি একটি প্রস্তাব করছি। যেরূপ দিনকাল পড়েছে তাতে দুর্ভিক্ষ তো বঙ্গে একটি সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ দাঁড়িয়েছে। তার নিবারণ কল্পে একটি ধনভাণ্ডার হওয়া কর্তব্য। সে ধনভাণ্ডারের ভার স্বামীজীর হস্তে ন্যস্ত হউক।...

"অতুল—অতি মহৎ উদ্দেশ্য। স্বামীজীর ন্যায় স্বার্থত্যাগী নির্লিপ্ত মহাপুরুষই এ ধন ভাণ্ডারের উপযুক্ত রক্ষক।...

"পরেশ—ভাই সুধীর, ভাই অতুল তোমাদের ধন্যবাদ প্রদান করি। দুর্ভিক্ষই আমা-

দের দেশের সর্বনাশ করলে। যতদিন না আমাদের দেশের লোক পেটভরে খেতে পাবে, যতদিন না আমাদের দেশের 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' রব নিবারিত হবে ততদিন আমাদের দেশোন্নতির সকল চেষ্টাই বিফল হবে।

"স্বামীজী—যেদিন দেশের ঘরে ঘরে আপনাদের মতো যুবক বিরাজ করবে, যেদিন আমাদের বাক্যবীরের বংশ নির্বংশ হয়ে আপনাদের মতো যথার্থ কর্মবীর দেখতে পাব, সেইদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে; নচেৎ আমাদের সকল আড়ম্বর সকল আস্ফালনই ব্যর্থ হবে।" (১১)

মনোমোহনের 'ধর্মবিপ্লব' নাটক গিরিশচন্দ্রের কালাপাহাড়েরই মোটামুটি অনুস্থতি। এখানে কালাপাহাড় কালাচাঁদ নামে পরিচিত। গিরিশচন্দ্রের চিন্তামণিও বামাচরণ নামে 'ধর্মবিপ্লব'-এ উপস্থিত। 'ধর্মবিপ্লবে'র নিরঞ্জন গিরিশের 'ভ্রান্তি' নাটকের রঙ্গলাল, যে স্বামী বিবেকানন্দকেই মনে পড়িয়ে দেয়। সোলেমান-কন্যা মতিয়ার সঙ্গে নিরঞ্জনের সংলাপ :

"মতিয়া—কে তুমি মহাপুরুষ? আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দিচ্ছ? তুমি কি স্বয়ং খোদা?

"নিরঞ্জন—না মা আমি তাঁর সন্তান। আমি তোমার সন্তান।

"মতিয়া—না, নিশ্চয় তুমি খোদা, মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাকে ছলনা কবছ।

"নিরঞ্জন—আমি তাঁর অংশ মাত্র। তুমি কি খোদাকে দেখতে চাও?

"মতিয়া—কোথা তাঁর দেখা পাব? তিনি যে নিরাকার।

"নিরঞ্জন—না, তিনি নিরাকার নন। তিনি সাকার—তিনি প্রত্যক্ষ—তিনি জাগ্রত।

"মতিয়া—কই তিনি? কোথা তাঁর দেখা পাব?

"নিরঞ্জন—মানুষই খোদা—খোদাই মানুষ। তিনি সর্বত্র—তিনি সর্বভূতে—তিনি সর্বজীবে বিরাজমান। যদি খোদার সেবা করতে চাও, বিপন্নকে আশ্রয় দাও—ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও—আতুরের সেবা কর। প্রাণ ভরে যাবে—বেহেস্তের সুখ পাবে। এ সেবা স্বয়ং খোদা গ্রহণ করবেন।" (১২)

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ বামাচরণের কথায় প্রতিধ্বনিত :

"মতিয়া—এমন ভক্তিভরে ডাক আমি আর কখনও শুনি নি। না জানি—তোমাদের মা কেমন?

"বামাচরণ—মা আবার আমাদের কি রে বেটি—মা জগতের মা—সকলের মা—তোরও মা।

"মতিয়া—আমি যে যবনী ঠাকুর!

"বামা—তাঁর কাছে হিন্দু-যবন নেই—বামন-শূদ্র নেই—ধনী-নির্ধন নেই। সে বেটি

সকলকেই সমান ভাবে—সকলকেই সমানচক্ষে দেখে।" (১৩)

কালাপাহাড় রচনা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও আধিপত্যের কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। রামকৃষ্ণ-গিরিশচন্দ্র সম্পর্কের পরিস্ফুটনে তাই চিন্তামণি-কালাপাহাড় সংলাপ গভীর অন্তরানুভূতিতে উজ্জ্বল। মনোমোহন গোস্বামী 'কথামৃত' থেকে কিছু কিছু অতিরিক্ত সংলাপ গ্রহণ করলেও গিরিশ চন্দ্রের 'কালাপাহাড়' নাটকের চরিত্রগুলির আদলই (Pattern) বজায় রেখেছেন। তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

"কালাচাঁদ—যদি ভগবানের কৃপা—না না না ও নাম কেন? ও নাম উচ্চারণে আমার অধিকার কি ?

বামাচরণ—দেখ কেলো ! অনেক আবোল-তাবোল বকছিলি, আমি কথা কই নি ; কিন্তু তাঁর নামগ্রহণে অধিকার নেই—এ কথাটা কি করে বললি।...

কালা—আমি যে মহাপাপী ! আমি দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী—স্ত্রী হত্যাকারী।

বামা—মহাপাপীকেই যে তিনি আগে কোলে টেনে নেন। সত্য বটে তোর অত্যাচারে বাঙলার জাতীয় জীবন সহস্র বৎসর পেছিয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে একবার প্রাণভরে ডাক দেখি, কেমন না সে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসে।..."

নিরঞ্জন ও বামাচরণের কথোপকথনে নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ :

"বামা—কেন রে, কাঁদিস কেন রে ? কাজ করে যা ! কাজ করে যা, ফলাফল দৃষ্টি করিস নে—দুনিয়ায় 'আমার' 'আমার' করিস নে। তোর কিছু নয়, আমার কিছু নয়—সব তাঁর...

গীত

"আমিত্ব মোর ঘুচবে কবে
কার কর্ম কে-ই বা করায়, কে তুমি দেখনা ভেবে।" (১৪)

গিরিশচন্দ্র অঙ্কিত আপাত-পাগল দার্শনিক চরিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। নসীরাম-চিন্তামণির ট্র্যাডিশন পরবর্তী কালের নাট্যকাররা প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছেন। মনোমোহনের 'বিধির বিধান' (১৩১৮) নাটকে পুলহ ঋষির চরিত্র-চিত্রণেও গিরিশের সংলাপ ও চরিত্রচিত্রণরীতির স্পষ্ট প্রভাব :

"৩য় নাগরিক : ঠাকুর তুমি পাগল কি না এই নিয়েই আমাদের ঝগড়া।

"পুলহ—যার বাপ পাগল, মা পাগল, সে পাগল হবে না ত কি মাথাগোল হবে [বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর সংলাপ ও গান স্মর্তব্য] ? আমি পাগল, তুমি পাগল, সে পাগল। কেউ রূপের পাগল, কেউ প্রেমের পাগল, কেউ মানের পাগল,—কেউ যশের পাগল,

কেউ রসের পাগল—সবাই পাগল রে বাপ, সবাই পাগল। তবে পাগলকে পাগল বললেই যত গোল বাধে।" (১৫)

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মনোমোহন নাটককে মঞ্চ-সফল করতে পুরাতন ধারারই অনুসরণ করেছেন। সেই পুরাতন ধারার সাফল্য যে সকলউপাদানের উপর নির্ভরশীল, এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টি (শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র-আদর্শে) অবশ্যই তার অন্যতম।

॥ ৩ ॥

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের তিনটি উপন্যাস অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাট্যরূপায়িত করে মঞ্চস্থ করেন —(১) বঙ্গের শেষ বীর বা প্রতাপাদিত্য (২) রাণী ভবানী এবং (৩) কামিনী ও কাঞ্চন। এর কোনোটিরই নাট্যরূপ মুদ্রিত হয় নি। উপন্যাস থেকে সম্ভাব্য নাট্যরূপ ও চরিত্রগুলি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় 'কামিনী ও কাঞ্চন' উপন্যাসের সমালোচনায় বলা হয়েছে :

"রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট, সময়োপযোগী সামাজিক উপন্যাস। ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম 'কামিনী-জননী', দ্বিতীয় 'কাঞ্চন-বন্ধন', তৃতীয় 'কর্মফল-তুষানল'। লেখক মহাপুরুষ রামপ্রসাদ চরিত্রে জ্ঞানভক্তি সংস্থাপনাচার্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের সরল মাতৃনির্ভরতা, জীবদুঃখ-কাতরতা, কামিনী কাঞ্চন বিজয়, জলন্ত ত্যাগ, অপরিসীম দয়া, অলৌকিক শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।...মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত গীত কয়টিও বেশ ভাবোদ্দীপক।" (১৬)

'তত্ত্বমঞ্জরী'র অন্য একটি সংখ্যায় 'কামিনী ও কাঞ্চন' উপন্যাসের দুটি গান সঙ্কলিত হয়েছে। একটি সঙ্গীত সম্পর্কে 'তত্ত্বমঞ্জরী'র অভিমত :

"দ্বিতীয় সঙ্গীতটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র। চিত্রটি সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে :

চল যাই তরী বেয়ে।
কল্পতরু কাঙ্গাল গুরু, প্রসাদের নাম নিয়ে।
যেই কৃষ্ণ, সেই রাম, সেই আমার প্রসাদ
নানারূপে অবতীর্ণ—পুরাণ ভক্তের সাধ—
এমন দয়াল ঠাকুর যেবা চেনে, তার কেবা সাধে বাদ॥
'মা' 'মা' বলতে কেঁদে সারা হরি বলতে আপনহারা
যেন রে পাগলপারা, প্রেমে পূর্ণ চাঁদ,...(১৭)

নবম অধ্যায়

রামকৃষ্ণ নাটক : প্রবাহ।

॥ ১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রকে নায়ক করে নাটক লেখার কল্পনা গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবু) ছিল। নাট্যকার অতুলানন্দ রায় তাঁর 'সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী-পুস্তকের ভূমিকায় ('অকুণ্ঠ স্বীকৃতি') এই প্রথম প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়েছেন :

"সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে, ১৩২৪ সালে, 'মনোমোহন থিয়েটারে' প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখি। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের পুত্র বিখ্যাত অভিনেতা দানীবাবুর মুখে প্রথম ঠাকুরের কথা শুনি। 'মনোমোহনে' তখন আমার 'পাণিপথ' নাটকের মহলা চলছে। রোজই মহলা দেখতে যাই। থিয়েটারের বিক্রীর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। ছবিখানির নীচে দেওয়ালের গায়ে লাল সিঁদুরে লেখা ছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণ ভরসা'। বিচিত্রবোধে দানীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ব্যবসায়ীদের গদিতে লেখা দেখি ঠাকুরদেবতার নাম। আপনাদের এখানে দেখছি রামকৃষ্ণের নাম। কে ইনি ? এ নামই বা কেন ?'

"দানীবাবু বলেছিলেন, 'ইনিও ঠাকুরতো। শোনেন নি এঁর কথা ? পড়েন নি ?'

"পড়িনি। মাথা নাড়লাম। দানীবাবু বললেন, 'পড়বেন, পড়বেন। ইনিও ঠাকুর। বাপির মুখে শুনেছি এঁর দয়ার কথা।...

"কৌতূহল হল। মহলার পরে থিয়েটারের গাড়ীতে বাড়ী ফিরবার পথে দানীবাবু বললেন, 'কি জানেন, এখানকার মানে থিয়েটারের হালচাল হাওয়া খুব ভালো না তো...পতনের সদর ফটক...পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ...ওঁর নাম নিয়ে আমরা বল পাই, বেঁচে যাই। পরখ করে দেখবেন। মনের দুর্বলতা এলে দু তিনবার শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নেবেন...দেখবেন কী দৈবীশক্তি ও-নামে।'

"তখন আমি মাত্র সতেরোয় পড়েছি। আই. এ. পড়ি। তরুণ, চঞ্চল, সবজান্তা... বিশ্বাস করলাম না। দানীবাবুর অলক্ষ্যে হাসলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য জীবনসংগ্রামে বহুবার বহু প্রলোভন দমন করবার শক্তি পেয়েছি মাত্র তিনটিবার 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম স্মরণ করে। ঠাকুরের সম্পর্কে তখনো কিছুই বিশেষ জানিনে, ভক্তি বিশ্বাস করি তাও নয়। দানীবাবু বলেছেন, পরখ করেছি এইমাত্র। প্রতিবারই দেখেছি, কথাটা প্রতি

বর্ণে সত্য···রহস্যময়।

"এ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আরও জানবার আগ্রহ হলো। জানতে সাধ হলো, কে এই শক্তিমান দয়াময়।

"দানীবাবু আব গিরিশবাবুর লিপিকার অবিনাশবাবুর কৃপায় গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাগার থেকে পেলাম ঠাকুরের অনেক জীবনীগ্রন্থ, ঠাকুরের সম্পর্কে অনেকে নিবন্ধ। পড়লাম। মিটল না পিপাসা। খটকাই বাডতে লাগলো। পেলাম না যেন ক্রমবিকাশমান সুসমঞ্জস জীবন বৃত্তান্ত। 'পাণিপথ' তখন চলছে। দানীবাবুর উৎসাহে বারং বার চেষ্টা করলাম শ্রীরামকৃষ্ণকে নায়ক করে নাটক লিখতে। পারলাম না। পাঁচ সাতবার লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। হয়না মনের মতন। হাত কাঁপে নিজেরই লেখা খাতার পাতা উলটাতে। কেবলই মনে পডে স্বামীজীর স্বীকৃতি 'ঠাকুরেব কথা বলিনে, ভয় হয় যদি আমার বলার অক্ষমতায তাঁকে ছোট করে ফেলি।" (১)

সে নাটক তখন লেখা হয় নি। অনেক পরে ১৩৫৮ সালে অতুলানন্দ 'গদাধব' (বালক রামকৃষ্ণ) নাটক লিখেছিলেন এবং ১৩৬১-তে তাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থ 'সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ' পরবর্তী কালের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত এম-জি এণ্টারপ্রাইজের (মলিনা-গুরুদাস এণ্টারপ্রাইজের) নাটকগুলি রচনার ভিত্তি রূপে ব্যবহৃত হযেছে, একথা জানালেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই ১৩২৪-এর কাছাকাছি সময়ে আর কোনো নাট্যকাব শ্রীবামকৃষ্ণ সম্পর্কিত নাটক লিখেছিলেন অথবা লেখার চেষ্টা কবেছিলেন কি না জানি না। তারপর শ্রীরামচৌধুরীর প্রেরণায় ও অধ্যবসাযে 'যুগাবতার'-এর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা রঙ্গজগতে এক নতুন প্রেরণা এলো।

॥ ২ ॥

ইংরেজি ১৯৪৮।

সরস্বতী পূজার দিন বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে তাঁর প্রতিকৃতির চরণ স্পর্শ নিয়ে একটি নতুন নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা হলো। নাটকের নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ'—নাট্য-কার, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতার 'কালিকা থিয়েটারে'র স্বত্বাধি-কারী রামচৌধুরী (বর্তমানে লোকান্তরিত) নাটক প্রযোজনা করবেন। নাটকটি রচনার সময় দফায় দফায় রামবাবু বেলুড়মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীদের শুনিয়ে এসেছেন, তাঁদের সমর্থন পেয়েছেন—আশীর্বাদ লাভ করেছেন। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে—এবার অভিনয় শুরু হতে চলেছে।

কিন্তু আপত্তি এলো বেলুড় মঠ থেকেই—। তখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। রামচৌধুরী প্রমাদ গণলেন। আপত্তির কারণ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী—স্বনামে তাঁকে মঞ্চে আনা হবে—নাটকে আছেন, সারদা দেবী, রানী রাসমণি, নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, কেশব সেন। এসব চরিত্রে অভিনয় করবেন সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা—সাধারণ ভক্তদের এতে প্রবল আপত্তি। সে আপত্তির ঢেউ উঠলো সংবাদ পত্রেও। রাম চৌধুরীর কিন্তু প্রবল জিদ—শুধু জিদ নয়, এক অদ্ভুত শক্তি যেন তাঁকে ভর করেছে। তিনিও গোঁ ধরলেন 'এ নাটকের অভিনয় হবেই।'

রামবাবুর কথা : 'আমি স্বপ্নাদেশ পেয়েছি ভবতারিণীর—এ নাটক অভিনয় করতেই হবে।'

ব্যাপারটা গড়ালো অনেকদূর পর্যন্ত। কিরণশঙ্কর রায় তখন বাংলার (পশ্চিম বাংলা) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। তাঁর কাছেও নালিশ গেল। থিয়েটারের দরজায় পুলিশ বসলো। রামবাবুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই :

"আমি মশাই পুলিশের দারোগা—লাঠিবাজিতে কুখ্যাত। আমিই বা ছাড়ব কেন, যখন স্বয়ং ভবতারিণীর আদেশ পেয়েছি।"

রামবাবু বেলুড মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীদের বললেন, "আপনারা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করুন যেন আমি হঠাৎ accident-এ মারা যাই। যতক্ষণ বেঁচে আছি, নিবৃত্ত হব না কিছুতেই।"

রামবাবুর কৌঁসুলী গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। বললেন—

"যে বই censor থেকে pass হয়েছে, সরকার থেকে তা' বন্ধ করবার চেষ্টা করলে আইনের আশ্রয় নেব।" পুলিশ কমিশনার রামচৌধুরীকে (তখনও রামবাবু পুলিশের কাজে নিযুক্ত) শাসালেন "আপনার চাকরি যাবে।" ওঁরও তৎক্ষণাৎ উত্তর "এখনই Resignation নিয়ে নিন।"

দফায় দফায় বেলুড় মঠে আলোচনা চললো। ভক্তদের ক্ষোভকে তাঁরা কি করে অগ্রাহ্য করবেন! অবশেষে একটা সমাধান সূত্র পাওয়া গেল। রূপক নাটক হতে পারে। ঘটনাগুলো অবিকৃত রেখে শুধু নামগুলো পালটে দিলেই হবে।

নাটকের নাম হলো 'যুগাবতার'—শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দ, রাণী রাসমণি নারায়ণী, মথুরবাবু বৃন্দাবন—গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, কেশব সকলেই রইলেন—তবে স্বনামে নয়।

তাতেও নিস্তার নেই। অভিনয়ের উদ্বোধন হলো। প্রবল উৎসাহ দর্শকদের মধ্যে—কাতারে কাতারে লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। এমনি সময়, আবার প্রতিবাদ

এলো, আবার আইনের হুমকি। এবার রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে। সাতখানা **Injunction**-এর চিঠি এলো। রামবাবু স্বয়ং গেলেন তাঁদের কাছে, প্রার্থনা: 'একবার আপনারা নিজেরা দেখে যান, কোথাও তাঁদের আমরা অসম্মান করেছি কি না! তারপর যা করবার করবেন।' তাঁরা এলেন, দেখলেন, ফিরে গেলেন প্রসন্ন মনে। (২)

নেপথ্য কাহিনী আরও আছে। সচ্চিদানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করবেন কে? এ নাটক অভিনয়ে সব চেয়ে যাঁর উৎসাহ সেই বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু তো এক কথায় হাত জোড় করে সরে দাঁড়ালেন। নীতীশ মুখোপাধ্যায়ও রাজী নন। জোর করে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেওয়া হলো ভূমিকাটি—আর সেই থেকেই গুরুদাস একাত্ম হয়ে গেলেন চরিত্রটির সঙ্গে। রাণী নারায়ণীর (রাসমণি) ভূমিকায় নামার কথা মলিনা দেবীর—তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, যদি কেউ আপত্তি করে, কটাক্ষ করে তাঁর সম্পর্কে!

মলিনা দেবী বললেন "রাণী রাসমণির বাড়ির সঙ্গে আমার স্বামীর (জলু বড়াল) যোগাযোগ ছিল। উনি গিযে তাঁদের বললেন—খান্নাদের বাড়ি, বিশ্বাসদের বাড়ি সব বলাতে তারা রাজি হলেন।" আশ্বাস পেযে মলিনাদেবী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। নারায়ণীর নামে হলেও উনি ঠিকই জানতেন যে রাসমণির ভূমিকাতেই উনি অভিনয় করছেন। (৩)

দর্শকদেরও বলে বোঝাতে হলো না—তারা প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ, রাসমণি, নরেন্দ্রনাথকেই মঞ্চে পেয়ে গেল। প্রায় ৫০০ রাত ধরে শহর কলকাতায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটক অভিনয় হয়েছে। কলকাতাকে অতিক্রম করে বাংলাদেশ জুড়ে নাটকের খ্যাতি। অবাঙালী দর্শকরাও এসে মুগ্ধ চিত্তে নাটক দেখেছে। একদিনের কথা শ্রীরামচৌধুরী কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। সেদিন আনন্দময়ী মা আসছেন 'যুগাবতার' দেখতে। 'হলে' একটিও আসন খালি নেই কিন্তু প্রধানশিল্পী গুরুদাস অনুপস্থিত। সদ্যপিতৃহীন নীতীশমুখোপাধ্যায় এসেছেন—রুক্ষ চুল,,একমুখ দাড়ি গোঁফ। তাঁকে দেখে রামবাবুর মনে হলো—হ্যাঁ ইনিই আজ পারবেন সচ্চিদানন্দের ভূমিকায় নামতে। সেদিন তাঁর অনুরোধে নীতীশ অভিনয় করেছিলেন—সে অভিনয় নাকি অবিস্মরণীয়। (৪)

'যুগাবতার' যখন শুরু হয় তখন বাংলা থিয়েটারে আকাল চলেছে। কোনো নাটক দীর্ঘদিন চলে না—নতুন ভালো নাটক নেই—পুরানো নাটক দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র। এমনি সময়ে 'যুগাবতার' হঠাৎ যেন ঝড তুললো। এতদিনের এক ঘেয়েমির পর নতুন স্বাদের আনন্দ। সে আনন্দ লাভ করে দর্শক তৃপ্তি পেয়েছে। মাত্র একদিন অভিনয় দেখে অনেকের আশা মেটে নি।—এমনি একজন কিশোর দর্শকের কাহিনী রামবাবু শোনালেন :

বার-তের বছরের স্কুলের ছেলে। রামবাবুর চোখে পড়ল,—'হলে'র বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি কাঁদছে। থমকে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন?'

কান্না-ভেজা গলায় ছেলেটি উত্তর দিল 'আমি স্কুলে পড়ি। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে পঁয়ত্রিশবার 'যুগাবতার' দেখেছি—আমার আর পয়সা নেই। কিন্তু এখনো দেখতে ইচ্ছে করে।'

রামবাবু তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন—তার ছত্রিশবার দেখার আকাঙ্ক্ষা মিটল তাঁর সহায়তায়। (৫)

এ শুধু সেই কিশোরটির নয়—সারাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা আজও মেটে নি—সেই কারণেই 'যুগাবতার' অভিনয়ের ত্রিশ বছর পরেও একইভাবে চলেছে রামকৃষ্ণ-পালা।

"গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন 'এটা দিন নয়, মাস নয়, বছর নয়—একটা যুগ অতিক্রম করে অন্য একটা যুগে পৌঁছেছে।...কোথায় মাদ্রাজ—তারা আমাদের ভাষা বোঝে না, তবু তাদের কাছ থেকেও ডাক আসে। এক বছর আগে থেকে বায়না হয়ে যায়। বিদেশীরা পর্যন্ত এসে ছবির খোঁজ করে—তারা তাদের দেশে 'সাব-টাইটল' করে ছবি দেখাবারও চেষ্টা করেছিল।' (৬)

'যুগাবতার' রামকৃষ্ণ-চরিত্রে নাট্যসম্ভাবনার দিকটিকেই পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছিল —ফলে ব্যবসায়িক দিক থেকেও এ চরিত্রের চাহিদা হয়েছে যথেষ্ট। গুরুদাসবাবু বললেন 'এত যাত্রা, এত থিয়েটার, এত সিনেমা—আমার যতদূর মনে হয় ঠাকুরের Subject নিয়ে ব্যবসা করে দু' কোটি টাকার উপর লাভ করেছে।' (৭)

থিয়েটার থেকে সিনেমা যাত্রা সব কিছুতেই রামকৃষ্ণ চরিত্র এতো প্রবল সাফল্যলাভ করেছিল যে এক সময় তার অপপ্রয়োগ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। এই আশঙ্কা প্রকাশিত হতে দেখি কয়েকটি ছবির সমালোচনায়।

১০ চৈত্র ১৩৬২ দেশ পত্রিকায় 'হে মহামানব' ছায়াছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

"...সেই স্বামীজীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে একবার রূপায়িত করা হয়, তারপর থেকে সেই একই মহাপুরুষকে কতোরকমেই না দেখা গেল। 'যুগদেবতাতে' একরকম, 'রাণী রাসমণি'তে একরকম, 'শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ'তে আর একরকম, আবার 'হে মহামানব'-এ আরেক রকম। আগামী ছবির তালিকায়ও এমন কয়েকখানি ছবি রয়েছে, যার মুখ্য চরিত্রের মধ্যে আছেন রামকৃষ্ণ।"

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ দেশ পত্রিকাতে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছায়াছবির সমালোচনা প্রসঙ্গেও

সেই ব্যবসায়িক প্রশ্নটি উঠেছে :

"এমকেজী" প্রডাকসন্স গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে কল্পনা করেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই জীবনের একাংশ। তার কারণ রামকৃষ্ণের জীবনীর যে এখন বেশ কাটতি রয়েছে তা আগের ক'খানি ছবিতেই প্রমাণিত হয়েছে, আর রামকৃষ্ণকে নিয়ে ছবি তোলাও এখন সড়গড় হয়েছে বেশ। এক রকম তৈরীই জিনিষ, আর তার বাজারও মজুদ।..."

সাহিত্যিক বিমল মিত্র তাঁর 'চলতে চলতে' ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনাতেও বর্তমানের এই ব্যবসায়িক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

"...আর আজ যে থিয়েটারে বা যাত্রাতেই হোক তাতে রামকৃষ্ণ চরিত্র অভিনীত হলেই আর দেখতে হবে না। সেখানকার মালিকরা টিকিট বিক্রি করে কুলিয়ে উঠতে পারে না।"

এই ব্যবসায়িক সাফল্য ছাড়াও আর একটা দিক থেকেও রামকৃষ্ণ চরিত্র নতুন সম্ভাবনার দিকটা তুলে ধরেছিল এবং এরই ফলে অনেক নতুন নতুন জীবনীমূলক কাহিনীর রূপায়ন সম্ভব হয়েছে। গিরিশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাসমণি এমন কি বামাক্ষ্যাপার জীবন অবলম্বন করে জীবনীচিত্র রচনার সাফল্যের ভিত্তি রামকৃষ্ণ চরিত্র। সকলেই যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির তাড়নাতেই রামকৃষ্ণ চরিত্রকে অবলম্বন করেছেন এমন কথা বলা যায় না—শিল্পীদের সম্পর্কে ত নয়ই। শ্রীমতী মলিনা রাসমণির চরিত্রে অভিনয় করার আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী—তাঁর সাফল্য বা প্রতিষ্ঠা বহু পূর্বে বহু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত কিন্তু 'যুগাবতার'-এ অভিনয়ের পর তাঁর জীবনের মধ্যে এসেছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। মলিনা দেবী বলেছেন "সত্যই যারা এই সব বইতে অভিনয় করে তারা প্রত্যেকে শান্তিতে আছে এবং খুবই আত্মতৃপ্তি অনুভব ক'রে অভিনয় করে ; আমি অন্ততঃ শিল্পী হিসেবে এইটুকু তাদের মনের কথা বলতে পারি।" (৮) বিলাস ও আরামের আশ্রয় ছেড়ে মলিনা দেবী রামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী প্রচারকে তাঁর শেষ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর Statesman পত্রিকা লিখেছে :

"It was these religious plays more than her screen and jatra performances that had the greatest influence on her life. She often agreed to undergo great hardship in travelling to a remote village to perform 'Thakur Ramkrishna,' because she believed that Ramkrishna's message needed to be propagated. "(৯)

'দেশ' পত্রিকায় মনুজেন্দ্র ভঞ্জ লিখেছেন :

"রাণী রাসমণি' (১৯৫৫) ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে মলিনার জীবন এক নতুন সার্থকতার দিকে মোড় নিয়েছিল। মলিনা নেমেছিলেন নামভূমিকায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেজেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ওঁদের অভিনয় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল সে সময়। তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঁরা গড়ে তুললেন নিজেদের নাট্যসংস্থা এম. জি. এনটারপ্রাইজ। এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালেখ্য অভিনয় করে দেশের দিকে দিকে —শুধু শহরে নয়, সুদূর মফস্বলেও ঠাকুরের বাণী প্রচার করে আসছে বছরের পর বছর ধরে। নাট্যশিল্পের মাধ্যমে এই ধরনের আদর্শনিষ্ঠ সমাজ সেবার উদাহরণ আর কোথাও আছে কি না জানি না।" (১০)

এই ব্রতের মূল প্রেরণা কিন্তু 'রাণী রাসমণি' ছায়াছবি নয়—মলিনা দেবীর জীবনে এর সূত্রপাত 'যুগদেবতা' মঞ্চাভিনয়ে, এ কথা মলিনা দেবীর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি।

॥ ৩ ॥

'যুগাবতার'-এর সাফল্য বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যে ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করলো তার জের গিয়ে পৌঁছেছে চলচ্চিত্র ও যাত্রাজগতে। সমকালীন নাট্যকাররাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেক খ্যাতিমান নাট্যকারই রামকৃষ্ণ জীবনী অথবা রামকৃষ্ণ-প্রাধান্য আছে এইরকম জীবনী অবলম্বন করে এক বা একাধিক নাটক লিখেছেন। নটী-বিনোদিনী, পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, নট-নটী এই প্রবাহেরই এক একটি তরঙ্গ।

নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর নটী-বিনোদিনী নাটক রচনার পটভূমিকা বর্ণনা করলেন :

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে বসে থাকতে থাকতে এটা মনে হয়েছিল যে ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন, যাঁরা যথাসর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন, তাঁদের সবার কথা 'কথামৃতে' আছে, তা' ছাড়া অচিন্ত্যদাও (৺অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) লিখেছেন কিন্তু বিনোদিনী, সে-ও তো কৃপা পেয়েছিল। এই ভাবতে ভাবতেই বিনোদিনীকে নিয়ে নাটক করার কথা মনে হল।" (১১)

দেবনারায়ণ গুপ্ত ১৯৬০ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকের রচয়িতা। এ নাটক রচনার পটভূমিকা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে বললেন : "সলিল বাবুই [স্টার থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র] আমাকে বলেছিলেন

যে, 'আমার ইচ্ছে, যে স্টার থিয়েটারে ঠাকুর এসেছিলেন, যেখানে তাঁর আশীর্বাদ পড়েছিল সেই স্টার থিয়েটার তো এখনও চলছে এবং গিরিশবাবুর দেওয়া ষোল হাজার টাকাও এখানে আছে—অথচ আমরা আজ পর্যন্ত স্টার থিয়েটারে ঠাকুরকে নিয়ে একটা নাটক করলাম না। করলে কেমন হয় ?' আমার ওপর ভার দিলেন 'আপনি যে-ভাবে ইচ্ছে করুন।'...আমার মনে হলো, ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও গিরিশবাবু বেঁচে-ছিলেন, তাঁর বিশ্বাসটা কি, তাঁর Standpoint-টা কি, তাই নিয়ে নাটক লিখবো। আরম্ভ করেছি, [দক্ষিণেশ্বরে] মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন থেকে। ঠাকুরের সমগ্র জীবনটা থাকবে তার মধ্যে এসে প্রবেশ করবেন গিরিশচন্দ্র। সেই গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের philo-sophy কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর নিজের বিশ্বাস কি ছিল, তাই দিয়ে নাটক শেষ করেছি। তা হলো : ঠাকুর আছেন, ঠাকুরের দেহের লয় হলেও দেহীর লয় হয় নি। ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়। আমি নিজেও সেটা এখনো বিশ্বাস করি।" (১২)

নাট্যকার মন্মথ রায় লিখেছেন 'মহাউদ্বোধন' নাটক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা এই নাটকটি বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। 'মহাউদ্বোধন'-এর কাহিনীতে বিবেকানন্দের জীবনে আধ্যাত্মিকতার বিকাশকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জীবনের এই উদ্বোধনকেই 'মহাউদ্বোধন'রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই আত্ম-উদ্বোধনের প্রধান শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। সমগ্র নাটকে তাঁর ভূমিকা দর্শকের কাছে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং এই আকর্ষণের জন্যই দীর্ঘদিন পরেও নাটকটির চাহিদা কমে নি।

নান্দীকার গোষ্ঠীর "নটী-বিনোদিনী" সফল ও উল্লেখযোগ্য নাটকরূপে পরিচিত। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্বে বিধায়ক ভট্টাচার্যের "নটী-বিনোদিনী" অভিনয়ের অনেক পরে, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, নাটকটি অভিনীত হলেও, এটি রচিত হয়েছিল অনেক আগেই। নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ ১৯৬৫ শারদীয় 'বিংশ-শতাব্দী'তে বিনোদিনীর জীবনকাহিনী অবলম্বন করে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। পরে, প্রথমে ছায়া-চিত্রের জন্যে চিত্রনাট্য এবং সবশেষে নাটকখানি লেখেন। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর এটি 'নান্দীকার' গোষ্ঠী প্রথম অভিনয় করেন কলামন্দিরে। তারপর বহু রজনী নাটকটি সুনামের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠির প্রযোজনায় অভিনীত নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বোধহয় এই প্রথম। নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ জানালেন—নাটকটির সাফল্যের অন্যতম কারণ যে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।(১৩)

॥ ৪ ॥

রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী-নাটকের সাফল্য যাত্রাজগতকেও অনুপ্রাণিত করেছে। কিছু কাল আগেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা যাত্রাজগতে দেখা দেয় নি। শতাব্দীর সপ্তম দশকেই প্রথম যাত্রাপালায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। থিয়েটারে দীর্ঘ-কালের রীতি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে মঞ্চ-প্রবেশ। যাত্রাতে এ রীতি এসেছে অনেক পরে। সুবিখ্যাত পালাকার ৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে এবং নট্ট কোম্পানীর 'গুরুমশাই' ৺সূর্য দত্তের মতে সাত-আট বছর আগেও শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে যাত্রার আসরে প্রবেশের রীতি ছিল না—এ রীতি-সাম্প্রতিক। (১৪) অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে। সুবিখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা শান্তিগোপাল জানিয়েছেন, এ রীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘদিনের। বর্তমানে (ডিসেম্বর ১৯৭৭) চন্দ্রলোক অপেরার ম্যানেজার শ্রীকমলকৃষ্ণ খাঁ তাঁর ৩১ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখে-ছেন, কালীমূর্তি প্রথম থেকেই যাত্রাজগতে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। পরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মতে "রামকৃষ্ণের প্রভাব রঙ্গমঞ্চ থেকেই এসেছে, তবে মায়ের [কালী] ছবি রাখার রীতিটা বহুদিন থেকেই চলে আসছে।" (১৫)

যাত্রায় প্রথম রামকৃষ্ণ পালার অভিনয় খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। ব্রজেন দে জানালেন: "থিয়েটার থেকেই আমরা নিয়েছি। বেণীমাধব ভট্টাচার্যই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যানন্দকে নিয়ে যাত্রার পালা রচনা করেন। সেই বইটি বোধহয় নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় প্রথম অভিনীত হয়।...তারপরে নন্দগোপাল রায়চৌধুরী নামে আর এক পালাকার লিখলেন 'পাগল ঠাকুর।' এটি লেখা হয় 'পাগল ঠাকুর' থিয়েটারের (ছায়াছবি—?) অনুসরণে। সেটি বেশ সফল হয়েছিল। তারপরেই আমি লিখি 'রামকৃষ্ণ-সারদামণি'। তারপর 'নটী-বিনোদিনী' এলো। 'নটী-বিনোদিনী'র অভিনয় শুরু হয় ১৯৭১।" (১৬)

যাত্রাজগতে রামকৃষ্ণ-পালার সাফল্য সম্পর্কে ব্রজেনবাবুর অভিমত: "আশ্চর্যের বিষয় এই, রামকৃষ্ণের বিষয়ে যে যা কিছু লিখেছে, তাই অত্যন্ত সফল হয়ে উঠেছে।...এই দেখুন, 'নটী-বিনোদিনী' একসঙ্গে তিনটে জায়গায় হলো। অজিতেশবাবুরা (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—নান্দীকার গোষ্ঠী) করলেন 'নটী-বিনোদিনী', তারপর আমাদের যাত্রা-পালায় দুটো—নট্ট কোম্পানীতে আর শিল্পীতীর্থে—তিনটেই সমান সফল হয়েছে। আমি সব ক'টাই প্রায় দেখেছি।... ওঁর এমনি আশীর্বাদ। ওঁকে একবার হাজির করতে পারলেই হলো।...'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর'-এ (১৯৬৯) শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র উপস্থিত করে যে Inspiration পেয়েছিলাম, তাতেই বুঝলাম যে একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে

নাটক লিখলে আরও আদরণীয় হবে। তারই ফল হলো 'রামকৃষ্ণ সারদামণি।' (১৭)

৺ব্রজেন্দ্রনাথ 'নটী-বিনোদিনী' রচনার তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর নাটক (নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ) থেকে, এবং বিনোদিনী দাসীর আত্ম-স্মৃতি (আমার কথা) ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত রচনা ও প্রচলিত কাহিনী থেকে। পালাকার স্পষ্টই ঘোষণা করলেন—

"আমি মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন বলেই বইটা এইভাবে টে কেছে ('টে কেছে' নাকি যাত্রাজগতের technical term)। (১৮)

৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে ১৮০ খানিরও বেশী যাত্রার পালা রচনা করেছেন—যাত্রাজগতে তাঁর খ্যাতি 'পালাসম্রাট' নামে। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ পালা রচনা করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কতখানি আনন্দ পেয়েছেন ? উত্তরে তিনি বললেন :

"সে কথা বলে আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমাকে যেন টেনে নিয়ে যেত—আমার নিজের কিছু লিখতে হত না। আমি কলমটা তুললেই, আমাকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যেত যে আমি আর অবসর নিতে পারতাম না—ফুরসৎ পেতাম না। এমন আশ্চর্য ব্যাপার ! বই শেষ না করে যেন আমার নিঃশ্বাস নেবার জো থাকতো না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি এই সব বই শেষ করেছি। 'নটী-বিনোদিনী' শেষ করতে আমার একমাসও সময় লাগে নি। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি' লিখতেও তাই।" (১৯)

যাত্রাজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে চন্দ্রলোক অপেরার বর্তমান (১৯৭৭) ম্যানেজার শ্রীকমলকৃষ্ণ খাঁ মূল্যবান কয়েকটি সংবাদ সরবরাহ করে-ছেন। ১৯৬৪ সালে নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরায় যখন বেণীমাধব কাব্যতীর্থের 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালা প্রথম অভিনীত হয় তখন তিনি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—এক অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণও হয়েছিলেন। শ্রীখাঁর তথ্যানুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পালা অভিনীত হয়েছিল :

(ক) ১৯৬৪—স্বামী বিবেকানন্দ—নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরা।
শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায়—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিবেকানন্দের ভূমিকায়—তারা ভট্টাচার্য।
পালাকার—বেণীমাধব কাব্যতীর্থ।

(খ) ১৯৬৬—মহাকবি গিরিশচন্দ্র—নিউ আর্য অপেরা।
শ্রীরামকৃষ্ণ—শেখর গঙ্গোপাধ্যায়।
গিরিশচন্দ্র—৺পঞ্চু সেন।
পালাকার—বিধায়ক ভট্টাচার্য।

(গ) ১৯৬৮—পাগল ঠাকুর—নিউ প্রভাস অপেরা।
শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
পালাকার—নন্দগোপাল রায়চৌধুরী। (২০)

তিনখানি পালার সাফল্য যাত্রা জগতে যে আলোড়ন তুলেছিল তার ফলে অনেকগুলি সম্প্রদায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ পালা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। পেশাদার ও অপেশাদার আসরে তারপর বহু পালা অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য হলো :

(১) নট্ট কোম্পানীর	—করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর	শ্রীরামকৃষ্ণ—শেখর গঙ্গোপাধ্যায়
(২) ঐ	—রামকৃষ্ণ সারদামণি	শ্রীরামকৃষ্ণ— ঐ
(৩) ঐ	—নটী বিনোদিনী	শ্রীরামকৃষ্ণ—দীপেন চট্টোপাধ্যায়
(৪) শিল্পীতীর্থ	—নটী বিনোদিনী	শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) নিউ প্রভাস অপেরা	—মা সারদামণি	শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
(৬) কল্যাণী অপেরা	—রাণী রাসমণি	শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
(৭) তরুণ অপেরা	—বিদ্রোহী সন্ন্যাসী	বিবেকানন্দ—শান্তিগোপাল
(৮) প্রদীপ অপেরা	—রত্নাকর গিরিশচন্দ্র	রামকৃষ্ণ—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৩-এ রবীন্দ্রকাননে সতেরোদিন ব্যাপী যাত্রা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—উদ্দেশ্য ছিল; বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ দিয়ে রবীন্দ্রকাননে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা। উদ্যোক্তা রামকৃষ্ণ-ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শ্রীসুহৃদ রুদ্র বলেছিলেন "গদাধর একদা যাত্রা করতেন। সেদিন কে ভেবেছিল যাত্রাগানের এই শিল্পীই একদা জগৎবরেণ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষের পূজো পাবেন? ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি রবীন্দ্রকাননে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই কারণেই।" 'জগৎবরেণ্য' সেই যাত্রা শিল্পীর যাত্রাপাড়াতেই মূর্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছেন যাত্রার দল। বিনা পারিশ্রমিকে সেদিন বিশিষ্ট যাত্রা সম্প্রদায়গুলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন : (১) নট্ট কোম্পানী (২) ভারতী অপেরা (৩) নিউ গণেশ অপেরা (৪) নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী (৫) শিল্পীতীর্থ (৬) লোকনাট্য (৭) শ্রীমা নাট্য কোম্পানী (৮) ওঁমা স্বপন অপেরা (৯) মীনা অপেরা (১০) রঙ্গবাণী (১১) চৌরঙ্গী অপেরা (১২) শ্রীমা অপেরা (১৩) নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরা (১৫) তরুণ অপেরা (১৬) সত্যম্বর অপেরা (১৭) জনতা অপেরা। (২১)

উল্লেখযোগ্য, নট্ট কোম্পানী ও শিল্পীতীর্থ, উভয় সম্প্রদায়ই 'নটী বিনোদিনী' পালা অভিনয় করেছিলেন, এই সম্মেলনে।

তরুণ অপেরার 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী' বিবেকানন্দ-কেন্দ্রিক পালা। 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী'

দর্শক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। পালা-পরিচালক ও বিবেকানন্দের ভূমিকাভিনেতা শ্রীশান্তিগোপাল বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বদলে তাঁরা [সম্প্রদায়] শ্রীরামকৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকাটিকেই বড় করে দেখিয়েছেন, এ নাটকে। স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও সমাজ কল্যাণ চেতনার মধ্যে তাঁর বিদ্রোহীরূপই পালাটির প্রধান অবলম্বন। পালাটির ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত: "শ্রীরামকৃষ্ণ-কে আমাদের গ্রামে ঘরে সকলেই ভালবাসে এবং রামকৃষ্ণ নাটক বা যাত্রা হলে প্রচুর লোক সমাগম হয়।" (২২)

যাত্রাজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ করেছেন পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। "তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা চিত্রজগতের কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত করেছেন।" শ্রীকমলকৃষ্ণ খাঁর মতে এর পশ্চাতে আছে পূর্ণেন্দুবাবুর নিষ্ঠা। "ঠাকুরের অভিনয়কালীন (তাঁর) যে নিষ্ঠা দেখেছি, তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। তিনি যেদিন ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন সেদিন সম্পূর্ণ উপবাস করতেন এবং দলের সবাই নিরামিষ আহার করতেন। কালী যে সাজতো সে-ও উপবাস করত।...আরও একটা ব্যাপার এই যে এই পূর্ণেন্দুবাবু যৌবনে যে মানুষ ছিলেন —এই চরিত্র অভিনয় করার পর তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।" (২৩)

শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন "প্রথমে নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালায় রামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করি। এরপর 'প্রভাস অপেরা'য় 'পাগল ঠাকুর'—এইখানেই 'মা সারদামণি'-তে রামকৃষ্ণের ভূমিকায়।' শিল্পীতীর্থের 'নটী বিনোদিনী' এবং 'প্রদীপ অপেরা'র 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র'-তেও আমি অভিনয় করেছি। প্রথমবার ('স্বামী বিবেকানন্দ' পালায়) ততটা রস পাই নি—'পাগল ঠাকুর' করে আমি যেন ডুবতে লাগলাম। অভিনয় করতে করতে মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। আমি যা করি—অভিনয় কারুকার্য, কলাকুশলতা—যা কিছু আমার দ্বারা পরিস্ফুট হয় দর্শকের চোখে, সেগুলো করবো বলে আমি কিছু করি না—কে যেন কোথা থেকে সেগুলো জুগিয়ে দেয়।...আমি কেমন একটা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।—সে কী ঠিক বলতে পারবো না।"(২৪)

॥ ৫ ॥

চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের প্রথম আবির্ভাব বিবেকানন্দ-জীবনী অবলম্বনে 'স্বামীজী' ছায়াচিত্রে। পরিচালক অমর মল্লিক, শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছোট্ট ভূমিকাটি এক সময় দর্শকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অভিনেতাদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তাঁদের কারও কারও কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের কার অভিনয় সবচেয়ে ভালো হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীর ভাগ অভিনেতাই উল্লেখ করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের, যিনি মাত্র একবারই এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

মনোরঞ্জনবাবুর পুত্র শঙ্কর নারায়ণ ভট্টাচার্য, তাঁর (মনোরঞ্জনবাবুর) থিয়েটারে যোগ-দানের ইতিহাস সম্পর্কে বললেন : একজন রামকৃষ্ণ-ভক্তের যোগাযোগেই তিনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। সারদাদেবীর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ ছিলেন শিশিরকুমার ও মনোরঞ্জন উভয়েরই বন্ধু। একদিন মনোরঞ্জনবাবু গেছেন ডাঃ ঘোষের বাসায়। সেখানে এক সুদর্শন ভদ্রলোক গল্প করছিলেন দুর্গাবাবুর সঙ্গে। অল্পক্ষণ পরে সেই ভদ্রলোক প্রস্থান করতে দুর্গাবাবু প্রশ্ন করলেন, 'একে চেন?'

মনোরঞ্জন তখন চিনতেন না শিশিরকুমারকে। দুর্গাপদবাবু শিশিরকুমারের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'থিয়েটার করবে?'

মনোরঞ্জন—'কত দেবে?

দুর্গাপদ—'একশো টাকা।'

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তখন বেঙ্গল কেমিকেলে কাজ করেন—মাসিক বেতন ৬০ টাকা। এক কথায় চল্লিশ টাকা আয় বৃদ্ধির সুযোগ! রাজী হয়ে গেলেন।

সেই যোগাযোগ সূত্রেই রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারূপে যোগদান করলেন, যিনি হয়েছিলেন বাঙলা ছায়াছবিতে প্রথম রামকৃষ্ণ-ভূমিকাভিনেতা। (২৫)

ছায়াছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পশ্চাতে 'যুগদেবতা'র সাফল্য যে সক্রিয় ছিল, একথা বলা চলে কারণ তার পূর্বে রামকৃষ্ণ কাহিনী নিয়ে এই মঞ্চসফল নাটক নিশ্চয় প্রযোজকদের কাছে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু 'স্বামীজী' ছায়াচিত্রের অন্য একটি স্মরণীয় দিকও আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, পুরোপুরি রামকৃষ্ণ-জীবনী অবলম্বন করে 'যুগদেবতা' রচিত হলেও এ নাটকে ছদ্মনামের আড়াল রক্ষা করতে হয়েছিল। 'স্বামীজী'তে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বনামেই আবির্ভূত হয়েছেন। বিংশ শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম

দশক জুড়ে বাংলা চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কাহিনীর জয়যাত্রা 'স্বামীজী' থেকেই শুরু হয়, যদিও এর মূলে রয়েছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেরই প্রেরণা। ১৯৪৯ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎসম্পর্কিত ছায়াছবিগুলির দিকে তাকালে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। (২৬)

ছবির নাম		মুক্তির তারিখ
১। স্বামীজী	চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৭ জুন
(অমরমল্লিক প্রোডাকসন্স)	পরিচালনা—অমর মল্লিক	১৯৪৯
	স্বামীজী—অজিত প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	
২। যুগদেবতা	প্রযোজনা—রামচৌধুরী।	১৫ সেপ্টেম্বর
(কালিদাস প্রোডাকসন্স)	পরিচালনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য।	১৯৫০
	শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।	
	রাসমণি—মলিনা দেবী।	
৩। বিদ্যাসাগর	প্রযোজনা—মুরলীধর	২৯ সেপ্টেম্বর
(এম. পি. প্রোডাকসন্স)	চট্টোপাধ্যায়	১৯৫০
	কাহিনী ও পরিচালনা—কালীপ্রসাদ ঘোষ	
	বিদ্যাসাগর—পাহাড়ী সান্যাল	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
৪। রাণী রাসমণি	পরিচালক—কালীপ্রসাদ ঘোষ	১১ ফেব্রুয়ারী
(চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান)	সুর—অনিল বাগচি	১৯৫৫
	রাসমণি—মলিনা দেবী	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	পরিচালক—প্রফুল্ল চক্রবর্তী	২৩ ডিসেম্বর
(ভারত কথাচিত্রম)	শ্রীরামকৃষ্ণ—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৫
	শ্রীমা—শোভা সেন	
৬। হে মহামানব	পরিচালক—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬ মার্চ
(শ্রীগদাধর পিকচার্স লিঃ)	সুর—চিন্ময় লাহিড়ী	১৯৫৬
	শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রভাত ঘোষাল	
৭। মহাকবি গিরিশচন্দ্র	পরিচালক—মধু বসু	১ জুন ১৯৫৬
(এম. কে. জি. প্রোডাকসন্স)	সুর—অনিল বাগচি	
	গিরিশ—পাহাড়ী সান্যাল	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	

৮। শ্রীশ্রীমা	পরিচালক—কালীপ্রসাদ ঘোষ	৯ মে ১৯৫৮
(নারায়ণ ফিল্ম্ কর্পোরেশন)	সুর—অনিল বাগচি	
	শ্রীমা—অনুভা গুপ্তা	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
৯। ভগিনী নিবেদিতা	পরিচালক—বিজয় বসু	
(অরোরা ফিল্ম্ কর্পোরেশন)	সুর—অনিল বাগচি	
	নিবেদিতা—অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়	
	স্বামীজী—অমরেশ দাস	
১০। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	পরিচালক—মধু বসু	১ মে ১৯৬৪
(সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান)	সুর—অনিল বাগচি	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
	বিবেকানন্দ—অমরেশ দাস	
১১। পাগল ঠাকুর	পরিচালক—হিরন্ময় সেন	৩ জুন ১৯৬৬
(তীর্থ ভারতী)	সুর—দেবেশ বাগচি	
	শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বপনকুমার	
১২। বালক গদাধর	পরিচালক—হিরন্ময় সেন	১৯৬৭
(তীর্থ ভারতী)		
১৩। প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	পরিচালনা—নিরঞ্জন দে	
	ও	
	শ্রীরামকৃষ্ণ— ঐ	

এ ছাড়াও একটি সামাজিক ছায়াচিত্র 'কথা কও' (জুলাই ১৯৫৬)-তে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরিউক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া পাঁচ-জন স্বতন্ত্র অভিনেতা পাঁচখানি ছায়াচিত্রে রামকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন—বাকী সবগুলি ছবিতেই 'যুগদেবতা' মঞ্চাভিনয়ের অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশে এই একটি চরিত্রে অভিনয়সূত্রে যে খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন বোধহয় আর কোনো অভিনেতাই তা' পারেন নি। সেই অভিনয়ের সূত্রপাত 'রঙ্গ-মঞ্চে' 'যুগদেবতা' নাটকে। সুতরাং 'যুগদেবতা'ই যে চলচ্চিত্র জগতে রামকৃষ্ণ প্রবাহের দিশারী, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

যাত্রা বা চলচ্চিত্রের তুলনায় কলকাতার রঙ্গমঞ্চের গণ্ডি অনেক সঙ্কীর্ণ। সুতরাং যাত্রা

এবং চলচ্চিত্র রামকৃষ্ণ কাহিনীকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পেশাদারী মঞ্চ ছাড়াও সৌখীন থিয়েটার বা সৌখীন যাত্রার দল কলকাতা এবং গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ নাটকের অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছে। সব ক্ষেত্রেই যে প্রচলিত বা মুদ্রিত নাটক তাঁরা অভিনয় করেছেন, এমন নয়; নিজেদের তৈরী নাটকের ভিত্তিতেও অভিনয় করে তাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন। শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশক থেকে এই যে রামকৃষ্ণ প্রবাহ শুরু হয়েছে আজও তা অব্যাহত-গতি।

দশম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিল্পীজগৎ

॥ ১ ॥ বিনোদিনী

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বে রামকৃষ্ণ আবহাওয়ায় যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা শুধু মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—নাট্যকার-শিল্পী-কলাকুশলীদের ব্যক্তিগত জীবনেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব না হলেও কয়েকজনের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রসঙ্গক্রমে কারও কারও কথা বলেছি। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের ক্রমশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে গড়ে উঠেছিল, সে আলোচনাও করেছি। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বা অন্য উপলক্ষে প্রতিটি থিয়েটারে আমন্ত্রণপত্র আসত ব্যক্তিগত-ভাবে নয়, সম্প্রদায়গতভাবে। সম্প্রদায়গুলিও সে আমন্ত্রণের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতেন।(১) অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী মঠ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবন নতুন ভাবে গড়ে তুলেছেন।

রঙ্গমঞ্চের বিনোদিনী দাসীই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন—এমন কি গিরিশচন্দ্রেরও আগে। সেই আশীর্বাদ তাঁর জীবনে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, স্বভাবতই সে প্রশ্ন জাগে।

'চৈতন্যলীলা' ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ আরও পাঁচটি নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় দেখেছেন। 'প্রহ্লাদ চরিত্রে' প্রহ্লাদ, 'বৃষকেতু'-তে পদ্মাবতী, 'নিমাই-সন্ন্যাসে' নিমাই এবং 'দক্ষযজ্ঞে' সতীরূপে বিনোদিনী মঞ্চে নেমেছেন। (২) 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ও 'বৃষকেতু'—উভয় নাটকের সঙ্গেই একটি অতিরিক্ত প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাট' অভিনীত হয়েছিল। এই প্রহসনে বিনোদিনীর ভূমিকা ছিল বিলাসিনী কারফরমা-র। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ের দিন প্রহসন অভিনয়ের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ম্যানেজারের ঘরে বসেছিলেন—অভিনয় দেখেন নি। 'বৃষকেতুর' সংযুক্ত প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাটে'র অভিনয় তিনি দেখেছিলেন (কথামৃত, ৫ম ভাগ, ১৫৮)। প্রহ্লাদ চরিত্র অভিনয়ের পর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন—'কথামৃতে' তার উল্লেখ আছে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত)।

অক্ষয়কুমার সেন তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন

যা' অন্যত্র, এমন কি বিনোদিনীর 'আমার কথা'তেও নেই। অক্ষয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, তাঁর পুঁথির প্রামাণিকতা শ্রীমা-সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কর্তৃক স্বীকৃত। পুঁথি রচিত হয় ১৮৯৫ সালে। সুতরাং তাঁর বিবরণী অবশ্য-স্বীকার্য। ঘটনাটি হলো এই :

একদিন মঞ্চ মধ্যে প্রভুর গমন।
নিরখিয়া শ্রীগিরিশ পুলকিত মন॥
কি লম্পট, কি কপট হীন হেয় জন
বেশ্যা বারাঙ্গনা জাতি অভিনেত্রীগণ।
আবাহন সকলেই বারে বারে করে।
পদরেণু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে॥
অভিনেতা পুরুষেরা আসিয়া তথায়।
অভয়চরণ রেণু ধরিল মাথায়॥
গিরিশের আশ্বাস বচনে পেয়ে বল।
উপনীত অবশেষে বারাঙ্গনা দল॥
গণনায় ষোলজনা যুবতী প্রখরা।
বসনে ভূষণে সজ্জা মুনিমনোহরা॥
দেখিয়া শ্রীপ্রভুদেব ভাবে ভরা চিত।
ধরিলা মোহন কণ্ঠে শ্যামাগুণ গীত॥
মধুর প্রভুর স্বর পিকপাখী জিনি।
শ্রবণে মোহিত চিত যতেক রমণী॥
তার মধ্যে একজনা বিনোদিনী নাম।
মূর্ছিতা হইয়া পড়ে ধরায় অজ্ঞান॥
প্রসারিত ঠাকুরের শ্রীচরণ তলে।
দিব্যভাব সমুদিত অন্তর অঞ্চলে॥ (৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিনোদিনীর শেষ সাক্ষাৎ অত্যন্ত নাটকীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে রোগশয্যায়। ভক্তগণ বাইরের দর্শকদের বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। দর্শনব্যাকুল, রূপসজ্জানিপুণ অভিনেত্রী বিনোদিনী ইউ-রোপীয় ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে ভক্তদের বিমূঢ় করে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছেন —তারপর তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে বিনোদিনী লিখেছেন : "আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটিতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই, তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন,

'আয় মা বোস,' আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব। এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান।" (৪)

স্বামী সারদানন্দ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন :

"...এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি [কালিপদ ঘোষ] তাহাকে [বিনোদিনীকে] পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই চারিটি তত্ত্বকথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সে-ও অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ পূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্যপরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—৩৫৪-৫৫)

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের এ ব্যাকুলতা থেকে আমরা বিনোদিনীর মানসিক পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত পাই সেটাই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে গিরিশচন্দ্রকে লেখা তাঁর একখানি চিঠি থেকে। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়' রচনাটিতে এই পত্রটির উল্লেখ করেছেন। পত্রে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রকে লিখেছিলেন :

"সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল। রুগ্ন, আশাশূন্য দিন যামিনী একভাবেই যাইতেছে ; কোনরূপ উৎসাহ নাই, নিরাশার জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্তিত স্রোত চলিতেছে। আপনি আমাকে বার বার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য করিতে সংসারে আসে, সকলেই তাহার কার্য করে, আবার কার্য শেষ হইলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়! আপনার এই কথাগুলি কতবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমার জীবন দিয়া আমি তো বুঝিতে পারিলাম না, যে আমার দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য হইয়াছে, আমি কি কার্য করিয়াছি এবং কি কার্য করিতেছি ? আজীবন যাহা করিলাম সেই কি আমার কার্য ? কার্যের কি অবসান হইল না ?" (৫)

শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার আগ্রহ থেকে আমরা যেমন বিনোদিনীর মঞ্চ

পরিত্যাগের পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই, গিরিশচন্দ্রকে লেখা বিনোদিনীর চিঠি থেকে তেমনি তাঁর মঞ্চোত্তর জীবনের সঙ্কেত লাভ করি। জীবনের গূঢ়-রহস্যকে জানার আগ্রহ, আত্মানুসন্ধানের এই প্রবৃত্তি কি শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন? 'বার বার আলোচনার' কথা বিনোদিনী লিখেছেন—গিরিশচন্দ্রই এই সময় তাঁর কাছে রামকৃষ্ণ ভাবনার উপযুক্ত ব্যাখ্যাকার—তাই তাঁর কাছে তিনি এই গভীর প্রশ্নটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন চৈতন্য-লাভের—সে চৈতন্যের আভাস তার পরবর্তী চিন্তাধারা থেকে লাভ করতে পারি।

বিনোদিনীর অকস্মাৎ মঞ্চ ত্যাগের কারণ নাট্য ইতিহাসের গবেষকের কাছে কৌতূহল-জনক সমস্যা। নানা কারণ দেখানো হয়েছে। বিনোদিনীর জীবন নিয়ে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়েছে—সেগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে বিনোদিনীর মঞ্চ পরিত্যাগের সময় নৈকট্যের জন্যে (বিনোদিনীর শেষ অভিনয় ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬) দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা 'নান্দীকার' গোষ্ঠীও তাঁদের 'নটী বিনোদিনী' নাটকে এই যোগসূত্রকে স্বীকার করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগকে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। 'আমার কথা'র সম্পাদনায় শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্যও এই সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

এ সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। বিনোদিনী স্বয়ং যে কারণ প্রদর্শন করেছেন, তাতে রামকৃষ্ণ সংস্রবের উল্লেখ নেই। গিরিশচন্দ্রও বিনোদিনীর মঞ্চত্যাগের অন্য কারণ নির্দেশ করেছেন। তারাসুন্দরীর কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা খান্নাও এই সম্ভাবনার কথা কিছু জানেন না।

প্রত্যক্ষ কারণ যাই হোক না কেন, বিনোদিনীর মঞ্চোত্তর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব যে গভীর সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শ্রীমতী প্রতিভা খান্না বিনোদিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাস করেছেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত দিকটাই তিনি জানেন। কতদিন তাঁর মুখে শুনেছেন 'চৈতন্যলীলা'য় তাঁর অভিনয়ে প্রীত রামকৃষ্ণের আশীর্বাদের কথা। পরবর্তীকালে তাঁর ঘরোয়া জীবনের কথা, তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার কথা তিনি বললেন। শ্রীমতী খান্না জানিয়েছেন :

"বিনোদিনী নিজের বাড়ির তিনতলায় ঠাকুরঘর করেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন রাধাকৃষ্ণ মূর্তি—গোপাল ও শালগ্রাম শিলা। রাধাকৃষ্ণের পূজো করতে আসতেন পুরোহিত। সেই ঠাকুরঘর বাদেও বিনোদিনীর নিজস্ব একটি ছোট ঘর ছিল—তাঁর নিজস্ব পূজাগৃহ। সেখানে ছিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের পট। এখানে পূজা করতেন তিনি নিজে। গীতাপাঠ করতেন, আহ্নিক করতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের পট পূজা করতেন ফুল-

চন্দনাদি দিয়ে।"(৬)

দীর্ঘ ৭৮ বৎসর জীবিত ছিলেন বিনোদিনী। এই সুদীর্ঘ জীবনে বহু আঘাত এসেছে জীবনে। যে মঞ্চের জন্যে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সেই মঞ্চ তাঁকে পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছে, যে সহৃদয় পুরুষ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, একমাত্র কন্যাটিকেও মৃত্যু তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। চারিদিকে অসীম শূন্যতার মধ্যে শান্তির আশ্রয় খুঁজেছেন তাঁর কাছেই, যাঁর কাছে পেয়েছিলেন শান্তির আশ্বাস। দৈনিক সন্ধ্যায় আসতেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতেন। কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে আকুল হয়ে কাঁদতেন।(৭) বেলুড় মঠেও তাঁর যাতায়াত ছিল—তিনিই প্রথম নিয়ে গিয়েছিলেন আর এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে বেলুড় মঠে।

॥ ২ ॥ তারাসুন্দরী—মণিমালা

বিনোদিনীই তারাসুন্দরীকে নিয়ে যান স্টার থিয়েটারে।

একদিন গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটারে ঊর্ধ্বমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রণাম করছিলেন গভীর তন্ময়তায়। প্রণামান্তে নিচের দিকে তাকাতেই দেখেন একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁর পেটের কাছে দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে প্রণাম করছে।

'কে রে তুই?'

'আমি তারা'—মেয়েটির সপ্রতিভ উত্তর।

অর্ধেন্দু মুস্তাফিকে ডেকে গিরিশচন্দ্র বললেন, 'অর্ধেন্দু' মেয়েটার কিছু হবে।'(৮)

গিরিশচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি—সেই তারাই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল তারা হয়েছে, আবার সেই তারাই বৈরাগিনী সাধিকা।

নাচঘর পত্রিকার একটি রচনায় একদিনের একটি অভিনয় রজনীর কথা উল্লেখিত হয়েছে: "১৮৯৪ সালে যে সব ভাগ্যবান দর্শকেরা 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় দেখতে গিছল, তারা অবাক হয়ে দেখে এল যে 'চন্দ্রশেখরে' যে সুন্দরী ষোড়শী অভিনেত্রী শৈবলিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সে সাধারণ অভিনেত্রী নয়। তার অপূর্ব প্রতিভা জগতের যে কোনও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সঙ্গে সমান গর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে! সেদিন বাঙলার ঘরে ঘরে রটে গেল 'হ্যাঁ, অভিনয় করলে বটে; শৈবলিনীর পার্টের তুলনা হয় না! এ্যাকট্রেস যদি কেউ এদেশে জন্মে থাকে তবে সে ঐ মেয়েটি যার নাম তারা। "য়ুরোপে যে অভিনেত্রী যে রঙ্গালয়ের সমস্ত অভিনয়ে নায়িকার অংশে অথবা প্রধানা

স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণা হন, বিলাতী রঙ্গ-সমাজে—তাঁর মর্যাদাসূচক ডাক নাম হয়ে যায়, 'দি স্টার'। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর নাম যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন এমনি করেই সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবে একথা তাঁর গর্ভধারিণী বোধহয় কোনও দিন কল্পনাও করেন নি। 'স্টার' থিয়েটারের 'স্টার—'তারা'র নাম সেদিন শৈবলিনীর ভূমিকা অভিনয়ের পর থেকে বাংলা দেশের প্রত্যেক নাট্যামোদী নরনারীর মুখে মুখে ফিরতে লাগল।"(৯)

'নাচঘরে'র ঐ রচনাটিতেই তারাসুন্দরীকে "জগতের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর মধ্যে অন্যতমা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন :

"বড় নটী বলে বিনোদিনীর খুব নাম শুনি। বৃদ্ধা বিনোদিনীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিন্তু তাঁর অভিনয় আমি কখনো চোখে দেখিনি। তবে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গম্ভীর রসের ভূমিকায় যত অভিনেত্রীকে দেখেছি, তারাসুন্দরীর স্থান নির্দেশ করতে পারি তাঁদের সকলের উপরে। শিল্পী হিসাবে দানীবাবুও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।"

"আয়েসা ও রিজিয়ার ভূমিকায় তারাসুন্দরীকে যিনি দেখেন নি তিনি জীবনের একটি প্রধান উপভোগ্য সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। 'চন্দ্রশেখর' পালায় কেবল প্রেমিকা শৈবলিনী রূপে নয়, উন্মাদিনী রূপেও তিনি অদ্ভুত অভিনয় করতেন, তারও স্মৃতি কোনদিনই ভুলতে পারব না। 'অযোধ্যার বেগমে'ও তিনি নিখুঁত কৌশলে ফুটিয়ে তুলতেন এক অত্যাচারিতা, মহিয়সী মহিলার ছবি। অনূদিত 'ওথেলো' নাটকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় তিনি বৃদ্ধ বয়সেও লীলাময়ী নব-যৌবনীর যে চমৎকার অভিনয় করতেন, তাও ভোলবার নয়।"(১০)

সেকালের তিন প্রধান অভিনেত্রী—বিনোদিনী-তিনকড়ি-তারাসুন্দরীর বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনায় উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "যেমন মধুরে বিনোদিনী ও উৎকটে তিনকড়ি, তেমনি মধুরোৎকট সমন্বয়ে তারাসুন্দরী।...তারাসুন্দরীর আয়েষা অননুকরণীয়, আবার তিনকড়ির জনা অননুসরণীয়। 'শৈবলিনীতে' তারাসুন্দরীর যশো-গৌরবের বিস্তার, 'লেডী ম্যাকবেথে' তিনকড়ির অমোঘ অপ্রতিম প্রতিভার বিকাশ। কাহাকেও কাহাপেক্ষা বড় বা ছোট বলিবার যো নাই।"(১১)

কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারের দেখা 'জনা'র দুই অভিনেত্রী—তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অন্যরকম, "তিনকড়ি দ্বারা অভিনীত 'জনা'র ভূমিকাটি এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায় অনুরুদ্ধ হয়েও তারাসুন্দরী পর্যন্ত তা গ্রহণ করতে সাহসী হন নি।(১২)

"কিন্তু বহুকাল পরে তারাসুন্দরী যখন প্রাচীনা, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনুরোধে

'জনা'র ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। শিশিরকুমার তাঁকে শিক্ষা দেন নি। নিজের ধারণার দ্বারাই এই ভূমিকাটি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অনায়াসেই। তিনকড়ির 'জনা' দেখেছিলুম আমি বার তিনেক। কিন্তু তারাসুন্দরীর 'জনা' হয়েছিল অধিকতর সূক্ষ্ম ও ভাবগভীর।"(১৩)

অপরেশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "বহুকাল পূর্বে মিনার্ভা থিয়েটারের কোন এক সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই 'রিজিয়া'র উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন, যে, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চে তারার রিজিয়ার অভিনয়ের মত অভিনয় তিনি দেখেন নাই।"(১৪)

আর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন :

"তারাসুন্দরীর আশ্চর্য প্রতিভা। ওঁর ওপরে একটি কবিতা রচনার ইচ্ছা আছে।"(১৫)

সে ইচ্ছা পূর্ণ হলে আমরা রঙ্গমঞ্চের এক পতিতা অভিনেত্রীর প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি দেখতে পেতাম।

সেই তারাসুন্দরীকে একদিন বিনোদিনীই নিয়ে গেলেন বেলুড় মঠে। তারাসুন্দরীর সেই দিনের অভিজ্ঞতা আমরা তাঁর মুখ থেকে শুনি :

"যখন মঠে গেলাম, তখন প্রায় দুপুর উত্তীর্ণ হইয়াছে—মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] সেবাঅন্তে বিশ্রাম করিতে যাইবেন—আমরা উভয়ে [বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী] প্রণাম করিলাম। মহারাজ দেখিয়াই বলিলেন, 'এই যে বিনোদ, এই যে তারা,—এসো এসো, এত বেলা করে এলে—মঠের খাওয়া-দাওয়া যে হয়ে গেছে—আগে একটু খবর দিতে হয়, তাইতো—বস বস।' দেখলেম, আমাদের জন্য বড় ব্যস্ত। তাঁহার আদেশে তখনই প্রসাদ আসিল। লুচি ভাজাইবার ব্যবস্থা হইল। আমরা ঠাকুর প্রণাম করিয়া মঠে প্রসাদ পাইলাম। মহারাজের তখন আর বিশ্রাম গ্রহণ করা হইল না, একটি সাধুকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এদের সব মঠের কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও।' পরে পরিচয় হইলে জানিলাম, যে সাধু আমাদের মঠ পরিদর্শন করাইলেন, তাঁহার নাম স্বামী অমৃতানন্দ।

"সাধু সন্ন্যাসীকে ছেলেবেলা হইতেই ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ভয়টাও ছিল খুব বেশী। অপবিত্রা—পতিতা—কি জানি যদি কোন অপরাধ হয়, তাই প্রথমে আমি সঙ্কোচে, ভয়ে-ভয়ে মহারাজের চরণধূলি লইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজের কথায়, তাঁহার ব্যবহারে, আমাদের জন্য তাঁহার ব্যস্ততায়, তাঁহার যত্নে, সে ভয় সঙ্কোচ কোথায় উঠিয়া গেল। মহারাজ বলিলেন, 'এসো না কেন?' আমি বলিলাম, 'ভয়ে মঠে আসতে পারি না।' অতি আগ্রহের সহিত মহারাজ বলিলেন, 'ভয়—ঠাকুরের কাছে আসবে, তার আর ভয় কি? আমরা সকলেই তো ঠাকুরের ছেলে-

মেয়ে—ভয় কি? যখন ইচ্ছা হবে এসো। মা, তিনি তো খোলটা দেখেন না—ভেতরটা দেখেন। তাঁর কাছে তো কোন সঙ্কোচ নাই।' স্বামী প্রেমানন্দ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরের কাছে আসতে কারুর বাধা নাই।'

"বৈকালে চা খাইয়া মঠ হইতে ফিরিলাম। আসিবার সময় মহারাজ বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এসো, আজ বড় কষ্ট হল, একদিন ভাল করে প্রসাদ পেও।' এই আমার প্রথম দর্শন—এই আমার প্রথম বন্ধন।" (১৬)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছেই তারাসুন্দরী দীক্ষালাভ করেছেন। যখন ভুবনেশ্বরে ধর্মশালায় ছিলেন, সেই সময় নবগঠিত ভুবনেশ্বর মঠে ব্রহ্মানন্দের কাছে তিনি দৈনিক যেতেন। তারাসুন্দরী-কন্যা প্রতিভা দেবী লিখেছেন :

"সেই সময় মা রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নিকট বহু তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন ও নানা অলৌকিক অনুভূতি ও দর্শনাদি লাভ করেন এবং জীবনের লক্ষ্যস্থলের সন্ধান পান। ত্যাগ-মার্গকেই বাছিয়া লইলেন। শুনিয়াছি মার তখন ৩৩ বছর বয়স। তখন হইতেই মা সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। মোটা গড়া-কাপড় পরিতেন। ভূমিতে শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই কম্বলশয্যা, একবেলা এক মুষ্টি আতপ চাল দুধের মধ্যে সিদ্ধ করিয়া একবার মাত্র আহার করিতেন, রাত্রে কোন-দিন একগাল মুড়ি-মুড়কী অথবা অল্প একটু মিষ্টান্ন অথবা শুধুই একগ্লাস জল খাইয়া রাত্রের আহার সমাপ্ত করিতেন।...রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পর নিজেকে খুব অসহায় মনে করিয়াছিলেন। জগৎটা যেন পাল্টাইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়া-ছিলেন। শোকে দুঃখে মৃতপ্রায়, শয্যাগতা। অভিনয় ছাড়িয়া দিলেন। আর যেন সংসারে রহিবেন না, এমন পাগলের মত অবস্থা।" (১৭)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোভাবের পরে স্বামী শিবানন্দের নির্দেশে তারাসুন্দরী ভুবনেশ্বরে "রাখালকুঞ্জে" (ব্রহ্মানন্দের নামানুসারে) স্মৃতিমন্দির নির্মাণ শুরু করেন। স্বামী ব্রহ্মা-নন্দ তাঁর জীবদ্দশায় এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বলেছিলেন "সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান—গোমুখীভূমি, ঈশানে ঈশান (ভুবনেশ্বরের মন্দির)।" (১৮)

তারাসুন্দরীর উপাসনা পদ্ধতি ছিল অভিনব। কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে —পাশের স্কুলবাড়িতে আগুন লেগেছে, ওঁর গোয়ালঘর বাঁচাবার জন্যে পাড়ার লোক জড় হয়েছে, তবু ওঁর ধ্যান ভাঙে নি—আবার কখনো তাঁর শিল্পাজীবনের অর্ঘ্যে পূজা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। একদিনের কথা, স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) দুপুরবেলা "রাখালকুঞ্জে" গেছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্ত—জনপ্রাণীর সাড়া নেই। মন্দির দ্বারও বন্ধ—জানলাগুলিও বন্ধ। খোকা মহারাজ ইতঃস্তত করছেন—ভাবছেন ফিরে যাবেন। মন্দিরের জানলার একটি কপাট খোলা দেখে সেখানে উপস্থিত হয়ে

মন্দিরের মধ্যে তাকিয়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে লীলায়িত ছন্দে নেচে চলেছেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য তারাসুন্দরী। সাধিকা যেন তাঁর শিল্পীসত্তার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর বিচিত্র পূজাভঙ্গীতে। খোকা মহারাজ সে আরাধনায় বিঘ্ন ঘটালেন না। নিঃসাড়ে ফিরে গেলেন মঠে। (১৯)

তারাসুন্দরীর জীবনের শেষ বারো বছর কেটেছে এই 'রাখালকুঞ্জে'। থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন—থিয়েটারের যা' কিছু স্মৃতিচিহ্ন ছিল একদিন আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো বলাই মহারাজের পরামর্শে। এ সময় শিশিরকুমারই তাঁর চিকিৎসাব্যবস্থার জন্যে সব রকম উদ্যোগ আয়োজন ও সহায়তা করেছেন কিন্তু তখন আর শেষদিনের বিলম্ব নেই। সেই শেষ দিনটির কথা শুনি তাঁর কন্যার কাছ থেকে :

"চৈত্রমাস—রামনবমীর পরের দিন, সকাল ১০টা ৫৫ মিনিট। মা আমায় বললেন, 'গীতা পাঠ কর, আজ আর আমি পড়তে পারছি না, শুনব।' আমি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করলাম।...মা আমায় বললেন, 'সেই রঘুপতি রাঘব গানটা গা ত!' আমি মার বুকের কাছে মাটিতে বসে সেই গানটা গাইছি, মা শুনছেন। আশপাশের অনেকেই এসে গেছেন, তাঁরাও আমার সাথে গলা মিলিয়ে উচ্চস্বরে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' বলছেন। আবার মা এক ঝলক রক্ত বমন করলেন। নিজের হাতে পিকদানী টেনে নিয়ে—যেন পানের পিক ফেললেন। বালিশে মাথাটা রাখলেন—সামনেই ঠাকুরের একটা ছবি ছিল, তার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে শব্দবিহীন হা হা হাসিতে যেন লুটিয়ে পড়লেন। সব শেষ...সমাপ্তি একটি সার্থক সাধিকা ও অভিনেত্রী জীবনের —সমাপ্তি একটি ব্যর্থ বঞ্চিতা সমান-নিপীড়িত নারী জীবনের।" (২০)

বিনোদিনীর মতো তারাসুন্দরী ও সুলেখিকা। তাঁর রচনার মধ্যে আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুশোচনার একটি অকৃত্রিম সুর সুস্পষ্ট। 'প্রবাহে'র রূপান্তর' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

"শ্মশান জীবন মম নন্দনকানন সম
পাপস্মৃতি দূরে গেছে ফুটেছে নয়ন।
জীবনের গুরুভার, কাতর করে না আর
কে আমার ঘুচাইল ভ্রম আচ্ছাদন?
ক্ষুদ্রমতি নারীপ্রাণ, অর্থ আশা অভিমান
কালের কুটিল স্রোতে,, হয়ে দিশাহারা।
অন্ধকার আলিঙ্গন, করিয়াছি আজীবন
প্রলোভনে সঁপি মন হইয়াছি সারা।...

ভবিষ্যৎ বিভীষিকা, প্রেতময়ী মরীচিকা
প্রতিকৃতি যদি তার, মিলেছে আমার।
যৌবনে প্রবৃত্তি যত, সৌরভে করবে রত
পরিমল পবিত্রতা কর অনুসার ॥ (২১)

তারাসুন্দরীর কবিতা সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অভিমত "পঞ্চান্ন বৎসর আগেকার দিনে অধিকাংশ সুপরিচিত কবিও তার চেয়ে ভালো কবিতা রচনা করতে পারতেন না। তারাসুন্দরীর যে সামান্য গদ্য রচনা আমাদের হাত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তাতে দেখতে পাই—সে রচনারীতি, সমকালীন গদ্যরচনার তুলনায় কোনও অংশে ন্যূন নয়।" (২২)

বিনোদিনীর নাম এখন মুখে মুখে—যাত্রা থিয়েটারের কল্যাণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদলাভের দিব্য নাটকীয় কাহিনীর জন্যে। কিন্তু অভিনেত্রী হিসাবে তারাসুন্দরী যে খ্যাতির অধিকারিনী হয়েছিলেন তাতে তাঁকে কোনও অংশে ছোট বলে মনে করার কারণ নেই। কারও কারও মতে তারাসুন্দরী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের অন্যতমা। তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্যে যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের রূপটি ফুটে ওঠে তা সমকালীন সকল অভিনেত্রী থেকে তাঁকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তারাসুন্দরী আকৃষ্ট করলেন আর এক অভিনেত্রী—মণিমালাকে।

মণিমালা তখন সবে থিয়েটারে ঢুকেছে। অল্প বয়স—সত্যকার সুন্দরী। (২৩) তাঁর অভিভাবক লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় দিনের বেলা অফিসে কাজ করেন রাত্রে থিয়েটার। তারাসুন্দরী ও অপরেশ মুখোপাধ্যায় তখন বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ—প্রায়ই মঠ থেকে প্রসাদ এনে থিয়েটারের সকলকে ভাগ করে খাওয়াতেন। সে প্রসাদ সকলেই পরম আগ্রহে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন—একমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্মীকান্ত। তিনি মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিতেন 'আমি মানুষের এঁটো খাই না।'

লক্ষ্মীকান্ত একসময় মণিমালাকে নিয়ে তারাসুন্দরীরই বাড়িতে এলেন বাস করতে। সেই সময় মণিমালা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হলেন তারাসুন্দরীর ভক্তি-ভাবনার দিকে। লক্ষ্মীকান্তের মধ্যেও দেখা দিল পরিবর্তন।

এক উৎসবে তারাসুন্দরী গেছেন বেলুড় মঠে। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে বেলা ৪টার সময় যখন ফেরার তোড়জোড় করছেন, তখন তাঁর কাছে খবর গেল, এক ভদ্রলোক এবং একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তারাসুন্দরী এসে দেখেন—লক্ষ্মীকান্ত ও মণিমালা। লক্ষ্মীকান্ত অত্যন্ত অসুস্থ—দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে তাঁর গা-হাত-পা কাঁপছে। তাড়াতাড়ি তাঁদের মঠের সব কিছু দেখাবার ব্যবস্থা

করা হলো। প্রবল আগ্রহ নিয়ে সেই অসুস্থ শরীরেই লক্ষ্মীকান্ত সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন —ভক্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করলেন, অবশেষে শিবানন্দ স্বামীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন, তাঁদের দীক্ষা দেবার। কিন্তু শরীর সুস্থ না হলে দীক্ষা তো হবে না। দিনক্ষণ দেখে মণিমালার দীক্ষার ব্যবস্থা হলো—ঠিক হলো, লক্ষ্মীকান্ত সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁরও দীক্ষার ব্যবস্থা হবে। নির্দিষ্ট দিনে মণিমালা মন্ত্র পেলেন কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত আর সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। মৃত্যুকালে মণিমালার কাছে তাঁর খেদ 'আমি চললাম, এ জীবনে আমার আর ঠাকুরের আশ্রয় পাওয়া হল না। তুমি পুণ্যবতী, তুমি তাঁর কৃপা পেয়েছ।' মণিমালাও আর বেশীদিন বাঁচেন নি। সে এক অপূর্ব মৃত্যু—শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে করতে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ল। (২৪)

॥ ৩ ॥ হাবু দত্ত—সুরেন দত্ত—পুলিন মিত্র—অঘোর পাঠক—আলাউদ্দীন খাঁ—আলি আকবর—রবিশঙ্কর

অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত) সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই। থিয়েটারে তাঁর খ্যাতি 'বাদ্যাচার্য' বলে—সব রকমের যন্ত্র সঙ্গীতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে যখন বঙ্গ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে অভিনয় বা অভিনয়-সংক্রান্ত কাজ শুরু করার পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তখন হাবু দত্তও নিশ্চয় অন্যের দেখাদেখি তা করেছেন কিন্তু সে-ত নিতান্ত নিয়মরক্ষা মাত্র। নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রে যেমন তাঁর দক্ষতা তেমনি অনায়াস-নৈপুণ্য নানাবিধ নেশাতেও। মদ তো আছেই—গাঁজা, গুলি, চণ্ডু—কোনোটাতেই পিছ-পা নন তিনি। 'বাদ্যসম্রাট'—'আবগারী সম্রাট'-ও বটেন।

এ-হেন আত্মীয়টিকে নিয়ে একদিন নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ-সকাশে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন রোগশয্যায়—তিরোভাবের আর বিশেষ বিলম্ব নেই। নরেন্দ্রনাথ তখন চেনাজানা যাকে পান, সকলকেই নিয়ে আসেন—তাঁদের মুক্তির পথ পাইয়ে দেবার জন্যে। সেই উদ্দেশ্যে হাবুবাবুকেও এনে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন 'একটু ছুঁয়ে দিন।' প্রথম তিনি কিছুতেই রাজী নন—অসুস্থ শরীর—অসহ্য কষ্ট—ও-সব কি আর এখন ভালো লাগে! কিন্তু নরেন্দ্রনাথও ছাড়বেন না। অবশেষে নিরুপায় শ্রীরামকৃষ্ণ আঙুল ছোঁয়ালেন হাবু দত্তের বুকে। মুহূর্তের মধ্যে কী যেন একটা ঘটে গেল! হাবু দত্ত নির্বাক, জড়পদার্থের মতো হয়ে গেলেন। দু'ঘণ্টা সেইভাবে কেটে গেল দেখে নরেন্দ্রনাথও ভয় পেয়ে গেলেন। আসবার সময় নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধি করে

হাবুবাবুর গাঁজার কলকে আর গাঁজা সঙ্গে এনেছিলেন—কি জানি, নেশাখোর মানুষ, যদি দরকার লাগে! এখন বে-গতিক দেখে, অনেক কষ্টে তাঁর চেতনা সঞ্চার করে নিচের বাগানে নিয়ে এলেন—কানের কাছে চিৎকার করে বললেন 'দাদা, তোর জন্যে গাঁজা এনেছি—গাঁজা খাবি?' কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে আচ্ছন্ন-গলায় হাবু দত্ত বললেন 'আমি খুব বুঁদ-নেশায় ছিলাম, গাঁজার নেশা ফিকে নেশা, ঐ বুঁদ নেশাটা চাই।' (২৫)

পরবর্তী জীবনেও এ নেশার আচ্ছন্নতা কাটে নি। কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহা-সমাধির পর মহাশ্মশানে দেহসৎকারের সময় হাবুদত্ত একখণ্ড অস্থি সংগ্রহ করে-ছিলেন—অবশিষ্ট জীবন সেই অস্থি পূজা করেছেন। উত্তর কালে দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই।

রামকৃষ্ণোৎসবে (কাঁকুড় গাছি) একবার তাঁর রচিত একটি গানও গাওয়া হয়েছিল :

এই কি ছিল মনে গুণমণি
সাধে সাধি বাদ হানিলে অশনি ॥
এলে তাপিতে নিতে কোলে
দেখ দেখ হে অনলে
হৃদয় কমল জ্বলে দিবা রজনী ॥…(২৬)

নরেন্দ্রনাথের আর এক সম্পর্কিত ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ দত্ত থিয়েটারে ক্ল্যারিওনেট ও হার-মোনিয়াম বাজাতেন। প্রথম বয়সে ইনি সপরিবারে খৃষ্টান হন। শেষ বয়সে দীক্ষা নেন স্বামী সারদানন্দের কাছে। (২৭)

গিরিশযুগে রঙ্গমঞ্চের প্রায় সকলেই এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে—তাঁদের সাধ্য মতো পূজার নিদর্শন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বাদ্যাচার্য অমৃতলাল দত্তের মতো রামতারণ সান্যালকেও সঙ্গীতাচার্য বলা যেতে পারে। নানা গীতিনাট্যের সুরতাল-নৃত্যের তিনি ছিলেন শিক্ষা-দাতা। গিরিশচন্দ্রের নাটকের গানগুলিতে তাঁর সুরারোপ এখনো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রামতারণের শক্তির স্ফুরণ তাঁর গানে—সেই গান দিয়েই তিনি তুষ্ট করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। বিবেকানন্দের সঙ্গেও একত্রে গান শুনিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। (২৮)

রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। (২৯)

স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'দুই জাহাজের' একটি (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই পুলিন মিত্রকেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একটি সঙ্গীতের প্রথম পঙক্তি 'পোহাল দুখ রজনী' দিয়ে সমগ্র গানটি

রচনা করতে বলেছিলেন। পুলিনকৃষ্ণ নিজে গীত রচনা না করে গিরিশচন্দ্রকে দিয়ে রচনা করিয়ে নিজে সুরারোপ করে গেয়ে শুনিয়েছিলেন রামকৃষ্ণানন্দকে। (৩০)

আর এক সুগায়ক অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠক। রঙ্গালয়ে তাঁর অভিনয় দক্ষতার চেয়ে সঙ্গীত পারদর্শিতাই অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবে তাঁর রচিত একটি সঙ্গীত গীত হতে দেখা যায় :—

—(একতালা)—

যাতনা জলধি হইতে পার।
প্রভু তোমার নাম করেছি সার॥
রামকৃষ্ণ নাম যতই বলি।
প্রাণ হয় যে ততই কুতূহলী॥
(এমন মধুর নাম কে দিয়েছে)
(রামকৃষ্ণ নাম)
ওই নামেতে কি সুধা আছে।
ও ভাই যে নিয়েছে সে মজেছে॥
(ওর পাষাণ প্রাণ যে যায় রে গলে)
(ওই নামেতে)
ও নাম সদাই যে জন মুখে বলে।
সে এড়ায় শমন অবহেলে॥
(মধুর নামের গুণে)

—(ধামার)—

এ জীবনে তোমার চরণ সার।
তোমা বই কি গতি আছে আর॥
ভবার্ণবে তুমিই কর্ণধার—
ভবসিন্ধু অপার জলে কর পার॥

—(মেলতা)—

আমি চাই কেবল রাঙা তোমার শ্রীচরণ॥ (৩১)

অঘোরনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দের বারাণসীতে অবস্থানকালে অঘোরনাথ সেখানে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠের সুমধুর ভজন সঙ্গীতে তৃপ্ত হতেন ব্রহ্মানন্দ (রাজা মহারাজ : স্বামী নরোত্তমানন্দ, ৯৬)।

সঙ্গীত জগতের এক বাদশাহ মিনার্ভা থিয়েটারে দশটাকা বেতনে চাকরী করেছিলেন কিছুদিন, যাঁকে হাবুদত্তের সুপারিশে গিরিশচন্দ্র নিয়েছিলেন থিয়েটারে এবং নতুন নাম দিয়েছিলেন প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস—সেই প্রসন্নকুমার কালক্রমে যখন ওস্তাদ আলা-উদ্দীন খাঁ হয়ে সঙ্গীত-জগতের অধীশ্বর হয়েছেন তখন কলকাতায় এলে চলে যেতেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, বেলুড় মঠে, বেদান্ত মঠে। (৩২)

আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের পারিবারিক জীবনে শক্তি আরাধনার একটা ঐতিহ্য ছিল। হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হীরু বাবু)-এর কাছে আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

"আগে আমরা হিন্দুই ছিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষ ডাকাতি করতেন। তখনকার দিনের ডাকাতরা ছিল কালীভক্ত।" (৩৩)

খাঁ সাহেবের পিতা ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক। বড় ছেলে জমিরুদ্দিন ভালো ঢোল বাজাতে পারতেন। মেজ আফতাবুদ্দিন সব রকমের যন্ত্র বাজাতে এবং গান গাইতে পারতেন। সবাই তাকে বলতো ফকীর আফতাবুদ্দিন। শাক্ত সাধকের মতোই ছিল তাঁর আচরণ—ঝাঁকড়া চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গান করতে করতে সমাধিস্থ হতেন। বেলুড় মঠেও তাঁর যাতায়াত ছিল—অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মুখেই তাঁর কাহিনী শোনা যাবে। গ্রামের বাড়িতে 'কালী' নাম করতে করতে বেলগাছ তলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সেজ আলাউদ্দীন—পৈতৃক ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কালীভক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন :

"আমি আলাউদ্দীনের সঙ্গে দারুণ মিশেছি। উনি এখানে (বেদান্ত মঠে) অনেকবার এসেছেন। ঠাট্টাও করেছি অনেক। উনি এখানে বেলগাছের নিচে নামাজ করতেন আবার পরমুহূর্তেই মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করতেন। আমরা বলতাম 'দুটো কেন ?' হেসে বলতেন 'রেখেছি দুটোই।'

হীরু গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন : "খাঁ সাহেবের গলায় একটা হার ছিল—তাতে (লকেটে) একদিকে পরমহংসদেব, অন্য দিকে শ্রীমা।"

হীরুবাবু আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভক্তির অনেকগুলি কাহিনী শোনালেন। একবার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রাম বন্দ্যোপাধ্যায় (সন্তোষ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পুত্র) তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ-পন্থী এক সন্ন্যাসীর আলমবাজারের আশ্রমে খাঁ সাহেবের একটি আসরের ব্যবস্থা করেন। হীরুবাবুও খাঁ সাহেবের সঙ্গে গেছেন সঙ্গত করতে। হীরুবাবু বললেন "সন্ধ্যার সময় আমরা গেলাম। আশ্রমবাসীরা তখন ভজন করছিলেন—তারপর আরতি হলো।…সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার ছবি…ও কালী-

মূর্তি ছিল। আমার এটা মনে আছে, বাজাতে বাজাতে খাঁ সাহেব 'মা' 'মা' করতে করতে তন্ময় হয়ে গেলেন এবং হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। 'মা কি বাজাব?'—মনে হলো যেন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ আবার বাজালেন, কিছুক্ষণ আলাপ করলেন, তারপর চুপ করে যেন প্রার্থনা করতে লাগলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম করলেন—ঠাকুরের নামে যে সব মন্ত্র আছে, গান আছে, সেগুলি মুখস্ত পড়লেন—পড়ে গান গাইলেন।···এ-সব আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"আর একবার—১৯৫৩ সাল। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যেখানকার কর্মকর্তা—আমি খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাজিয়েছিলাম। সেদিন খাঁ সাহেবের পরণে ছিল সন্ন্যাসীর পোষাক। সেই পোষাক পরে যখন জোড়হাত করে রামকৃষ্ণ মূর্তিতে প্রণাম করছিলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন উনি ওখানকারই একজন সন্ন্যাসী।" (৩৪)

আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের পুত্র আলি আকবর খাঁ তাঁদের বংশানুক্রমিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ওঁর সঙ্গীত আসরের সঙ্গী যে কোটাটিতে তিনি মেরজাপ, তার ইত্যাদি নিয়ে যান "তার ভেতরে তিনটি ছবি আছে। মধ্যে মা কালী, একপাশে ওঁর বাবার, অন্যপাশে ওঁব মায়ের ছবি।" (৩৫)

আলি আকবর বর্তমানে কালিফোর্ণিয়ায় একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতিতেও কতখানি নিষ্ঠাবান হয়ে উঠেছে সেই প্রসঙ্গ আলোচনা-ক্রমে তাঁদের ঘরানায় কালী-শ্রীরামকৃষ্ণের স্থানেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"আমাদেরই প্রথায় বাইরে জুতো খুলে ওরা [বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা] ক্লাসে ঢোকে—ভূমিষ্ঠ হয়ে সারদা-মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা কালীর ছবিকে ও শিক্ষকদের প্রণাম করে।··· ওরা বুঝেছে ভারতীয় সঙ্গীত নিছক চিত্ত বিনোদনের বস্তু নয়—এ হলো ঈশ্বরের পূজা।" (৩৬)

আলাউদ্দীন ঘরানার শিক্ষাগারে সে ঈশ্বর কালী এবং তাঁর স্নেহের সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই ঈশ্বরের কাছে অন্তত একবারের জন্যও ছুটে যাবেন রবিশঙ্কর—যখনই তিনি কলকাতায় আসবেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন :

"···রবিশঙ্করের চিরদিনের অবসেসন ওঁর মা কালী, রামকৃষ্ণ দেব, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। কলকাতায় এলে অন্তত একবারের মতো দক্ষিণেশ্বর যাবেনই। মন্দিরের চাতালে গিয়ে চোখ বুজে বসেন। দু'একটা গানও হয়ত মনে মনে গুণগুণ করেন। এবারেও (১৯৭৭) নেতাজী স্টেডিয়ামে বাজনার পরের দিন গিয়েছিলেন। পুজো দিয়ে প্রণাম করে মন্দিরটার আশপাশ ঘুরলেন। ঠাকুরের ঘরেও একবার বসলেন।

পঞ্চবটীর চারপাশে লোহার বেড়া দেখে বললেন, চিড়িয়াখানার মতো জাল ছাড়া কি আর কিছুই পেলেন না এঁরা? পঞ্চবটীর সবখানে লোকে বেসাতি করছে, বাদাম খেয়ে খোসা ছড়াচ্ছে দেখে বললেন, ছোট থেকেই দেখে আসছি কী সুন্দর জায়গাটা। কিন্তু মার মন্দিরের এরকম হাল হচ্ছে কেন? সমস্ত ব্যবসা আর আবর্জনা কি পঞ্চবটীতে টেনে না আনলেই নয়?

"খুব ভালবাসেন দক্ষিণেশ্বরকে রবিশঙ্কর, তাই ব্যথা পান। তারপর ব্যথা ভুলে যান শাঁখ ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে শুনতে। বড় ফোঁটা কেটে বসেন শিশুর মতো।" (৩৭)

শৈশব থেকেই রবিশঙ্কর ভালবেসেছেন দক্ষিণশ্বরকে—কালীকে—শ্রীরামকৃষ্ণকে। সে ভালবাসা অবশ্যই ইন্ধন পেয়েছে আলাউদ্দীন খাঁর সান্নিধ্যে।

॥ ৪ ॥ অপরেশ মুখোপাধ্যায়

চিকাগো ধর্মসভায় অভূতপূর্ব সাফল্যের পর দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় ফিরলেন তখন রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তাঁকে জনসম্বর্ধনা জানানো হলো। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রিপন কলেজ পর্যন্ত অগণিত মানুষের ভিড়। কয়েকজন যুবক ঘোড়ার গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিজেরাই গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন রিপন কলেজ পর্যন্ত। সেই যুবকদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ কাঞ্জিলাল, শরচ্চন্দ্র সরকার, যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত (দত্তবাবু) অপরেশ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপদ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ বসু। প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে অপরেশচন্দ্র পড়ে যান জনতার পায়ের তলায়। উৎসাহী দর্শকের পায়ের চাপে হয়ত সেইদিনই তার ইহলীলা সাঙ্গ হতো—অনেক কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁর নট জীবনের প্রথম দীক্ষাদাতা মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। কিন্তু এর ফলে তাঁকে সারাজীবন ভুগতে হয়েছে 'সায়টিকা'য়। (৩৮)

১৮৭৫ সালে ১৯ জুলাই অপরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন মহেশতলায় তাঁর মামার বাড়িতে। পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। স্কুল জীবনে থিয়েটারের সংস্পর্শে এসেছেন—ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা এনট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে। এর পরে মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তকে গুরু করে 'বীণা' মঞ্চ ভাড়া নিয়ে 'প্যাণ্ডোরা থিয়েটার' খোলার উদ্যোগ—কিন্তু সে উদ্যোগ সফল হয় নি। ক্রমশ ইলিসিয়াম থিয়েটারে কিছুকাল থাকার পর মনোমোহন পাঁড়ের সহায়তায় মিনার্ভায় এসে যোগ দেন।

যে মনীন্দ্রকৃষ্ণ অপরেশচন্দ্রকে প্রথম থিয়েটারের সংস্পর্শে নিয়ে আসেন তিনিই আবার

তাঁকে নিয়ে যান আলমবাজার মঠে। মঠের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে—শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসীভক্তদের সান্নিধ্য ও ভালবাসা লাভ করেছেন—পরিচিত হয়েছেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। এই সময় তাঁর অনেক রাত কেটেছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে—পঞ্চবটীতলায়—নহবৎখানায়—গঙ্গার ধারে। অপরেশচন্দ্র সেদিনের কথা লিখেছেন :

"তখন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে জগৎ তোলপাড়। [দক্ষিণেশ্বরে] মাথার উপর মুক্ত আকাশ, সম্মুখে কলনাদিনী, পূত প্রবাহিনী জ্যোৎস্নাস্নাতা ভাগীরথী, আর চারদিকে ফোটা-ফুলের আকুল করা গন্ধ। উচ্চে, উচ্চে, কত উচ্চে মনকে ছাড়িয়া দিতাম।" (৩৯)

—সেই সময় মনে মনে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নি। সেবায় সন্তুষ্ট করে স্বামী যোগানন্দের কাছে বর চেয়েছিলেন, "আমি যেন বড় অভিনেতা হতে পারি।"

বড় অভিনেতাই হয়েছিলেন তিনি। শুধু বড় অভিনেতা নয়—গিরিশযুগের ধারা অনুসরণ করে নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ হয়েছেন—খ্যাতিও অর্জন করেছেন যথেষ্ট।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন :

"রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্র ব্যতীত—আর যে দুইজন সর্ববিষয়ে রঙ্গমঞ্চের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, দ্বিতীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের তুলনায় অর্ধেন্দুশেখর, অমৃত মিত্র, অমর দত্ত, দানীবাবু, শিশিরবাবু—ইঁহারা কেহই নামকরা নাট্যকার ছিলেন না। অপরেশচন্দ্র স্টার থিয়েটারকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।...প্রায় ত্রিশখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। রামানুজ, কর্ণার্জুন, মন্ত্রশক্তি ও পোষ্যপুত্র [শেষোক্ত দুইখানি অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ] বহুলোককে আনন্দপ্রদান করিয়াছে। আর অভিনেতা হিসাবেও তিনি গিরিশ, অর্ধেন্দু, অমৃতলাল, সুরেন্দ্রনাথের [দানীবাবু] মতো না হইলেও একজন স্বাভাবিক অভিনেতা। মহাব্রত, বশিষ্ঠ, মূলরাজ, সিংহবাহু প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধের ভূমিকায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অর্জুন প্রভৃতি ভূমিকাতেও যেমন, করুণাময়, বিদূষক, দেবেন (বঙ্গনারী) শঙ্কর, শক্তসিংহেও তেমনি দক্ষ। সুকণ্ঠ ও সুচেহারায় তাঁহাকে বেশ মানাইত।" (৪০)

অভিনেতা হিসাবে অপরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। বৃদ্ধবয়সে রোগের আক্রমণে যখন প্রায় শক্তিহীন তখনই—রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভায়' রসিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—সে অভিনয় দেখার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রসিকবাবু বলে ডাকতেন।

'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' এর সম্পাদক স্বপন মজুমদার নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"নাট্যকার হিসেবে অপরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রেরই অনুগামী—তাঁর মতো প্রতিভাবান না হলেও দক্ষ। সম্ভবত নিজের ক্ষমতার এই সীমা তাঁর জানা ছিলো বলেই পৌরাণিক ধারাতে তিনি সকল মৌলিক নাটক রচনা করতে পেরেছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে হয় অনুবাদ, না-হয় নাট্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাটকে অনন্যত কাব্য তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে না, কিন্তু সে ক্ষতি অনেকাংশে পূরণ করে তাঁর নাটকের সংঘাত ও গতির তীব্রতা। নাটকের ব্যাকরণ তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত। সংলাপ আন্তরিক ও আবেগ মন্দ্র। মৃগাঙ্কের [মন্ত্রশক্তি] ভূমিকায় অভিনয়কালে স্বয়ং শিশিরকুমার স্বীকার করেছিলেন অপরেশচন্দ্রের সংলাপ রচনার কুশলতা। ··তবে নাট্যরচনায় তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ বোধহয় বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ।" (৪১)

অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' দর্শক সমাজে যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল তার প্রমাণ মাত্র তিন বছরের মধ্যে ২৫০ রাত্রি নাটকটির অভিনয়। সমকালীন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই 'কর্ণার্জুনে'র শততম অভিনয় রজনীতে নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় তাঁকে 'নাট্যবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। (৪২)

কৈশোর ও যৌবনে রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের যে সংযোগ গড়ে উঠেছিল, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে। অপরাধবোধে জর্জরিত অপরেশ মঠ থেকে দূরে সরে থেকেছেন। তিনি লিখেছেন :

"আর সেদিক [মঠ] মাড়াই না। চোরের মতো লুকাইয়া এক আধ বছর হয়তো বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখিয়া আস্তানায় ফিরি। দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে ? অনুকূল বাতাসে ঘুড়ী তখন তরতর করিয়া উঠিয়া বুঁদ হইয়া গিয়াছে। আমি তখন সর্ববিষয়ে পুরা থিয়েটার-ওয়ালা।" (৪৩)

বার চোদ্দ বছর বাদে অপরেশচন্দ্রের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মতিলালের আগ্রহে আবার তাঁর মঠে যাতায়াত শুরু। অপরেশ লিখেছেন : "মতিলাল ছাড়ে না, একরকম জোর করিয়াই আমাকে 'উদ্বোধনে' লইয়া গেল। বহুকাল পরে স্বামী সারদানন্দের পদধূলি লইলাম। তখন 'রামানুজ' লিখিতেছি, মতিলালই শশিমহারাজের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর) রামানুজ-চরিত আনিয়া দিয়াছে। আর তাহার নিত্য তাগাদা চলিতেছে 'কি হইল, কতদূর লেখা হইল ?' অঙ্কের পর অঙ্ক লেখা হয় আর স্বামী সারদানন্দকে শুনাইয়া আসি, তিনি উৎসাহ দেন, আশীর্বাদ করেন।" (৪৪)

'রামানুজ' রচনাকালে অপরেশচন্দ্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের যে আনুকূল্য লাভ করেছিলেন তার কথা পূর্বেই বলেছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনীতে এই 'রামানুজ' নাটক দেখা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলা হয়েছে : "১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] মিনার্ভায় 'রামানুজ' প্রথম অভিনয়

দেখিতে যান। রামানুজ আচণ্ডালে নাম বিলাইতেছেন এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন। এই 'রামানুজ' নাটক দেখিবার পর হইতেই তিনি কৃপার ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। দলে দলে ভক্তগণ দীক্ষা লইতে লাগিল।" [স্বামী ব্রহ্মানন্দ (জীবনী) উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ—৩৩৪]

একথা ঠিক অধ্যাত্মপুরুষেরা দৈবনির্দেশে কিংবা আভ্যন্তর প্রেরণায় পরিচালিত। তবু বাইরের নিমিত্তের দ্বারা তাঁদের ভাবের উৎস মুখ খুলে যায়। 'উদ্বোধন' প্রকাশিত এই জীবনীতে দেখতে পাই থিয়েটারের অভিনয়ই তাঁর 'কৃপার ভাণ্ডার' খুলে দেওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ হয়েছে। নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের পক্ষে এটা অবশ্যই গৌরবের।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছেই অপরেশচন্দ্র দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে ভুবনেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'রাখালকুঞ্জ' (স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে)। জামতাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে অপরেশচন্দ্রের কেনা জমিতে।

শ্রীমতী প্রতিভা খান্না (অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীর কন্যা) জানিয়েছেন, "তাঁর [অপরেশের] ধর্মাচরণের ব্যাপারে বাহ্যভাব ছিল না। যা' কিছু ভিতরে ভিতরে। মঠের সকল মহারাজের সঙ্গেই তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল—শরৎ মহারাজের সঙ্গে ছিল বিশেষ হৃদ্যতা। বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ না করলেও বোঝা যেত—মঠ [বেলুড] বললে সব কিছু উজাড় করে দিতে পারতেন।" (৪৫)

॥ ৫ ॥ দানীবাবু

গিরিশচন্দ্র চান নি, পুত্র দানী (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) থিয়েটারে যোগদান করুক। একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার যে শিক্ষা ও রুচি থাকার প্রয়োজন তা দানীবাবুর ছিল না। দানীবাবু নিজেই অকুণ্ঠভাবে নিজেকে 'মূর্খ' 'নিরক্ষর' বলতে দ্বিধা করেন নি। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, "দানীবাবুর মুখে একদিনও শুনিনি শিল্পীজনোচিত কথাবার্তা। তিনি ছিলেন একেবারে যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মত। আর্ট বা সাহিত্য নিয়ে একটু মাথা ঘামাতেন না, যে-সব নাটকে নিজে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন, তা নিয়েও কোনদিন আলোচনা করেন নি। আলোচনা করবার মত মনীষাই ছিল না তাঁর। সাধারণ কথাবার্তাতেও থাকত না কিছু রস-কষ।" (৪৬)

এ-হেন পুত্র যে সফল অভিনেতা হতে পারবে না এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিত ছিলেন বলেই তাঁর ইচ্ছা ছিল না দানীবাবু মঞ্চে যোগদান করুন। অথচ গিরিশের সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই একদিন দানীবাবু খ্যাতির শিখরে উঠেছেন এমন কি

গিরিশেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন "গিরিশযুগে মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি পরিপূর্ণ গৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তখন যাঁরা তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই বলতে পারবেন, অভিনয় কলায় ছিল তাঁর কতখানি বিস্ময়কর প্রতিভা।...

বিদ্যা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক না রেখেও এই দানীবাবু যখন রঙ্গমঞ্চের উপর দেখা দিতেন ওসমান, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, চাণক্য, ঔরঙ্গজেব, শঙ্করাচার্য ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কঠিন কঠিন ভূমিকায়, তখন তাঁর ভাবভঙ্গি ভাষণের মধ্যে লক্ষ্য করা যেত—এক অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত পরিবর্তন।" (৪৭)

আর দানীবাবুর 'ওসমান'-এর ভূমিকায় অভিনয়ের কথা লিখেছেন অপরেশচন্দ্র। 'মিনার্ভা' থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র নাট্যীকৃত 'দুর্গেশনন্দিনী'—"এবারে আয়েষা শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী, ওসমান শ্রীযুক্ত দানীবাবু এবং বিমলা তিনকড়ি। এবারের অভিনয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল আয়েষা ও ওসমান। গিরিশচন্দ্র দুই এক রাত্রির জন্য বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ছাপাইয়া আয়েষা ও ওসমান রঙ্গমঞ্চে দর্শকের চিত্তকে অধিক বিভ্রান্ত করেন।" (৭৮)

হেমেন্দ্রকুমারও তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন: "গিরিশচন্দ্র যখন জরায় অপটু হয়ে পড়েছেন, সেই সময়ে একবার গ্রহণ করেছিলেন 'মৃণালিনী' পালায় পশুপতির ভূমিকা। এই ভূমিকায় তাঁর নাম ছিল অতুলনীয়। বৃদ্ধ বয়সেও এই ভূমিকায় অপূর্ব কলাকৌশল দেখিয়ে তিনি আমদের মুগ্ধ করলেন। ঠিক পরের হপ্তাতেই পশুপতির ভূমিকায় বিজ্ঞাপিত হলো দানীবাবুর নাম এবং আমরাও কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলুম। আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমার তো বিশ্বাস, গিরিশ চন্দ্রের চেয়ে দানীবাবুর 'পশুপতি'ই হয়েছিল উচ্চতর শ্রেণীর।...

"য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' হাস্যনাট্যে কর্তা হারাধনের ভূমিকায় আমি তিনজন শ্রেষ্ঠ নটের অভিনয় দেখেছি—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নীলমাধব চক্রবর্তী ও দানীবাবু। সকলের চেয়ে উতরে গেছেন যে দানীবাবু, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।" (৪৯)

'সরলা' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে রমাপতি দত্ত লিখেছেন: "গদাধরের ভূমিকায় দানীবাবু অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।...পূর্বে বেলবাবু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু গদাধররূপী দানীবাবু এমন বিমল হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন, যে দর্শকগণ সময়ে সময়ে বেলবাবুকে ভুলিয়া যাইত। গদাধরের ভূমিকায় দানীবাবুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও সে ছবি ভুলিবেন না। অমরেন্দ্রনাথ পরে—১৬ নভেম্বর (১৯১০) তারিখে—এক রাত্রির জন্য গদাধরের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এ ভূমিকার অভিনয়ে তিনি দানীবাবুকে পরাজিত করিতে পারেন

নাই।" (৫০)

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন "দানীবাবুর অভিনয়ে মৌখিক ভাব-পরিবর্তনের খেলা ছিল অফুরন্ত এবং এটা বিশেষরূপে প্রকাশ পেত চাণক্যের ভূমিকায়। স্থানে স্থানে তাঁর মুখ দেখে ও কথা শুনে দর্শকরা স্তম্ভিত না হয়ে পারত না। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক' পালায় যেখানে চণ্ডাশোক উপবাসে উন্মত্তের মতো বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ খাদ্যের সন্ধান পেলে, সেখানে দানীবাবুর মুখে যে বীভৎস ও ভয়ানক পশু-ভাব ফুটে উঠতে দেখেছি, আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরেও আমি তা ভুলতে পারি না।"

এই বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রশ্ন, "নিতান্ত নীরস ও সাধারণ একটি মানুষ কোন কৌশলে অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয়ে বিদ্বজ্জনদেরও চিত্তে সঞ্চারিত করছেন নবরসের বিচিত্র অনুভূতি? একি মন্ত্রশক্তি, না দৈবানুগ্রহ?" (৫১)

এ রহস্যের সমাধান করেছেন দানীবাবু নিজেই। কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু) শোনালেন কাহিনীটি :

দানীবাবু সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র নবাবের ভূমিকায় তাঁর আচার-আচরণ বাক্‌ভঙ্গির মুগ্ধ প্রশংসা করেছেন। এমন কি, 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু নবাবের মসনদ যদি কাউকে দিতে হয় তবে তার একমাত্র দাবী-দার অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকৃতপক্ষে দানীবাবুর বলিষ্ঠ নবাবীয়ানা, আচার-আচরণে প্রত্যাশিত বীর্যবত্তা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সেই দানীবাবু যখন 'শাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় নামলেন তখন কোথায় সেই দৃঢ়তা!—মাথা নীচু, সোজা তাকান না, সন্দিগ্ধ তির্যক দৃষ্টি। এ-সব দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল। অহীন্দ্র চৌধুরী একবার সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন দানীবাবুকে, "আপনি যখন বাংলার নবাব তখন শৌর্যে বীর্যে অনমনীয়তা ফুটে ওঠে অথচ যখন ভারতসম্রাট তখন সেই বীর্যবত্তা নেই—সমস্ত দৃষ্টিতে কেমন দুর্বল ভীরুতা।—এর কারণ কি?" দানীবাবু বলে-ছিলেন—"দেখুন আমি মূর্খ লেখাপড়া জানি না, কোনো চরিত্রকে গভীরভাবে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। অভিনয় করি শুধু বাপির নির্দেশে (তখন গিরিশচন্দ্র লোকা-ন্তরিত) এবং ঠাকুরের আশীর্বাদে। আমার থাকার মধ্যে আছে বাপির একজোড়া জুতো ও ঠাকুরের একখানি পট। যা' কিছু নির্দেশ, প্রেরণা—সব ওখান থেকে পাই। ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় সাজপোষাক পরে স্টেজে নামতে যাবার আগে ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করতে গেলাম। ঠাকুর আমার মাথাটাকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শয়তানের

ভূমিকায় অভিনয় করছিস—শয়তান কি কখনো মাথা উঁচু করে হাঁটে? সোজা তাকায়? সেই থেকে ওই ভূমিকায় কোনোদিন মাথা উঁচু করতে পারিনি, সোজা তাকাতে পারিনি—চোখে দৃঢ়তা ফোটে না, ফোটে সংশয়।" (৫২)

যে 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়ের এত খ্যাতি সেই 'সিরাজদ্দৌলা'র প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র পুত্রকে বলেন 'আমি যা তোমায় দেখিয়েছি তার মাত্র ৫০ ভাগ তুমি দেখাতে পেরেছ।' কথাটা শুনে দানীবাবু প্রথম একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, এমন কি সিরাজের ভূমিকায় আর নামবেন না বলেই স্থির করেছিলেন কিন্তু গিরিশবাবু তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে যখন আবার নির্দেশ দিতে শুরু করলেন তখন দানীবাবু রীতিমত ভীত হয়ে পড়লেন—এ তিনি ফুটিয়ে তুলবেন কেমন করে! নাটুবাবুর কাছে দানীবাবু বলেছিলেন 'পরমহংসদেবের কৃপায় শেষপর্যন্ত সেগুলো আমি সব আয়ত্ত করেছিলাম—যাতে আমার আরও নাম হয়।' (৫৩)

একদিকে পিতা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর বিশ্বাস এই দু'য়ের সমন্বয়ে দানীবাবু বঙ্গ রঙ্গালয়ে একদিন সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছেন। প্রবীণ অভিনেতা সন্তোষ সিংহ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বললেন: "দানীবাবু কেবল 'বাপি' 'বাপি' করতেন আর থিয়েটারে 'সাহায্য রজনী' করে মঠে দান করতেন বিক্রয়লব্ধ টাকা।" (৫৪)

গিরিশচন্দ্রের ছেলে—স্বতই মঠের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে পেয়েছেন আনুকূল্য। 'শঙ্করাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তার কথা আগেই বলেছি।

॥ ৬ ॥ নির্মলেন্দু লাহিড়ী—সরযূবালা—সন্তোষ সিংহ

"খুব অল্প অভিনেতাই তাঁর মতো এত দীর্ঘকাল, তেত্রিশবছর, তুল্য জনপ্রিয় থাকবার ভাগ্য নিয়ে নাট্যশালায় এসেছেন, খুব অল্প অভিনেতাই তাঁর মতো ঋণগ্রস্ত বিভিন্ন নাট্যশালাকে ঋণমুক্তির সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছেন।" (৫৫)

নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পর্কে কথাগুলি বলেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত।

নির্মলেন্দুর জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১। প্রপিতামহ কেশবচন্দ্র ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর বড় ভাই। নির্মলেন্দুর বাবা নিকুঞ্জমোহন এম বি. পাশ করে কিছুদিন সরকারী সিভিল সার্জেনের কাজ করেন, পরে চাকরী এবং এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্র পরিত্যাগ

করে রাণাঘাটে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসাবে দরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নিকুঞ্জমোহন ছিলেন সাধক প্রকৃতির মানুষ—কীর্তন করতে করতে তাঁর ভাবসমাধি হত বলে শোনা যায়। নির্মলেন্দুর মা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের একমাত্র কন্যা এবং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভগিনী।

এই পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্য ও কৈশোর শিক্ষা শেষ করে নির্মলেন্দু এসেছিলেন কলকাতায় মাতুল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে থেকে কলেজে পড়তে। সেই সময়কার তরুণ নির্মলেন্দু সম্পর্কে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন :

"নির্মলদা ছিলেন আর একটি আশ্চর্য চরিত্র। ষোল সতের বৎসর বয়সে যে কিশোরের আস্তিক্যবুদ্ধি অচল-প্রতিষ্ঠ তাকে অসামান্য না বলবে কে? কিন্তু তিনি যে শুধু ভক্তি বিশ্বাসেই অসামান্য ছিলেন তা নয়, বহু-গুণে-গুণী এই মানুষটিকে ভিড়ের মধ্যে দেখলেও নগণ্যদেব একজন বলে মনে হত না কারুরই।" (৫৬)

কলেজের ছাত্র নির্মলেন্দুর কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে পরিচয় ঘটল প্রবীণ গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আবৃত্তি, অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রতি নির্মলেন্দুর প্রবল ঝোঁক ছিল। বাংলা দেশের সমকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তাই সহজেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছেন, কিন্তু এই আকর্ষণের আরও একটা বড় দিক ছিল। গিরিশচন্দ্র তখন রামকৃষ্ণ-রসে আকণ্ঠ নিমগ্ন। গিরিশের কাছ থেকে তিনি পেলেন সেই রসের উত্তরাধিকার। সুদর্শন, সুকণ্ঠের অধিকারী নির্মলেন্দু তখন মাতুল দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমারের দাদা-বন্ধু-দিশারী। নতুন পাওয়া আনন্দের স্বাদ তিনি ভাগ করে দিয়েছেন স্নেহের মণ্টু (দিলীপকুমারের ডাক-নাম)-কে। কতদিন দু' জনে চলে গেছেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমিতে, বেলুড় মঠে, 'কথামৃত'-কারের আবাসে। দিলীপকুমার পৌঁছেছেন নতুন আলোকে। কখনো কখনো তাঁর মধ্যে যুক্তিবাদী বুদ্ধি মাথা নাড়া দিয়ে উঠলেও নির্মলেন্দুর ভক্তিবাদের প্রবলতার কাছে তা শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণই করেছে। আজ পরিণত বয়সে দিলীপকুমার নির্মলেন্দুর কৈশোর-সাহচর্যের মূল্য নিরূপণ করেছেন :

"নির্মলদা ও আমার মধ্যে এ-অম্লান ভালোবাসা জেগে উঠেছিল বিধাতারই বিধানে —কেন না এই ভালোবাসার ছোঁয়াচেই আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম—যাঁকে নির্মলদা সবচেয়ে ভালোবাসতেন: শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। বহু বৎসর পরে নির্মলদাই আমাকে প্রথম চমকে দেন এ-সত্যটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—বলেন: 'ওরে, ঠাকুরকে ভালো না বেসে তুই পার পেতিস কেমন করে শুনি? আমি যাঁকে ভালোবেসেছি তাঁকে যে তোরও ভালো না বেসেই উপায় ছিল না রে—যখন আমাকে তুই ভালোবেসে ফেলেছিলি।'...

"নির্মলদাকে ভালোবাসার দরুণই যে পরমহংসদেবের কৃপার আলো আমার অন্তরে পৌঁছেছিল, আমার অন্তরের এ বিশ্বাসকে আমি নির্ভরযোগ্য বলেই মনে করি, যদিও একথা অপরের কাছে প্রমাণ করা অসম্ভব।" (৫৭)

সেই 'পরমহংসদেবের কৃপার আলো' দিলীপকুমারের জীবনকে কোন্ লক্ষ্যে টেনে নিয়ে গেছে তা-ও আমাদের অবিদিত নয়।

প্রথম দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলেন্দুর ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন নি—পরে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবর্তনের কথা পূর্বেই জেনেছি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অপছন্দ নির্মলেন্দু বা দিলীপকুমার—কারও কাছেই রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশের প্রকৃত পরিচয় জানার পর তাঁর সঙ্গে নিজের পুত্রের বা ভাগিনেয়ের সংযোগ অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন নি কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের একটা আশঙ্কা সত্য বলেই শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছিল। নাটকের প্রতি স্বভাবজাত প্রেরণা নির্মলেন্দুকে পড়াশুনোয় খুব বেশি এগোতে দেয় নি। প্রথম প্রথম শৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনয় করে শেষ পর্যন্ত 'কর্ণ-ওয়ালিশ' মঞ্চে যোগদান করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। এই প্রথম অভিনয়েই তাঁর অভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নির্মলেন্দুর প্রথম আত্মপ্রকাশ সর্বসাধারণের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করে। নাটকীয় দেহসৌষ্ঠব, কণ্ঠস্বরের লালিত্য, আবেগ বিস্তারের কৌশল এবং মায়াজাল সৃষ্টির নৈপুণ্য নির্মলেন্দুকে ধীরে ধীরে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনন্যসাধারণ শিল্পীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করে।" (৫৮)

'শ্রীদুর্গা' নাটকে 'মহিষাসুর', 'বঙ্গে বর্গী'তে 'ভাস্কর পণ্ডিত', 'গৈরিক পতাকা'য় 'শিবাজী' 'চন্দ্রশেখরে' 'নবাব', 'সিরাজদ্দৌলা'র নামভূমিকায় অভিনয় করে নির্মলেন্দু বাংলাদেশের দর্শকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

অভিনেতা নির্মলেন্দু সম্পর্কে সুধীরেন্দ্র সান্যালের অভিমত: "সুকণ্ঠ, ভাবাভিব্যক্তি ও সুদর্শন চেহারা—যে তিনটি গুণ 'হিরো'র পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়—তার সব কটিরই সমন্বয় ঘটেছিল অভিনেতা নির্মলেন্দুর মধ্যে। তাঁর আকৃতিগত সৌন্দর্য ছিল জন্মগত অধিকার বলে। কণ্ঠ ও ভাবাভিব্যক্তিকে তিনি দীর্ঘ শ্রমলব্ধ সাধনার দ্বারা উন্নত ও সুসংস্কৃত করেছিলেন। তাঁকে 'বাণীবিনোদ' উপাধির দ্বারা অলঙ্কৃত করলেও যেন মনে হয়, সবটুকু করা হয় নি। একাধারে অদ্বিতীয় ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।" (৫৯)

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকটি উৎসর্গ করেন নির্মলেন্দুকে, যাঁর জন্যে নাটকটির সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করেছিল। উৎসর্গপত্রে শচীন্দ্রনাথ

সেনগুপ্ত লিখেছেন :

"শক্তিমান নট তুমি। আমার নাটক তোমার শক্তির পরশ পেযে সুন্দর রূপ নিয়ে মঞ্চে ফুটে উঠেছে। 'রক্তকমল' 'ঝড়েব রাতে' 'গৈরিক পতাকা' আব আজকাব এই 'সিবাজদ্দৌলা' জনসমাদৃত হযেছে তোমাব এবং তোমারই পরিচালিত অভিনেতৃ-কুলের অভিনযনৈপুণ্যে। তোমাব 'শিবাজী' ছিল তুলনাবিহীন, তোমাব 'সিরাজ'-ও হযেছে অনুপম।

"ঋণ স্বীকারেব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময যদি আব কখনও না পাই, তাই স্বীকৃতিব নিদর্শন স্বরূপ 'সিবাজদ্দৌলা' তোমাবই নামে উৎসর্গ করে রাখলাম। তোমার সম্মতিও আমাব সম্পদ হযে বইল।

তোমাব গুণমুগ্ধ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।" (৬০)

খ্যাতিব শিখরে উঠেও নির্মলেন্দু ছিলেন চিরবৈরাগী। হেমেন্দ্রকুমাব রায লিখেছেন · "যতটুকু কাজ করলে চলে যায, তার বেশী আব কিছু কবতে তিনি বাজি ছিলেন না। অভিনয় শিক্ষা দেবাব শক্তি ছিল তাঁব যথেষ্ট, কিন্তু তা এড়িযে চলবাব জন্যে তিনি চেষ্টা কবতেন যথাসাধ্য।

"শিশিবকুমাবের একটি প্রস্তাব বহন করে একদিন তাঁব কাছে গিযে বললুম 'নির্মল, তুমি 'শ্রীবঙ্গমে'ব ভাব নিতে পাববে ?'

"তিনি সবিস্ময়ে বললেন 'তাব মানে ?'

"বললুম 'তুমি কেবল অভিনয কববে না, নিযমিতভাবে তোমাকে নাট্যাচার্যের কর্তব্যও পালন কবতে হবে।'

"তিনি শুধোলেন 'আব শিশিববাবু কি কববেন ?'

"আমি বললুম 'বিশ্রাম। তাঁব শবীর পীড়িত। তিনি অবসর চান। তোমার যোগ্যতাব উপবে তাঁব বিশ্বাস আছে। তুমি রঙ্গালযেব ভার গ্রহণ কবলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পাবেন।'

"নির্মলেন্দু বললেন 'অসম্ভব। অত খাটুনি আমার সইবে না।'

"নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যথেষ্ট উদাসীন। বহু বঙ্গালযের মালিক তাঁর কাছ থেকে ষোলআনা কাজ আদায় করে নিয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রাপ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে লজ্জিত হন নি। বাব বাব এমন ব্যাপার হবার পরেও মালিকরা আবার যখন দ্বারে গিয়ে ধরণা দিযেছেন তিনি তাঁদের ক্ষমা কবতে ইতস্তত করেন নি।"(৬১)

সেই নির্মলেন্দু লাহিড়ী সেদিন গেছেন বেলুড় মঠের উৎসবে। সঙ্গে আছেন নাটা-সম্রাজ্ঞী সরযূবালা।

প্রসাদ বিতরণের জায়গায় দারুণ ভিড়—তার মধ্যে যায় কার সাধ্য। কোনো পরিচিত মহারাজকেও খুঁজে পেলেন না যে একটু প্রসাদ পাবেন। প্রণামাদি সেরে, সব দেখে শুনে ফেরার বেলায় নির্মলেন্দু বিষণ্ণ—ফিরে যেতে তাঁর মন চাইছে না—এমন দিনে একটু প্রসাদ পাওয়া যাবে না! কিন্তু উপায় যখন নেই তখন আর কি করা যাবে! গাড়ি খানিকটা এগিয়ে এসেছে—নির্মলেন্দু হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন 'হয়েছে—ব্যবস্থা হয়েছে—গাড়ি থামাও।'

'কি হলো?' সরযূর উৎসুক প্রশ্ন।

'ঐ যে দেখছ না—কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া জায়গাটা—ঐত, ঐখানে লোকে প্রসাদ খেয়ে পাতা ফেলছে!'

'তাতে কি?'

'বাঃ, কোথাও কি একটুও প্রসাদের উচ্ছিষ্ট লেগে থাকবে না?'

আঁতকে উঠলেন সরযূ দেবী কিন্তু বাধা দেবার আগেই গাড়ি থেকে নেমে গেছেন নির্মলেন্দু। কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে একটার পর একটা শালপাতা হাতড়াচ্ছেন।

'এ কি নির্মলবাবু না? আপনি ওখানে কি করছেন?' কোনো সন্ন্যাসী ওখান দিয়ে কি কাজে যাচ্ছিলেন, নির্মলবাবুকে ওইভাবে দেখে হতবাক!

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে নির্মলবাবু বললেন 'প্রসাদের ওখানে এমন ভিড় যে এগোতে পারলাম না, তাই দেখছি শালপাতার কোথাও যদি একটু লেগে থাকে!'

হাঁ হাঁ করে উঠলেন মহারাজ, 'উঠে আসুন ওখান থেকে—আসুন আমার সঙ্গে।'

আবার গাড়ি ফিরলো। হাত ধুয়ে, আসন পেতে বসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। আর কোনো ক্ষোভ নেই। (৬২)

ক্ষোভ ছিল তাঁর একটাই—সেই ক্ষোভের কথাই চিঠিতে লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায়কে যখন দিলীপকুমার সংসার ত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন:

"স্নেহের মণ্টু, তুমি যা পারলে, আমি পারিনি ভাই। তাই আজ শুধু আমার আশীর্বাদ নয়, প্রণাম নিও তুমি।...

মনে পড়ে কি তোমার ঠাকুরের গান

'ঘুড়ি লক্ষের ঝুটো একটা কাটে হেসে দাও মা হাত চাপড়ি'

তাঁর এ আনন্দের কথা এতদিন ছিল তোমার শোনা কথা, আজ নিশ্চয় চোখে দেখেছ।" (৬৩)

নির্মলেন্দু রামকৃষ্ণ-ভক্তি সম্পর্কে থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেকালের লোকের কাছে অনেক কথাই শোনা যাবে। জীবেন বসু বললেন একদিনের ঘটনা। নির্মলেন্দুর রাম-

কৃষ্ণ-প্রণাম ছিল অভিনব। ছবির সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়তেন—পাঁচ মিনিট ধরে প্রণাম করতেন। একদিন উনি যখন এইভাবে প্রণাম করছেন তখন ছবি এবং ওঁর মাঝখানের ফাঁকটুকু দিয়ে কেউ একজন চলে গেছে। শান্ত, ভদ্র, নির্মলেন্দুর সেদিন রুদ্রমূর্তি। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে হৈ হৈ করে এক কাণ্ড করে বসলেন। সেই থেকে আদেশ জারী হয়ে গেল, নির্মলবাবু যখন প্রণাম করবেন তখন তাঁর সামনে বা পাশ দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ। (৬৪)

অভিনয়কে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ বলেই গ্রহণ করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ-আদর্শ রক্ষা করতে দৈহিক নির্যাতনও ভোগ করেছেন। নাট্যকার মন্মথ রায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

"পনেরো বছর পূর্বে [প্রবন্ধটি ১৩৫৬ সালে লিখিত] 'নাট্যনিকেতন' দিনাজপুর সহরে অভিনয় করিতে গিয়াছে। স্থানীয় একদল লোক ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। পতিতা নারী লইয়া গঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনে স্থানীয় যুবকদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হইবে এই আপত্তি তুলিয়া তাহারা অভিনয় বন্ধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সংঘর্ষ অনিবার্য। বেনামী চিঠিতে ভয়প্রদর্শন যখন নিষ্ফল হইল, তখন 'নাট্যনিকেতনে'র শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে জখম করিতে পারিলে থিয়েটার খতম হইবে, এই সহজ পন্থার আলোচনা চলিতেছে। আমি দিনাজপুর জেলার অধিবাসী···। আমার 'কারাগার' ও 'সাবিত্রী'তে নির্মলেন্দু ছিলেন শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আমি উপরোক্ত সাঙ্ঘাতিক জল্পনাকল্পনার কথা শুনিয়া ভীত হইয়া ছুটিয়া গেলাম নির্মলেন্দুর নিকট। সম্ভাব্য বিপদের কথা শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বলিলেন, 'অভিনয় আমার ধর্ম। এতে ঠাকুরের আশীর্বাদ আছে। আমি অভিনয় করবই মন্মথবাবু।' অভিনয় তিনি করিয়াও ছিলেন। কিন্তু এ কথাও সত্য তাঁহার মাথা ফাটিয়াছিল—বহুদিন তাঁহাকে হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল।" (৬৫)

বারবনিতার প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণকে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল ম্যাক্সমূলারের কাছে—নির্মলেন্দু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকেই ধারণ করেছিলেন ললাটে রক্ত স্বাক্ষরে।

সেকালের মঞ্চ-পরিবেশের কথা বিচার করলে সেখানে নির্মলেন্দুর পরিচ্ছন্ন জীবনও কম বিস্ময়কর নয়। দিলীপকুমার রায় লিখেছেন "নির্মলদা থিয়েটারে ঢুকে একদিনও মদ খান নি, কি বেলেল্লামি করেন নি।" (৬৬)

মহেন্দ্রগুপ্তের ক্ষোভ "আজীবন যিনি এক বিন্দু সুরা স্পর্শ করেন নি" সেই নির্মলেন্দু-কেও দর্শক তার প্রচলিত সংস্কারে সুরাপানের অপরাধে অভিযুক্ত করেছে। (৬৭)

নির্মলেন্দুর শেষজীবনের একটি চমৎকার রেখাচিত্র এঁকেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় :

"প্রতিদিন ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে বসে পূজার্চনায় কেটে যেত কয়েক ঘণ্টা। ঠাকুর ঘরের বাইরেও যে কোন দেব-দেবীর মূর্তি দেখতেন, প্রণামের পর করতেন প্রণাম। তাঁর সামনে যদি ছত্রিশ কোটি দেবতা এসে দাঁড়াতেন তাহলে ছত্রিশ কোটি প্রণাম না করে অন্য কোনও কাজে হাত দিতেন না।

"মাঝে মাঝে আমি অভিযোগ করে বলতুম 'নির্মল, তুমি শিল্পীর জীবন যাপন করছ না।"

"তিনি প্রতিবাদ বা অস্বীকার করতেন না, নীরবে মুখ টিপে হাসতেন।" (৬৮)

জীবনের শেষ পাঁচটি দিন নির্মলেন্দুর অনুরোধে স্বামী ভুবনানন্দ (সাহেব মহারাজ) তাঁর মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষশিষ্য স্বামী সারদানন্দের কাছে দীক্ষিত নির্মলেন্দু স্বামী শিবানন্দের সন্ন্যাসীশিষ্য স্বামী ভুবনানন্দের কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (৬৯)

দিলীপকুমার রায় লিখেছেন :

"মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের—শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তাঁর নাম শুনতে শুনতে মহাপ্রয়াণ করেন—তাঁর রাঙা পায়ে ঠাঁই পেতে। পেয়েছেন নিশ্চয়। ঠাকুরকে যে চিরজীবন ভালবেসে এসেছে ঠাকুর তাকে ফেলতে পারেন কখনো ? যেদিন তাঁর মহাপ্রয়াণের খবর পাই···সেদিন নিশুতি রাতে চোখের জলে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিলাম ঠাকুরের ছবির সামনে :

ভ্রান্তি আঁধারে দিয়েছিলে তুমি দিশা
'কথামৃতের' বাণীবাহ নিরুপম !
তাহারি প্রসাদে পোহাল আমার নিশা
ওগো আত্মার আত্মীয় ! নমো নমো ! (৭০)

প্রজ্জ্বলিত গৈরিশ-অগ্নি থেকে জ্বলেছিল অনেকগুলি দীপ—তারই একটি নির্মলেন্দু লাহিড়ী। আবার নির্মলেন্দু প্রদীপ্ত করেছিলেন সরযূ দেবীকে।

'সাজাহান' নাটকের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী 'জাহানারা' শ্রীমতী সরযূর অভিনয় শিক্ষার সূত্রপাত নির্মলেন্দুর কাছে। নির্মলেন্দুকেই গুরুরূপে বরণ করে তিনি মঞ্চ জগতে আপন আসন অধিকার করেছেন। 'কারাগারে' কঙ্কা, 'সিরাজদৌলা'য় লুৎফা 'ধাত্রীপান্না'য় পান্না প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে বাংলাদেশের দর্শকের তিনি অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিভা আজও অম্লান। সেই প্রতিভাকে জাগ্রত করেছিলেন নির্মলেন্দুই। কিন্তু শুধু তাঁর শিল্পীজীবনকেই নয়—তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকেও তিনি কিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন সেটা আমরা সরযূদেবীর কাছ থেকেই শুনতে পাই :

"বাণীবিনোদের প্রতিভার আলোকে শুধু আমার শিল্পজীবন আলোকিত হয়ে ওঠেনি—আমার ব্যক্তিগত জীবনও ওঁর স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠেছে। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের যতটুকু গৌরব, তা-ও ওঁরই জন্যে লাভ করতে পেরেছি। আমাকে তিনি একখানা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত কিনে দিয়ে বলেছিলেন: 'খুব সরল ভাষায় অতি জ্ঞানের কথা তুমি এ থেকে জানতে পারবে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কয়েক পাতা পড়বে।' আমি তখন থেকে ঠাকুরের কথামৃত পাঠ করতে শুরু করি এবং আজও রীতিমত তা পড়ি। আমার একটি পুত্র সন্তান যখন মারা যায়—এই কথামৃত থেকেই পেতাম সমস্ত সান্ত্বনা। তখন লাহিড়ী মশায় একদিন আমায় বলেন: 'যা, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যা—শান্তি পাবি।' সত্যই পেলাম। লাহিড়ী মশায়ই আমায় পরম সত্যের সন্ধান দিলেন—তাঁরই আগ্রহে এবং চেষ্টায় আমি শ্রীমৎস্বামী বিরজানন্দ মহারাজজীর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করতে সক্ষম হই।" (৭১)

নির্মলেন্দুর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ এবং থিয়েটারের রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডল—সরযূদেবীর জীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছে। নিতান্ত বাল্যকালে থিয়েটারে এসেছেন—সেখানে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবেশ, দানীবাবুর কাছে শুনেছেন গিরিশচন্দ্রের ভক্তি বিশ্বাসের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার কথা। সরযূ দেবীর অকপট বিবৃতি: "আমরা মূর্খ মানুষ। ছেলে-বেলা থেকে থিয়েটার করি বলে পড়াশুনো বেশি হয় নি। কিন্তু 'কথামৃত' এত সহজ সরল যে, যে-কেউ তার মর্মার্থ বুঝতে পারেন।" (৭২)

সরযূদেবীও বুঝেছিলেন। আজ পরিণত জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে সেই 'কথামৃত' তাঁর নিত্য-দিশারী।

"অপরেশচন্দ্র আমার গুরু, অপরেশচন্দ্রের গুরু গিরিশচন্দ্র—আর গিরিশচন্দ্রের গুরু ছিলেন স্বয়ং ঠাকুর। এ একটা বংশ পরম্পরা চলে আসছে।"—স্মৃতিচারণ করছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সন্তোষ সিংহ।

"আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ি, তখন বিবেকানন্দের প্রভাব সমাজের ওপর বিস্তৃত। আমার নিজের বয়স যখন চোদ্দ-পনের তখন মঠে গেছি উৎসবে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে।

"সকাল সাতটায় আমরা আহেরীটোলার ঘাট থেকে ফেরী স্টিমারে রওনা হতাম। আমরা ছিলাম ৪।৫ জন। তখন ঠাকুরের এই মন্দির, কলেজ—এ সব হয় নি। গঙ্গার ঘাটও বাঁধানো হয় নি। উত্তর দিকের পুরানো ঘর কয়েকখানা, তার মাঝে মাঝে কয়েকখানা খোলার ঘর ছিল। উত্তর দিকের ঘর থেকে গঙ্গার কোল পর্যন্ত দু' সারি ছেলে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বালতি দিয়ে জল তুলে কিছু দূর দূর দাঁড়ানো স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে বালতি তুলে দেওয়া হতে লাগল। এইভাবে জলের চৌবাচ্চা

ভর্তি হয়ে গেল আর খালি বালতিগুলি সারি সারি হাতে হাতে গঙ্গার তীর পর্যন্ত পৌঁছতে লাগল।...বেলা পাঁচটার পর প্রসাদ বিতরণের কাজ শেষ হতে আমরা ফিরে এলাম।...এইভাবে চোদ্দ বছর বয়সেই ঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয়।"

তারপর ঢুকেছেন থিয়েটারে—দেখেছেন রামকৃষ্ণ প্রভাব সর্বত্র। পোস্টার-প্ল্যাকার্ড-হ্যাণ্ডবিল থেকে শুরু করে ক্যাশ-ঘর-গ্রীনরুমেও রামকৃষ্ণ-শরণ। প্রথম প্রথম অন্যের 'কপি' করার মতোই স্টেজে প্রবেশ করার আগে রামকৃষ্ণের পটে প্রণাম করেছেন। ক্রমশ চিনেছেন রামকৃষ্ণকে—প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্তরের মধ্যে। (৭৩)

৪ নভেম্বর ১৯১৩ সকালে রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাট বাড়ির একটি ছোট ঘরে বসে সন্তোষ সিংহ তাঁর নাট্যজীবনের কাহিনী শোনালেন। বৃদ্ধ মানুষটি—বয়সের ভারে আজ স্তিমিত। একদা যাঁর নাম দর্শকদের মুখে মুখে ফিরতো সেই 'কঙ্কাবতীর ঘাটে'র 'লালমোহন' 'প্লাবন' (মনোজ বসু)-এর 'ব্রজলাল' 'আত্মাহুতি (জলধর চট্টোপাধ্যায়)-র 'কিঙ্কর' সন্তোষ সিংহের সঙ্গে আজ থিয়েটারের সম্পর্ক ছিন্ন। অতীত দিনের অনেক স্মৃতিই আজ ঝাপসা হয়ে এসেছে—কখনো কখনো পুরনো বন্ধুর সান্নিধ্যে কিংবা গুণমুগ্ধ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে অতীতের সেই গৌরবময় দিন-গুলি আবার তাঁর চোখে উজ্জ্বল আলো আনে। যে ঘরে আমরা বসেছিলাম তার চার দেওয়াল জুড়ে তাঁর নিজের এবং অন্যান্য খ্যাত-কীর্তি শিল্পীদের ছবি—তারই মাঝখানে চন্দন ও ফুলে সুসজ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণের পট।

থিয়েটার ছেড়ে এসেছেন—কিন্তু থিয়েটারের গুরুকেই বহন করে এনেছেন তাঁর ব্যক্তি জীবনের গুরুরূপে।

॥ ৭ ॥ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

"তিনজনকে আমি দেখেছি, যারা দারুণ ভক্ত ছিল—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং নরেশ মিত্র।"—আন্দুলের রামকৃষ্ণ সংঘের আশ্রমে বসে জবানবন্দী দিচ্ছিলেন স্বামী শিবানন্দের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণপন্থী সন্ন্যাসী স্বামী ভুবনানন্দ (সাহেব মহারাজ)।

মনোরঞ্জনবাবুর নামে বিস্ময়ের কারণ আছে। তাঁর অধ্যাত্মজীবন ছিল সাধারণের অগোচরে। এমন কি তাঁর পুত্র শঙ্করনারায়ণও বলেছিলেন "বাবা যখন কলকাতায়

আসেন তখন কট্টর ব্রাহ্মণ।...পরবর্তী জীবনে বাবার কি রকম একটা change হল। আমরা যখন দেখেছি, তখন কিছুই মানেন না, তাহলেও often (যখন তখন) কোন কিছু ব্যাপারে রামকৃষ্ণের কথা quote (উদ্ধৃত) করতেন। এটা কিসের থেকে আসত, তাঁর ভেতরে কিছু ছিল কি ছিল না, তা জানি না।" (৭৪)

প্রাগন্ত-যৌবনে মনোরঞ্জন ছিলেন বিপ্লবী দলে—অনুশীলন সমিতিতে। সে সময় তাঁর এক সহকর্মী ছিলেন সতীশ দাসগুপ্ত—পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনের কাশী সেবাশ্রমে প্রথম কর্মীরূপে, পরে পরিচালকরূপে কাজ করে গেছেন। সন্ন্যাস-জীবনে তাঁর নাম ছিল স্বামী সত্যানন্দ। এই সতীশ মহারাজের সঙ্গে যোগসূত্রে মনোরঞ্জনবাবুও মঠের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। কাশী সেবাশ্রমের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ জানিয়েছেন তিনি মনোরঞ্জনবাবুকে জানতেন গভীর ভাবে—"তাঁর মত চরিত্রবান অভিনেতা অতি দুর্লভ।" (৭৫)

এই কারণেই তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিল অমর মল্লিক পরিচালিত 'স্বামীজী' ছায়াচিত্রে রামকৃষ্ণের ভূমিকায়। ছবিতে এই চরিত্র অভিনয় করার জন্য পরিচালক এমন একজনকে অন্বেষণ করছিলেন যাঁকে কোনোদিন কোনো বিসদৃশ অবস্থায় দেখে ভক্ত দর্শকের মন ব্যথিত হবে না। এর আগে একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মনো-রঞ্জনবাবুর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। অমরবাবু অনেক অনু-সন্ধানের পর যখন মনোরঞ্জনবাবুকে ঐ ভূমিকার জন্য নির্বাচন করলেন তখন আপত্তি উঠেছিল তার বাচনভঙ্গী নিয়ে। সমস্ত আপত্তি সত্ত্বেও মনোরঞ্জনবাবুই শেষ পর্যন্ত এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর অভিনয় এখনো অনেকের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

মনোরঞ্জনবাবুর অন্তর্জীবনের পরিচয় তাঁর ছেলেদেরও অগোচরে। তিনি ছিলেন একান্ত-ভাবে প্রচ্ছন্ন ও সংযত। বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ-ভক্তির কোনো লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পেত না কিন্তু তবুও তাঁর পুত্র শঙ্করনারায়ণের কাছ থেকেই শুনতে পেলাম একদিনের একটি ঘটনার কথা।

মনোরঞ্জনবাবুরা ছিলেন গুরুবংশ। তাঁর পিতাও অনেক শিষ্যকে মন্ত্রদান করেছেন। মনোরঞ্জনবাবু ইদানীং এই বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু বিপত্তি ঘটলো একদিন। তাঁদের শিষ্য পরিবারের একজন হঠাৎ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত—প্রার্থনা, তাঁকে মন্ত্রদান করতে হবে।

মনোরঞ্জনবাবু সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি নাস্তিক—ও-সব ধর্ম-কর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু শিষ্যটিও সবিনয়ে জানালো, তিনি না বিশ্বাস করলেও তাদের বিশ্বাস আছে এবং গুরুবংশ হিসাবে মনোরঞ্জনবাবুর কাছেই তারা দীক্ষা নেবে। এবার মনোরঞ্জন-

বাবু বিপদে পড়লেন। তিনি ওদের অন্য গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার অনুমতিও দিলেন কিন্তু তারাও ছাড়বে না—অন্য গুরু নয়, তাঁর কাছ থেকেই তারা দীক্ষা নেবে। অনেকক্ষণ ধরে চললো তর্ক-বিতর্ক—শেষ পর্যন্ত তাঁকেই পরাজয় মেনে নিতে হলো। দিনক্ষণ ঠিক করে দিলেন তিনি।

মনোরঞ্জনবাবুর বরাবরের অভ্যাস প্রত্যুষে বিছানায় এক কাপ চা-পানের। দীক্ষার পূর্ব রাত্রে তিনি পরদিন সকালে চা দিতে বারণ করে দিলেন। সকালে নির্দিষ্ট সময়ে শিষ্য এলেন—মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে রুদ্ধদ্বারকক্ষে প্রবেশ করলেন কিন্তু দুই-এক-মিনিটের মধ্যেই উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হলেন সেখান থেকে। এ কেমন দীক্ষা!—মাত্র দু' মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল! বাড়ির সকলের কৌতূহল কী মন্ত্র দিলেন মনোরঞ্জনবাবু! অবশেষে তাঁকেই প্রশ্ন করা হলো। উত্তরে বললেন—কী আবার মন্ত্র দেব? বললুম, শুধু 'রামকৃষ্ণ' নাম জপ করো। (৭৬)

চলচ্চিত্রে রামকৃষ্ণের ভূমিকায় আর এক অভিনেতা, 'পথের পাঁচালি'র অভিনেতা হিসাবে যাঁর প্রতিভা বিশ্বস্বীকৃত সেই কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে'র নামভূমিকায় তাঁর অবতীর্ণ হবারও একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। এই ভূমিকায় প্রথম যাঁকে অভিনয়ের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল, কোনো কারণে শেষপর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি হলো না। পরিচালক এলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তার আগে কানুবাবু কখনো এ ধরনের ভূমিকায় অভিনয় করেন নি। প্রস্তাব শুনে তিনি বিস্মিতই হয়েছিলেন: "আমি হাসি ঠাট্টার পার্ট করি—আমাকে এই 'রোল' দিচ্ছেন কেন?" উত্তরে প্রফুল্লবাবু বললেন "আমি স্বপ্ন দেখেছি—আপনি রামকৃষ্ণের ভূমিকায় পার্ট করছেন।" আর না করতে পারলেন না কানুবাবু। পারিশ্রমিকের প্রশ্নে মনে পড়ে গেল তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—"টাকার কথা তুললে ও ভূমিকায় অভিনয় করব কেমন করে?"—কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন "এইখান থেকেই সুরু হল আমার ওপর ঠাকুরের প্রভাব।"

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষে নাট্যকার সন্তোষ সেনের লেখা স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে একখানি নাটক অভিনীত হয়েছিল—কানু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা। সেদিনের অভিজ্ঞতা কানু বন্দোপাধ্যায় কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। সেই অভিজ্ঞতার কথা বললেন তিনি:

"সকলকে শিখিয়ে পড়িয়ে আমার নিজের গলা গেল বসে। কত ওষুধ খেলাম কিন্তু কিছুই হলো না। অভিনয়ের দিন, আমি যখন 'মেক-আপ' করছি, তখন ওরা আমার গলার কথা 'এ্যানাউন্স' করে দিল। আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদছি আর বলছি

'ঠাকুর, তোমার পার্ট করছি—তুমি আমার এ কি করলে ঠাকুর?' কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না, 'সীনে যখন ঢুকলাম—আমার গলা পরিষ্কার। প্রাণ খুলে অভিনয় করলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, যেই আমার অভিনয় শেষ হল, আবার গলা বসে গেল।...তারপর সাতদিন সেই অবস্থায় ছিল।'

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সময়ও এইরকম একটি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তিনি। "একটা 'সীন' আছে—ঠাকুর আসছেন কেশবের বাড়ি। আমি পড়েছিলাম ঠাকুরের দেহ হালকা হয়ে গিয়েছিল—'কেশব' 'কেশব' বলতে বলতে 'ট্রান্স' এসে গিয়েছিল। আমি সেই 'সীন'টা করলাম, ঠিক হলো কি না জানি না, তারপর আমি ফিরে আসছি—তখন আমার কি একটা অনুভূতি হলো, আমার দেহ হালকা হয়ে গেল—কি ভাবে আমি এলাম, আমি জানি না 'কেশব' 'কেশব' বলতে বলতে আমার 'ট্রান্স' এসে গেল। সীন শেষ হতে ডাইরেকটর বললেন 'আবার এ 'শট' নেব আমি।' আমি বললাম 'না, আমি পারব না—এ কি করে হলো তা আমি নিজেই জানি না।" তাঁর অভিজ্ঞতা জানাতে জানাতে কানুবাবু বললেন "ঠাকুরের ওপর আমার অদ্ভুত একটা ভক্তিবিশ্বাস আছে—কারণ তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি তাঁর মাহাত্ম্যে।" (৭৭)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেই আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে তিনি জানালেন: "আমি যখনই ঐ ধরনের অভিনয় করার জন্য পোষাকটা পরি তখনই আর আমার অন্য কিছু ভালো লাগে না। খুব রাগারাগি করি, সবাই ভাবে আমি বুঝি দেমাক দেখাচ্ছি কিন্তু তা নয়—ঐ পোষাক আমাকে পাল্টে দেয়। এই নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।...এটা একটা অনুভূতি, বলে বোঝানো যায় না।"

ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব সম্পর্কে গুরুদাস বললেন "প্রভাব আমার ওপর পড়েছে কি না জানি না, তবে কৃপা পেয়েছি ঠাকুরের। আমার সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করেন যেমন ধরুন মলিনাদি, উনিও ঠাকুরের কৃপা লাভ করেছেন।...মাঝে মাঝে মনে হয়, তবে কি অহমিকা এসে গেল? তখনই মনে হয়, না না এ তো গর্বেরই কথা যে ঠাকুরের কৃপা লাভ করেছি।" (৭৮)

॥ ৮ ॥ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

গিরিশ পরবর্তী যুগে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে সবচেয়ে বড় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিশিরকুমার একটি যুগ—তাঁর অভিনয়কলা কিম্বদন্তী হয়ে আছে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শিশিরকুমার নানা দিক থেকেই রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর এনেছিলেন।

শিশিরকুমারের ধর্মচিন্তা ছিল প্রচ্ছন্ন—বাইরে থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে বোঝা কঠিন। কখনো-কখনো ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও দেখি কিন্তু পরক্ষণেই তার পরিণতি আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এইরকম একটি ঘটনার কথা জানালেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এ কাহিনী স্বয়ং শিশিরকুমারই তাঁকে জানিয়েছিলেন।

সেদিন অভিনয় ছিল না। কিছু রিহার্সাল এবং আলোচনার জন্যে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী আসবার কথা। শিশিরকুমার তারাসুন্দরীর সঙ্গে মঞ্চে বসে আলাপ করছিলেন। একজন সাধারণ অভিনেত্রী মঞ্চে প্রবেশ করার পূর্বে সাধারণ রীতি অনুযায়ী মঞ্চকে প্রণাম জানিয়ে প্রবেশ করতেই শিশিরকুমার রুখে উঠলেন। সরাসরি তাকে প্রশ্ন করলেন 'তুমি ওভাবে নমস্কার করে মঞ্চে এলে কেন?' অভিনেত্রীটি নিরুত্তর। শিশিরকুমার এবার বেশ কড়াভাবে তার এই সংস্কারের বিরুদ্ধে দু'চার কথা শুনিয়ে দিলেন। অভিনেত্রীটি ক্ষুণ্ণ, কিন্তু নিরুত্তর। সেই অভিনেত্রীটি সেখান থেকে সরে যাবার পরই তারাসুন্দরী পড়লেন শিশিরকুমারকে নিয়ে "তুমি ওকে ও-ভাবে বললে কেন? তুমি লেখাপড়া শিখেছ; অনেক কিছু জানার অনেক কিছু বোঝার এবং সেখান থেকে শক্তিলাভ করার সুযোগ তোমার আছে। কিন্তু ও সেসব থেকে বঞ্চিত। ও শক্তি এবং প্রেরণালাভ করে এইখান থেকে—এই প্রণাম থেকেই। তা' থেকে তুমি ওকে বঞ্চিত করতে পার না।"

শিশিরকুমার সৌমিত্রবাবুকে বলেছিলেন 'জান, একথার আমি কোনো জবাব খুঁজে পাইনি।' (৭৯)

মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যাই হোক না কেন, মঞ্চগুরুকে কিন্তু আর সকলেরই মতো প্রণাম জানিয়েছেন তিনি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীমতী নিভাননী, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য জানালেন, শিশিরবাবুকে আর সকলেরই মতো রামকৃষ্ণের পটে প্রণাম করে মঞ্চে প্রবেশ করতে তাঁরা দেখেছেন। আলোচনাক্রমে বিবেকানন্দের নাম

উচ্চারিত হলে মাথায় হাত ঠেকাতেন শিশিরকুমার, প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তার সাক্ষী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁব মনোভাব কি ছিল? সে উত্তরটি সারাজীবনে প্রচ্ছন্ন রেখেও শিশিরকুমার ধরা দিয়েছেন শেষক্ষণে। একখানি কিশোর পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় শিশিরকুমারের জীবনকাহিনী লিখেছেন শ্রীনীরদ হাজরা —তারই উপসংহারে লেখক জানিয়েছেন :

"আগে থেকেই পুত্রকে বলে রেখেছিলেন শিশিরকুমার—তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যেন শোকযাত্রা না হয়, কোনো থিয়েটার বাড়ির সামনে যেন না নেওয়া হয় মালা দেবার জন্যে—সামান্য দড়িব খাটিয়ায় শুইযে কাশীপুব বতনমণি ঘাটে যেন শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত্যুব পব তিনি যেন মিলিত হতে পাবেন মহাকবি গিবিশচন্দ্রের চিতা-ভস্মের সাথে আব উপনীত হতে পারেন সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে একদিন যাঁর চরণস্পর্শে পুণ্য হয়েছিল বঙ্গবঙ্গালয়।" (৮০)

॥ ৯ ॥ নজরুল—অনিল বাগচী—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

বঙ্গ রঙ্গগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল কাজী নজরুল ইসলামেব। নজরুল শাক্তসঙ্গীত ধারার বিশিষ্ট কবি—তাঁকে এ যুগেব শ্রেষ্ঠ শাক্ত গীতিকার বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। অপূর্ব ভক্তি ব্যাকুলতা তাঁর সঙ্গীতে। আব কোনো শাক্ত কবি একালে রামকৃষ্ণপ্রভাবের বাইবে থাকতে সমর্থ? নজরুলের শ্রীরামকৃষ্ণভক্তি প্রকাশ পেয়েছে রামকৃষ্ণ-প্রশস্তিতে :

পবমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার।
জাগালে ভারতশ্মশানতীরে
অশিবনাশিনী মহাকালীরে
মাতৃনামের অমৃতনীরে বাঁচালে মৃত ভারত আবার॥

সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষিপূর্ণ-তীর্থবারি কলস।
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়
পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়
তব নাম মাখা প্রেমনিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥ (৮১)

গভীর শ্রদ্ধায় স্বামী বিবেকানন্দকেও প্রণাম জানিয়েছেন নজরুল :

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী ॥
যজ্ঞাহুতির হোমশিখাসম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম
ভারত অরবিন্দ নমো নমঃ বিশ্বমঠ বিহারী ॥ (৮২)

মঞ্চ ও চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার, নজরুল-সহচর অনিল বাগচীর নিজের কাছ থেকেই শোনা যাক তাঁর নিজের কথা :

"রামকৃষ্ণ-জীবনী বিষয়ক প্রথম বইতে সুর দি' স্টার থিয়েটারে। তারপর সিনেমাতে 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র', 'রাণী রাসমণি', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ', 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি'। যাত্রায় নট্টকোম্পানীর 'বিদ্যাসাগর' এখনো চলছে—থিয়েটারে রঙ্গনায় 'নট-নটী' এখনো চলছে (১৫ ৭.৭৭.)।

"আমি প্রতিদিন তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) প্রণাম করে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমার বাবা-মাকে যেমন শ্রদ্ধা জানাই, কাজ আরম্ভ করি। কারণ হচ্ছে, শ্রী-ম লিখিত বই পড়ে আমি যা জেনেছি তাতে একমাত্র সেই পরমপুরুষকে ছাড়া আর কাউকে পূর্ণ অবতার বলে মনে করতে পারি না। এই এতগুলি ছবি করেছি—আমি কোনোদিন কারও কাছে যাইনি—এই ছবিগুলি আমার কাছে এসেছে—অদৃশ্যের কোনো ইঙ্গিতে আমার কাছে এসেছে। সেটা আমার সৌভাগ্য। তাঁর আশীর্বাদ আছে বলেই আমি সুফল পেয়েছি—উত্তীর্ণ হয়েছি।"

"আমি যে [এই সকল নাটক বা ছবিতে] সুর করেছি—কি করে করেছি বলতে পারব না। ঐ সব বইতে সুর করতে গেলে সুরের ট্রান্স (Trance = abnormal state of suspended consciousness) আসে—এতে ভক্তি আসে ! Details এমন করে আসে যে বড় বড় শিল্পীদেরও এ details গলা দিয়ে আনতে বেশ কষ্ট হয়।" (৮৩)

"যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে ··"

'স্বামীজী' চলচ্চিত্রে নরেন্দ্রনাথ গান গাইছেন—শুনছেন আত্মসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন নরেন্দ্রের দিকে।

বাংলার দর্শক-শ্রোতাও সেইসঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল সেই গানটির সঙ্গে। সে-গানের নেপথ্য গায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজে কতখানি আনন্দ পেয়েছিলেন সে-গান

গেয়ে ?

"অসম্ভব তৃপ্তি পেয়েছি।" বললেন ধনঞ্জয় "ঐ ধরনের ছবি যখন প্রথম আসে তখন মানুষ তা বুকে আঁকড়ে ধরেছিল। আমি গান গেয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছি, মানুষ ছবি দেখে, গান শুনে সে তৃপ্তিকে অনুভব করেছে সমভাবে।"

"যে উপলব্ধি আমার ভেতরে আছে—অনুভূতিও আছে, তা ব্যক্ত করা যায় না—ঘটনাও আছে, তা-ও ব্যক্ত করার নয়। তবে এটা বলবো, ঠাকুরের গান করার আগে ঠাকুরের নির্দেশ এসেছে—কি ভাবে, কখন—সেটা বলা যাবে না। গান যা' কিছু করেছি ঠাকুরের ছবিতে, মানুষের যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে ভালো লাগার আধারটুকু তাদের মধ্যে ছিল!···ঠাকুরের কাজ ঠাকুর করিয়ে নিয়েছেন, মায়ের কাজ মা করিয়ে নিয়েছেন—এর ভেতর আমার কোনো কিছু নেই!"

ছেলেবেলা থেকেই ধনঞ্জয় পারিবারিক সূত্রে পেয়েছেন ধর্মীয় পরিমণ্ডল। "বাবা-মা'র তরফ থেকেই এটা বিশেষ করে পাওয়া—তারপর আস্তে আস্তে develop করেছে।" সেই বিবর্তনের অনেকখানি এসেছে রামকৃষ্ণ বিষয়ক ছবিতে অংশগ্রহণের সূত্রেই। উনি বললেন :

"ওঁর ছবি-তে গান করতে করতে তাঁর সঙ্গে কিছুটা একাত্ম হতে চেয়েছি।

"গানের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলা যেটা প্রকাশিত হয়েছে আমি তার সামান্য অংশ নিয়েছি, দুটো গান করে ; আসলে তাঁর জীবনটা এবং যা তিনি মানুষের জন্যে রেখে গেছেন তার মধ্যে উচ্চমার্গের শ্রেষ্ঠতম বস্তু থাকলেও নিতান্ত একটি মূর্খ লোকও তা উপলব্ধি করতে পারে।···ঐ যে সাধারণভাব ঐটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে। মহাপণ্ডিত যা অনেক কথায় বলেছেন, তা তিনি একটি ছোট্ট কথায় বলে গেছেন—যা' অতি মূর্খও বুঝতে পারবে এবং সে বুঝতে পারা সাময়িক নয়—এ বুঝতে পারা সারা জীবনের সম্পদ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক ছায়া-ছবিতে সঙ্গীতাংশে সবচেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আজ ভক্তিসঙ্গীত গায়ক হিসাবে তাঁর স্থান প্রথম সারিতে।

ধনঞ্জয়-অনুজ পান্নালাল ভট্টাচার্যও ভক্তিসঙ্গীত, বিশেষ করে শ্যামাসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকার অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ধনঞ্জয় বললেন :

"আমি হয়ত জীবিকার তাগিদে কিছুটা কমার্শিয়াল কিন্তু তার (পান্নালালের) গান গাওয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। সে এক অন্তর্নিহিত আনন্দে গান গাইত—গান গাইতে গাইতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলত।" (৮৪)

পরিতাপের কথা, কাল সেই সাধকশিল্পীকে অকালে ছিনিয়ে নিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক কোনো ছবিতেই গান গাওয়ার সুযোগ পান নি পান্নালাল।

॥ ১০ ॥ পাহাড়ী সান্যাল—শান্তি গুপ্তা—শেফালিকা—কানন দেবী—সুচিত্রা সেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত নাটক বা ছবি-তে অভিনয় সূত্রে রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়ী সান্যালের মৃত্যুর পর দেশ পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল :

"এই সময় [শেষ জীবনে] তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কেও বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়েন। কথায় কথায় ঠাকুরের নানা কথার উপমা দিতেন।"

(শিল্পলোকের গন্ধর্ব:-রঙ্গ-জগৎ 'দেশ' ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)

চিত্র ও নাট্যসমালোচক শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়ের মতে :

"পাহাড়ী সান্যাল সম্ভবত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরম পুরুষ' এবং / অথবা 'কবি রামকৃষ্ণ, পড়ে ঠাকুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং আগ্রহী হয়ে ওঠেন।" (৮৫)

পাহাড়ী সান্যাল "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" ছায়াছবি-তে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে "বিশ্বরূপা" থিয়েটারে যোগদানও করেছিলেন। এই দুটি সূত্র থেকেও তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

নিজের বাড়িতে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তি গুপ্তা—সেখানে নিত্যপূজা হয় এখনও। এই কালীমূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে যেতেন থিয়েটারে—আবার থিয়েটার থেকে ফিরে এসে আবার সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম না জানিয়ে কোনো কাজ করতেন না। (৮৬)

১৯৭৩ সালে শান্তি গুপ্তা মারা গেছেন। ইদানীং থিয়েটারের সময়টুকু ছাড়া পূজা আচার নিয়েই তাঁর দিন কেটে যেত। মৃত্যুর এক বছর পরে তাঁর পরিত্যক্ত শোওয়ার ঘরে প্রবেশ করে দেখি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সমীরণ গুপ্ত (নিজেকে তিনি শান্তি দেবীর পুত্র বলেই মনে করেন) এখনো সেই আগের মতোই সাজিয়ে রেখেছেন। প্রভাতে ঘুম ভেঙেই যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি চোখে পড়ে সেইভাবেই রেখেছিলেন শ্রীমতী গুপ্তা —সেই একইভাবে ছবিটি রয়েছে—পূর্বেকার মতোই ফুলের মালায় সাজানো।

শ্রীমতী গুপ্তা প্রতিবেশীদের কাছে তাঁর করুণা ও দাক্ষিণ্যের জন্যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন। থিয়েটার জগতে এককালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী যখনই সময় পেতেন ছুটে

যেতেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বেলুড় মঠে—প্রণাম জানিয়ে আসতেন ইষ্টদেবতার কাছে। (৮৭)

সেকালের আর এক নায়িকা শেফালিকা (পুতুল)।
অভিনয়-জগৎ পরিত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরের নায়েক কলোনীতে বাস করতেন শেষ জীবনে। অভিনয় জগতের অভিজ্ঞতা ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে জানালেন :
"আমাদের আগেকার দিনের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত —ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সকলের ছবি থিয়েটারের 'লবী'-তে টাঙানো থাকতো—আমরা প্রণাম করতাম। আর প্রণাম করতাম স্টেজকে এবং শিক্ষাগুরুকে।
"এখনও সকাল সন্ধ্যা যখনই ঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) প্রণাম করি তখনই বলি, ঠাকুর তুমি তো বিনোদিনীকে দয়া করেছিলে, গিরিশ ঘোষকে দয়া করেছিলে। আমিও তো অভিনেত্রী—আমাকেও একটু দয়া করো।" (৮৮)
মঞ্চ থেকে ফিরে জীবনের প্রান্তসীমায় এ প্রার্থনা তো সকল অভিনেত্রীরই।

শ্রীমতী কানন দেবী বৎসরের প্রথম দিনটিতে তো বটেই অন্য দিনও সময় পেলে চলে যান দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কিংবা বেলুড মঠে—সঙ্গে থাকেন তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ। তার কারণ "ওখানে যেতে ভাল লাগে।" মঠের অনেক সন্ন্যাসীর কাছেই তিনি পরিচিত।
আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হতো "দিনের বাণী"। বিশেষ করে রামকৃষ্ণের বাণী থাকলে কানন দেবী আগ্রহ সহকারে পড়তেন। তারপর পড়েছেন "কথামৃত" —আরও গভীরভাবে জেনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। কাননদেবীর মতে দেবতা বলে নয়, উনি যেন আমাদের বড় কাছের মানুষ—উনি ঈশ্বরের মতো দূরের বস্তু নয়। আমাদের অন্তরের সঙ্গে ওঁর যেন গভীর যোগ রয়েছে। (৮৯)

চলচ্চিত্র জগতের এক সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন সম্পর্কে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের একটি ছাত্রের পত্র প্রকাশিত হয়েছে 'আনন্দলোক' পত্রিকায় গত ২৩ আগস্ট ১৯৭৫ :—
"অনেকেই বোধহয় জানেন না তিনি (শ্রীমতী সেন) রামকৃষ্ণ ঠাকুর তথা মিশনের একজন পরম ভক্ত। দেখলাম (মহালয়া ১৯৭৪) প্রথমে মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহারাজের দর্শন নিয়ে নিলেন। পরে প্রত্যেকটি মন্দির তিনি ও তাঁর মেয়ে ঘুরলেন।

সারদামায়ের মন্দির এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান মন্দিরে তাঁর গলায় কাপড় দিয়ে সাষ্টাঙ্গ ভক্তিপূর্ণ প্রণামে, সেদিন সেখানে উপস্থিত সবাইকারই মনে সনাতন বাংলার মেয়ের সেই অবিনশ্বর রূপটি ভেসে উঠেছিল।"

শুধু বেলুড় মঠেই নয়, সারদাদেবীর স্মৃতিবিজড়িত জয়রামবাটিতেও গিয়েছেন অনেকবার। জয়রামবাটির প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী পরমেশ্বরানন্দের স্নেহ লাভ করেছেন। দীক্ষা গ্রহণ করেছেন বেলুড় মঠ থেকেই। (৯০)

শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে জানিয়েছেন :

"আমার শয়ন ঘরে দৃষ্টির সম্মুখে সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি থাকে। প্রাতঃকালে ঐ মহাপুরুষের ছবির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করেই শয্যাত্যাগ করি এবং প্রাত্যহিক কাজ আরম্ভ করি। দুঃখ ও বেদনাবিধুর মুহূর্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আমায় সান্ত্বনা দেয়—দেহমন ভেঙে-পড়া মুহূর্তে নূতন বল লাভ করি, চরম অশান্তিতে অনুভব করি পরম শান্তি।"

"স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটক করার সময় থেকে আমার গলার লকেটে কালীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রয়েছে, যা অনুক্ষণ আমার বক্ষ ছুঁয়ে হৃদয় স্পর্শ করে থাকে। এই লকেট সমস্ত আপদবিপদ থেকে আমায় রক্ষা করে—দিশেহারা অবস্থায় পথ দেখায়, মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে অভিনয়ে দর্শককুলকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা দেয়। এই আমার অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস। ঐ লকেটশুদ্ধ হার আমার গলায় না থাকলে মঞ্চে প্রবেশ করতে আমি পারি না, মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলি।"

"কথামৃত পড়ে বা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামকৃষ্ণের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মায় নি। পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পর শুধুমাত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় ঐ মহাপুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ঐ ছবির দিকে তাকালে আমার মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা আনন্দ কি অতীন্দ্রিয়, তা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারব না। থিয়েটারের সান্নিধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ যে আরও বেড়েছে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়।" (৯১)

যাত্রাজগতে শ্রীরামকৃষ্ণর ভূমিকায় সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান অভিনেতা পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ও পরিবর্তন সম্পর্কে অনেকেই জানেন। পালাকার ৺ব্রজেন দে ও চন্দ্রলোক অপেরার শ্রীকমলকৃষ্ণ খাঁয়ের জবানবন্দীতে তাঁরা পূর্ণেন্দুবাবুর অতীত ও বর্তমান জীবনের পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন।

পূর্ণেন্দুবাবুকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তিনি জানালেন "হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই—যাকে বলে আমার মতিগতি ফিরেছে। তবে সংসারধর্মী তো, তার মধ্যে থেকেই যতদূর সম্ভব ওই দিকে ভাসবার চেষ্টা করি। জীবনে বহু চরিত্র অভিনয় করেছি কিন্তু রামকৃষ্ণ-চরিত্র অভিনয় করার মতো আনন্দ কোথাও পাইনি—কোনো চরিত্রই আমাকে এমনভাবে কেড়ে নিতে পারে নি। প্রত্যেক রামকৃষ্ণ চরিত্রাভিনেতার জীবনেই প্রভাব আসে—আমারও এসেছে।" (৯২)

অগণিত শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা পেয়েছেন—তাঁদের শিল্পীজীবনে—ব্যক্তিগত জীবনেও। তাঁদের সকলের সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব নয়—সে কথা আগেই বলেছি। বিভিন্ন জবানবন্দীতে অনেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে অনেক শিল্পীর নামোল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মঞ্চের দিকপাল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দুর্গাদাসের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিধায়কবাবু জানিয়েছেন দুর্গাদাসবাবুর প্রণামের রীতি ছিল অভিনব। তিনি মঞ্চে প্রবেশ করার আগে এবং মঞ্চ পরিত্যাগ করার পূর্বে প্রণাম করতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। কখনো কখনো সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ে শিশুর মতো আকুলতায় কাঁদতেন।

নাট্যকার মহেন্দ্রবাবু (গুপ্ত) তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন অনেকের মধ্যে বিশেষ করে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায় ও রবি রায়ের কথা—"এঁরা প্রত্যেকেই বছরে দু'তিনবার করে ঠাকুরের আশ্রয়ে যেতেন। অন্য কোনো ঠাকুর দেবতার প্রতি এঁদের কোনো আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয় না—পরমহংস-দেবকেই এঁরা গ্রহণ করেছিলেন ইষ্টরূপে।"

শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল) বললেন কৃষ্ণভামিনীর কথা। মঞ্চজগতে তাঁকে সকলে 'কেষ্ট-মা' বলেই জানতো। তিনি কথায় কথায় বলে উঠতেন "জয় রামকৃষ্ণ"। শ্রীমতী চারুশীলার কথা জানিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ১৩২৬ সালের 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় শিমুলতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমন্দির ফাণ্ডে চারুশীলা দাসীর ৫০০ টাকা দানেরও উল্লেখ পেয়েছি।

॥ ১১ ॥ বহির্বঙ্গে : দিলীপকুমার—সাহুমোদক—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় —লতা মঙ্গেশকর—শুভলক্ষ্মী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য বিশ্ব-বিস্তৃত। সে সাম্রাজ্যের সমগ্র পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়—আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষের শিল্পীদের উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ এখনও উন্মুক্ত। তার জন্যে বিপুল অধ্যবসায় ও নিবিড় অনুশীলনের প্রয়োজন। এই প্রভাবের কিছু আভাস পেয়েছিলাম যখন বোম্বাই-য়ে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। মাদ্রাজেও পত্র মারফৎ যোগাযোগের কিছুটা প্রয়াস পেয়েছিলাম কিন্তু এই সব বিক্ষিপ্ত প্রয়াস কোনও সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটনের সহায়ক নয়।

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের শিল্পীদের সম্পর্কে জানিয়েছেন, বোম্বাইয়ের রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে যে সব চ্যারিটি হয় সেখানে তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকেই যোগ-দান করে থাকেন। এই রকম একটি অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়েছে—'দেশ' ২৯ মার্চ ১৯৫৮ (১৫ চৈত্র ১৩৬৪)-পত্রিকায়। সেই অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে বোম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবনে বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণার সংবাদ আমরা পেতে পারি :

"স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমের সাহায্যকল্পে বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনে বিমল রায়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমার একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন।

"সেই বক্তৃতা থেকে প্রত্যয় হয় যে, বর্তমান যুগ সম্পর্কে দিলীপকুমার সচেতন। এই যুগের অসংখ্য যুবকদের মধ্যে তিনিও একজন। এবং সেই অধিকারেই তিনি যুগের বেদনার সঙ্গে পরিচিত। বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই এ যুগের যুবকের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। মন অসাড় হয়ে পড়ে, হৃদয় হয়ে ওঠে সুধাসৌন্দর্যবোধশূন্য। অথচ এই সুধা মাধুর্যবোধের ভিত্তিতেই মনুষ্যত্বের মহিমা। দিলীপকুমার বলেছেন—আমার বিশ্বাস, ঐ সুধাসৌন্দর্যবোধ নিয়েই মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য। এই বিশ্বাসের বলে আমি উপকৃত হয়েছি।

"দিলীপকুমার আরো বলেন,—কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি আপন অন্তরের দ্বারস্থ হয়েছি। সকল প্রশ্নের উত্তর মেলে নি, সকল প্রশ্নের উত্তর পাবো, এমন আশাও আমি

করি নি। যেটুকু পেয়েছি, তার থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে সকল বেদনার উৎসমূলে প্রধানত উপস্থিত এই যন্ত্রযুগের প্রথাপদ্ধতি। এই যন্ত্রযুগে প্রগতি যত বিশাল-কায় হোক, একথা যে কোনো মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য যে, চূড়ান্ত বিচারে এই প্রগতির মূল্য খুব গভীর নয়। ভয় আর স্বার্থপরতা, বেদনা আর বিশৃঙ্খলার মূলে নিঃসংশয়ে এই যন্ত্রযুগের প্রভাব। বাস্তব প্রগতির জন্যে ব্যস্ত হয়ে আমরা উপেক্ষা করেছি অন্তরকে, আত্মাকে, অন্তরাত্মাকে। আমাদের অন্তর তাই মরুভূমি। যে-প্রগতি বা যে-ঐশ্বর্য মানুষকে সুখশান্তি থেকে বঞ্চিত করে, সে-প্রগতি প্রগতিই নয়, সে-ঐশ্বর্য ঐশ্বর্যই নয়।

"এই বেদনাবিদ্ধ যুগের পটভূমিকায় দিলীপকুমার স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের উল্লেখ করে বলেন—স্বামী বিবেকানন্দের সকল উপদেশ আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি, এমন কথা বলি না। বরং বলি তাঁর উপদেশাবলীর সঙ্গে আমার কেবলমাত্র চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আর সেই উপদেশাবলীর অতি সামান্যই আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু তারই ফলে, আমি আগের চেয়ে যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছি—ভ্রাতা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে কর্মী হিসেবে। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলীর আংশিক উপলব্ধি বলেই আমি অন্তরের তুচ্ছ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পেরেছি, আপন কর্মোন্নতির প্রেরণা পেয়েছি।"

বর্তমান যুগের পটভূমিকাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব সম্পর্কে বললেন বোম্বাইয়ের আর এক প্রবীণ পরিচালক-শিল্পী সাহু মোদক। শ্রীমোদক এই প্রসঙ্গে বললেন "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-বিবেকানন্দের আবির্ভাব বর্তমান মানব সমাজের পরি-প্রেক্ষিতে শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, আধুনিক বিংশ শতাব্দীর পক্ষেও সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।

৪ নভেম্বর ১৯৭৪ সন্ধ্যায় শ্রীসাহু মোদকের শিবাজী পার্কের আবাসে উপস্থিত হয়েই তাঁর জীবনের অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে উঠল। যে ঘরে বসে তাঁর জবানবন্দী গ্রহণ কর-ছিলাম তার একদিকের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় তৈলচিত্র। সামনে কাঁচের আধারে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি বিচিত্র আলোকসজ্জায় উজ্জ্বল। শ্রীমোদক সম্পর্কে তাঁর সহধর্মিনী (মারাঠী কবি) জানালেন 'মেরে পতিকে শ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী গুরুই হ্যায়'। (৯৪)

স্বামীজীকে গুরুপদে বরণ করে নেবার পশ্চাতে তাঁর মানসিকতার পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীসাহু মোদক নিজেই বললেন :

"স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর মহান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা, আমার ঋণের পরিমাণ ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারবো না। আমি অল্প কথায় শুধু এইটুকু বলতে পারি, যদি সাহিত্যের মাধ্যমে, তাঁদের কৃপায়, তাঁদের সংস্পর্শে না আসতাম, তাহলে

আমার জীবন শূন্যতায় পর্যবসিত হতো। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের কাছে অনেক শিখেছি—এবং এই দুই বৃহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার অনুভূতি, আমার আবেগ এবং গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব নয়। সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ করে আমাদের দেশে যখন সমস্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি তীব্র সঙ্কট (Challenging crisis) দেখা দিয়েছে তখন তাঁদের ভাবধারার গুরুত্ব অপরিসীম।…স্বাধীনতা আন্দোলনের পর আমাদের দেশে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে :…আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, আদর্শ, স্বপ্ন—স্বামীজীর ভাষায় বলতে গেলে "The very foundation of our life, the very backbone of our existence and the eternal theme of our being which has always been spirituality—আজ প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে—তিনি বিজ্ঞানী, শিল্পী, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিজ্ঞ অথবা অতি সাধারণ কৃষক বা শ্রমজীবী—যাই হোন না কেন, সকলের সম্মুখে এক মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছেন। ভাবলে অবাক হতে হয়, একটি ক্ষুদ্র গ্রামের একজন মানুষ, যাঁর আধুনিক শিক্ষা বা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে নি তিনি জীবনের এই সমুচ্চ মহিমা উদঘাটিত করে গেলেন এবং এক উজ্জ্বল যুবক, তরুণ ছাত্র নরেন্দ্রনাথ যাঁর সঙ্গে কাণ্ট, হেগেল, স্পেনসারের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ, তিনি সেই মহৎ ব্যক্তিত্বের কাছে নতজানু। বোধহয়, বর্তমান যুগের এইটাই সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা। জানি না আমাদের মধ্যে কতজন এই ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন।"

শ্রীমোদকের অভিমত, "আমাদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য বর্তমান যুবসমাজের পক্ষে এই মহৎ তাৎপর্য উপলব্ধিই একমাত্র পথ।" (৯৫)

প্রখ্যাত সাংবাদিক জ্যোতির্ময় বসুরায় জানিয়েছেন লতা মঙ্গেশকরের কাছে সব সময় "স্বামীজীর একটি লকেট থাকে।" (৯৬)

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকা লতা সম্পর্কে একটি রচনায় তাঁকে ভারতের 'প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও জনপ্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন আর এক সাংবাদিক এ. এস. রহমান। গত ২ জুলাই ১৯৭৮-এর 'সান্‌ডে' পত্রিকায় প্রকাশিত 'More famous than the P. M.' নামক প্রতিবেদনে শ্রীরহমান লিখেছেন :

"She [লতা মঙ্গেশকর] has no use for jewellery, and sports only a thin gold necklace from which hangs a pendant with a striking portrait of Swami Vivekananda worked in. Yes, she is deeply religious."

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর জবানবন্দীতে জানিয়েছেন : "সে [লতা মঙ্গেশকর] ত বিবেকানন্দ বলতে পাগল।...সে যেন একেবারে রামকৃষ্ণের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, কাজে কর্মে সবকিছুতেই। লতা, আশা—ওরা সকলেই ভক্ত, তবে লতা অনেক এগিয়ে গেছে।" (৯৭)

প্রসঙ্গত হেমন্তকুমার নিজের সম্পর্কে বললেন : "আমার জীবনের যে প্রেরণা—সে নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকেই পেয়েছি। প্রথম জীবনে বিবেকানন্দ পড়ি নি, এখন পড়ছি। দেখছি, আমি যে ভাবে জীবন যাপন করেছি, উনি সেইভাবেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন।"

বোম্বাইয়ের শিল্পীদের সম্পর্কে হেমন্তকুমার জানালেন "ওখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত প্রচুর—তবে ওরা বিবেকানন্দকে যতখানি জানে রামকৃষ্ণকে ঠিক ততখানি নয়।"

এ সম্পর্কে সাহু মোদকের অভিমত "বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহশীল—এবং এঁদের বেশীর ভাগই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।" (৯৮)

শুধু বোম্বাইতেই নয় মাদ্রাজেও শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ—বরং মাদ্রাজেই এই প্রভাব অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের এক সন্ন্যাসীর পত্র থেকে জানতে পেরেছি, ওখানকার রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রের সঙ্গে বহু শিল্পীরই যোগাযোগ আছে—অনেকেই ভক্ত। তবে এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নামটি মনে পড়ে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী শ্রীমতী শুভ-লক্ষ্মী।

প্রখ্যাত সাংবাদিক জ্যোতির্ময় বসুরায় জানিয়েছেন—"শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী ঠাকুরের ভক্ত।" (৯৯) কলকাতায় এলে শুভলক্ষ্মী অন্তত একবার বেলুড়মঠে যান। বিভিন্ন সাহায্যানু-ষ্ঠানে শুভলক্ষ্মীর যোগদানের কথা হেমন্তকুমারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি গানের রেকর্ডে প্রারম্ভিক স্তোত্ররূপে গেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্র 'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব-ধর্ম স্বরূপিনে। অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।' রেকর্ডখানির যাবতীয় রয়্যালটি তিনি বেলুড়মঠে দান করেছেন।

শুভলক্ষ্মীর ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া কঠিন কারণ এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা পালনের পক্ষপাতী।

আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতেও বহু "কবি, উপন্যাসিক, দার্শনিক, গায়ক গায়িকা" সভ্য আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অবলম্বনে যে সমস্ত নাটক সেখানে অভিনীত হয় সেগুলি অমুদ্রিত। (১০০) তাই সেগুলির আলোচনা বা মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

একাদশ অধ্যায়

কস্মৈ দেবায়

॥ ১ ॥

প্রণাম কার উদ্দেশে ?

রঙ্গালয়ের তাবৎ শিল্পী-কর্মী তাঁদের দৈনন্দিন মঞ্চজীবন শুরু করার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের পটে প্রণাম জানান। এটি প্রায় এক শতাব্দী কালের প্রচলিত রীতি। কিন্তু কেন তিনি প্রণামের অধিকারী ? শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত সম্পর্ক কি ? যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি—জবানবন্দী নিয়েছি, তাঁদের সকলের কাছেই এ প্রশ্ন করেছিলাম। সাধারণভাবে সেই প্রশ্নের যে উত্তর পেয়েছি তা হলো, 'তিনি রঙ্গমঞ্চের গুরু', 'তিনি রঙ্গমঞ্চের দেহধারী দেবতা, তাই তাঁকে আমরা প্রণাম জানাই।' যখন প্রশ্ন করেছি —কোন্ অধিকারে তিনি মঞ্চদেবতা বা মঞ্চগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ? তার উত্তর সকলের কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নি। সেকালের বর্ষীয়সী অভিনেত্রীদের অনেকেই অকপটে স্বীকার করেছেন, পরিষ্কার উত্তর তাঁরা দিতে পারবেন না। কিন্তু তারপর যখন জিজ্ঞাসা করেছি, 'তাহলে প্রণাম করতেন কেন'—তখনই দেখেছি অবিলম্বে হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে নিবিড় গলায় বলেছেন, 'সে কি, তা না করে স্টেজে উঠবো কেমন করে, অভিনয় করবোই বা কি করে ?'

আবার এ-ও দেখেছি অনেকেই বিচারশীল মন নিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে চেয়েছেন। তাঁদের কারও কারও উত্তর আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

আমাদের প্রশ্ন ছিল : "শ্রীরামকৃষ্ণকে মঞ্চের গুরুরূপে গ্রহণ করা হলো কেন ?"

অহীন্দ্রচৌধুরীর উত্তর : "তিনি গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, সর্বজনশ্রদ্ধেয়—তাই।"…(১)

জীবেন বসুর উত্তর : "শুনেছি, গিরিশবাবুর সময়ে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন—'চৈতন্যলীলা'। সেই থেকে, যেহেতু তিনি গিরিশবাবুর গুরু ছিলেন, সেইহেতু অভিনেতারা তাঁকে গুরু বলে মেনে নিলেন এবং সকলেই তাঁকে প্রণাম করে তবে স্টেজে প্রবেশ করতে থাকেন।"(২)

ছায়াছবির এক প্রখ্যাত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় আমাদের লিখে জানিয়েছেন : "নটগুরু গিরিশচন্দ্রের গুরু এবং নাট্য রচনায় গিরিশচন্দ্রের উৎসাহদাতা [তিনি]; তা ছাড়া সেকালে ঠাকুরের নাটক দেখতে আসার মধ্যে নাট্যসমাজকে স্বীকৃতি দান,

এইসব কারণেই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে মঞ্চদেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়।"(৩)

মঞ্চ ও চিত্র জগতের এক অভিনেতা কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "নাট্যসমাজকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। এই মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে নাট্যসমাজ, নাট্যশালা, অভিনয়শিল্পী। শ্রীরামকৃষ্ণকে মঞ্চগুরু, মঞ্চদেবতা হিসেবে মেনে নিয়ে, [তাঁকে] শ্রেষ্ঠ-জীবনশিল্পী বা শ্রেষ্ঠজীবন-রূপকারও বলতে পারি।"(৪)

চিত্র ও মঞ্চজগতের আর এক শিল্পী মৃণাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "সেকালে রামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষের নাটক দেখতে আসার মধ্যেই ছিল সমগ্র নাট্যসমাজকে স্বীকৃতি দান ; এবং এ-স্বীকৃতি ঐতিহাসিক। এ-কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঞ্চদেবতা।"(৫)

বর্ষীয়ান শিল্পী কানু বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "এর কারণ আমার মতে এই : গিরিশ-চন্দ্র তাঁর খুব ভক্ত হয়ে যখন থিয়েটার জগত ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীরাম-কৃষ্ণই তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'অভিনয় করে যাও, লোকশিক্ষা দাও।' গিরিশ বাবুদের সময়ে নটনটীদের কোনো সম্মান ছিল না। শুধু তখনই বা কেন ? আমি যখন অভিনয় করেছি, তখনই বা কতটুকু সম্মান ছিল ? এখন তো থিয়েটার করে লোকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছে, কতরকমের সম্মান পাচ্ছে, তখন আমরা নিজের বাড়ির লোকের কাছেও কোনো সম্মান পাই নি। আমি যখন প্রথম অভিনয় করতে যাই, তখন শিশিরকুমারের মতো ব্যক্তিও আমাকে বলেছিলেন, 'এ লাইন ভালো নয়, এ লাইনে তুমি এসো না।' অথচ সর্বজনঘৃণ্য এই রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন, এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে অপাঙ্‌ক্তেয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আশীর্বাদ করলেন। তাই তিনি ছাড়া আর রঙ্গমঞ্চের গুরু কে ?"(৬)

প্রবীণ পরিচালক-শিল্পী-সমালোচক সর্বজনশ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সিদ্ধান্তও একই রকম। তিনি বলেছেন, "তখনকার দিনে নট-নটীদের সমাজে স্থান ছিল না। এখন নট-নটীরা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাচ্ছেন—জনসাধারণের কাছ থেকে মর্যাদাও পাচ্ছেন। তখনকার দিনে তা ছিল না। তাঁরা ছিলেন অবজ্ঞাত। লোকে রঙ্গালয়ে গিয়ে হাত-তালি দিত, কিছু প্রশংসাও করতো, কিন্তু দু'একটি ইংরেজি কাগজে একটু আধটু মন্তব্য ছাড়া অন্য কাগজে সমালোচনা পর্যন্ত প্রকাশিত হতো না। সেই অবজ্ঞাত অভিনেতৃ-কুলকে প্রথম সম্মান দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর যখন প্রথম থিয়েটার দেখতে যান, তখন ছ্যাৎমার্গী উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা চমকে উঠেছিল। থিয়েটারের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রও। ঠাকুরই তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই খুব ভাল কাজ করছিস, ওতে লোকশিক্ষা হচ্ছে।' তারপর থেকেই সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে—তাঁকে রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"(৭)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর জবানবন্দীতে জানিয়েছেন, "শিশিরকুমার ভাদুড়ী মনে করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে আসার ফলে বাঙালী সমাজে তখন থিয়েটার সম্পর্কে যে অনীহা ছিল তা থেকে থিয়েটার মুক্তি পেয়েছিল। থিয়েটারকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠার মূলে শ্রীরামকৃষ্ণের দান অবশ্যই আছে।"(৮) রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল, সে বিষয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব অভিমত আগেই উদ্ধৃত করেছি। (পৃ ৭৬)

॥ ২ ॥

উপরিউক্ত অভিমতগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণ নট-গুরু গিরিশচন্দ্রের ধর্মগুরু হওয়ার সূত্রেই বঙ্গ রঙ্গালয়ে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত গুরুকে সমগ্র বঙ্গশালা গুরুরূপে গ্রহণ করবে কেন? (এ কথা ঠিক, গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে সমকালীন নট-নটীদের অন্তরে পৌঁছে দেবার জন্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সে কি নিছক ব্যক্তিগত গুরু হিসেবে?) গিরিশের ব্যক্তিগত গুরু যিনিই হোন না কেন, তিনি লোকালয়ত্যাগী, উদাসীন, গুহাবাসী কোনো এক বিরাট অধ্যাত্ম পুরুষ হতে পারতেন, তাকে নিশ্চয় মঞ্চ জগত তার অবিসংবাদিত গুরুরূপে গ্রহণ করতো না। গুরু নির্দেশে গিরিশ যদি মঞ্চের পঙ্কিল জীবন পরিত্যাগ করে অবশিষ্টকাল ধ্যানধারণার মধ্যে অতিবাহিত করতেন, তাহলে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের কল্যাণ হতো কিন্তু তাতে মঞ্চজগতের লাভ হতো কতটুকু?

না, নিছক গিরিশের ধর্মগুরু রূপে নন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অধিকারেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দেবতার আসন লাভ করেছেন। সে অধিকার হলো—এই ধর্মগুরু বঙ্গমঞ্চকে লোকশিক্ষার বাহন মনে করেছিলেন—এবং নাটকের মধ্যে দেখেছিলেন বিশাল রহস্যময় মানবজীবনের খণ্ড কিন্তু তীব্র গভীর-এক রূপকে। বাস্তব জীবনকে তিনি সামান্য মনে করেন নি—এই জীবন দিয়েই জীবনোত্তরকে স্পর্শ করতে হয়। শৈশব থেকে তাঁর জীবনে যে সাধনার সূত্রপাত তা মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি কখনো ভাবতন্ময়, কখনো আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-প্রতিবেশী সকলের সাহচর্যে প্রবল উচ্ছ্বাসে আনন্দ-উদ্বেল। মানবমনের জটিল-রহস্য উদ্‌ঘাটনে ছিল তাঁর প্রবল উৎসাহ। ছোট-বড় ধনী-নির্ধন সকলের সঙ্গে অকৃত্রিম মেলামেশায় তিনি মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকেই জানতে ও বুঝতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে কোনো ব্যক্তিকে দর্শন করার কালে তার প্রকৃতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে নির্ভুল বিচার তাঁর মানবজীবন সম্পর্কে

অভিজ্ঞতাই সূচিত করে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে প্রথমেই তাঁর চোখে পড়েছে বহুজনের উপস্থিতি এবং সেই জন-সান্নিধ্যে তিনি আনন্দলাভ করেছেন—সকলের মধ্যেই দেখেছেন ঈশ্বরকে।

মানবজীবন সম্পর্কে এই কৌতূহল ও অভিজ্ঞতা শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিচিত অধ্যাত্মপুরুষদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। সেই মানবপ্রেমের সূত্রেই তিনি সর্বজনের শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। আমরা মনে করি, এই মানবজীবনপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণই গ্রহণ করেছিলেন লোকজীবনের আনন্দ-উৎস বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়কে। বঙ্গরঙ্গশালার শিল্পীকর্মীর প্রণাম এই মানবপ্রেমিককেই।

॥ ৩ ॥

শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চের প্রতি সমকালীন সমাজের বিরূপতা ও প্রতিকূলতার উল্লেখ করে রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ও পৃষ্ঠপোষকতা দানে সাহসিকতার কথা বলেছেন। সে বিরোধিতার কিছু বিস্তারিত পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়েছি—সেই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকাকে দুঃসাহসিক বলতেও আমাদের দ্বিধা নেই। অভিনেতা মদ্যপ গিরিশচন্দ্র ও অসচ্চরিত্র নট-নটীদের সম্পর্কে তাঁর উদার মনোভাবের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এদেশ থেকে অভিযোগ গেছে ম্যাকসমূলারের কাছে, সে কাহিনীও আমরা বলেছি। আমরা সেকালের এইসব সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নীতিবাগীশদের মনোভাবকে যত অসঙ্গত, উদ্ভটই মনে করি না কেন, শতবর্ষ পূর্বের সমাজ নিশ্চয় তা মনে করতো না। এই সামাজিক প্রতিকূলতা শ্রীরামকৃষ্ণের অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে রকম দৃঢ়তার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও গিরিশচন্দ্রকে গ্রহণ করেছিলেন, তা সাধারণ ধর্মীয় মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমন কি, বলতে পারি, তাঁদের পক্ষে ও-জিনিষ কার্যতঃ অসম্ভব ছিল।

এই অবজ্ঞা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। স্মৃতি-সংহিতা শাসিত সমাজে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে কতখানি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো (কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল) তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। (৯) সেই ধারাই চলে এসেছিল সমকালীন সমাজ পর্যন্ত। ক্ষুব্ধ গিরিশচন্দ্র তাই বলেছিলেন :

"লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।"

গিরিশের এই ক্ষোভ শুধু উনিশ শতকীয় শুচিতাবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই সত্য নয়—

এর পিছনে আছে বহু যুগের অবহেলিত অভিনেতাদের দীর্ঘশ্বাস।

বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্রকে একবার হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোনো সভা-সমিতিতে কখনো আপনার দেখা পাই না কেন?'

"অতি মৃদুহেসে তিনি বলেছিলেন, 'সভা যাঁরা করেন তাঁরা আমাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত নন। আর যেতেও আমার ইচ্ছা হয় না। উচ্চ শিক্ষিতরা থিয়েটারে আমাদের অভিনয় দেখে খুশী হন বটে, কিন্তু [রঙ্গালয়ের] বাইরে মনে মনে আমাদের ঘৃণা করেন। তাই তফাতে থেকেই মান বাঁচাই।" (১০)

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমাজ-প্রত্যাখ্যাত শিল্পীকুলকে দিলেন মানুষের মর্যাদা। বুদ্ধদেব নর্তকী আম্রপালিকে করুণা করেছিলেন, নটী কুবলয়াকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা শিল্পী জীবনকে পরিত্যাগও করেছিলেন। আর রামকৃষ্ণ তাঁর যে দ্বাদশ সন্তানকে গৈরিক সন্ন্যাসবস্ত্র লাভের অধিকার দিয়েছিলেন স্বহস্তে, তাঁদেরই একজন 'নোটো গিরিশ'—চিরকাল গুরুর নির্দেশে অভিনয় করে গেলেন। পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় ঘটনা।

মহান মানবপ্রেমিকের এই দুঃসাহসকেই প্রণাম জানায় বাঙালী শিল্পীসমাজ।

॥ ৪ ॥

কেন প্রণাম?—এর একটি গভীর উত্তর আমরা খুঁজে পাই ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের উক্তিতে। শ্রীমতী ইব্রাহিমের মতে বাঙালীর জাতীয় প্রবণতার উৎসমূলে গিরিশকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি লিখেছেন :

"বাংলা সাহিত্যে ধর্মমত প্রচারের জন্য সার্থক প্রয়াস দেখা যায় পরমহংসদেবের অন্যতম ভক্ত শিষ্য নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখনীতে। আমি পূর্বে যে সব ধর্মমূলক নাটকের আলোচনা করেছি [গিরিশ পূর্ববর্তী] সেগুলিকে ঠিক ধর্মমূলক বলা যায় না। কারণ একমাত্র হিন্দুধর্মের অন্তর্গত পৌরাণিক কাহিনীর রোমন্থন ছাড়া ঠিক ধর্মের মূল কথা বা সে সম্পর্কিত কোনোও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা মতবাদ এ নাটকগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে নি। তাই এই নাটকগুলিকে ধর্মমূলক নাটক না বলে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। এই নাটকগুলিতে নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নাটকীয় ঔৎসুক্য রক্ষিত হয় নি, কারণ চিরপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর গদ্য অথবা পদ্যবদ্ধ কথোপকথনকেই সে যুগে আমরা নাটক আখ্যা দিয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। তারাচরণ শিকদার থেকে আরম্ভ করে গিরিশের প্রথম জীবন এই সকল নাট্যসৃষ্টিতেই

সীমাবদ্ধ ছিল। এই গতানুগতিক পথেই গিরিশের নাট্যক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবনে পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করেন। রামকৃষ্ণের ধর্ম উপদেশে গিরিশের জীবনেও অনাসক্ত বৈরাগ্যের উদয় হয়।" (১১)

শ্রীমতী ইব্রাহিমের মতে এই যোগাযোগের ফলে বাংলা নাটক পৌরাণিক গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃত ধর্মমূলক নাটক রচনার খাতে প্রবাহিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের নিজের কথা থেকেই এর সমর্থন পাওয়া যাবে। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন :

"বাঃ তুমি বেশ সব লিখছো!"

"গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।" (১২)

শুধুই গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি মাত্র! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন "ভিতরে ভক্তি না থাকিলে চালচিত্র আঁকা যায় না।" ভিতরের সেই সম্পদ সম্পর্কে গিরিশকে সচেতন করে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যের প্রয়োজন ছিল। রামকৃষ্ণ সংস্পর্শেই গিরিশচন্দ্র পেয়েছেন তাঁর অন্তরস্থিত শক্তির সন্ধান—সেই শক্তি তাঁকে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে—প্রকৃত ধর্মমূলক নাটক রচনার মানসিকতা গড়ে তুলেছে। পরে গিরিশচন্দ্রই বলেছেন :

"আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি; যাহা জীবনে কখন দেখি নাই, তাহা কখনও লিখি না; কিন্তু সকলে আমার মত দৃষ্টি কোথায় পাইবে? ঠাকুরের কৃপায় আমি যে অবতার পুরুষের অদ্ভুত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃণ্য বারনারীকুলের জীবন পর্যন্ত দেখিবার অবসর পাইয়াছি। সংসারে সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত ঐরূপে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা আর কাহার ভাগ্যে হইয়াছে?...সাধারণে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া আমি আমার সর্বোচ্চ চিন্তা ও কল্পনাসমূহ লইয়া অনেক সময় আমার পুস্তকের চরিত্র সকল গঠন করি না।" (১৩)

গিরিশের চালচিত্র অঙ্কনের ভক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণই পরিণত করেছিলেন প্রতিমা গঠনের শক্তিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য গিরিশের মানসিকতাকে পরিবর্তিত করার বিষয়ে শ্রীমতী ইব্রাহিমের অভিমতের সত্যতা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসার আগে নাটক-প্রহসন-গীতিনাট্য মিলিয়ে গিরিশচন্দ্রের মোট রচনা ছাব্বিশটি। এর মধ্যে প্রহসন ও গীতিনাট্য বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা দাঁড়ায় সতেরোটি। রামায়ণ অবলম্বনে রচিত—

রাবণ বধ।

সীতার বনবাস।
লক্ষ্মণ বর্জন।
রামের বনবাস।
সীতাহরণ।

মহাভারত অবলম্বনে রচিত
অভিমন্যুবধ।
পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস।
ধ্রুব চরিত্র।
নল দময়ন্তী।
বৃষকেতু।
শ্রীবৎসচিন্তা

অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে :
দক্ষযজ্ঞ।
কমলে কামিনী।

মহাপুরুষ জীবনী অবলম্বনে
চৈতন্যলীলা।

এ ছাড়া 'প্রহ্লাদ চরিত্র' রচনা কালেও গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের ভাবধারার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নি—এ আমরা পূর্বেই বলেছি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের যে সকল নাটক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে উপরি-উক্ত তালিকার মধ্যে সেগুলিকে আমরা খুঁজে পাই না। রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে গিরিশের ধর্মচেতনার উন্মেষের পরেই আমরা পেয়েছি, 'বিল্বমঙ্গল, 'জনা', 'পাণ্ডব গৌরব' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ ধর্মমূলক নাটকগুলিকে। তা ছাড়াও মহাপুরুষ জীবনী অবলম্বনে 'বুদ্ধদেব চরিত' বা 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে ধর্মচেতনার প্রবল স্রোত বাঙালী দর্শক সমাজকে প্লাবিত করেছে। শ্রীমতী নীলিমা ইব্রাহিমের কথায় এইখান থেকেই "ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী-মন গিরিশ নাটকের ভেতর তাদের অন্তরের সুর খুঁজে পেলো।" (১৪)

বাঙালীর জাতীয়প্রবণতার এই গাঙ্গ্যপ্রবাহের গঙ্গাধর শ্রীরামকৃষ্ণকেই বাংলার শিল্পী-সমাজের প্রণাম নিবেদন।

॥ ৫ ॥

শ্রীমতী মলিনাদেবী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন "ছেলেদের সকলের কথা বলতে পারি না, কিন্তু থিয়েটারে মেয়েদের মধ্যে এমন কাউকে দেখি নি যে তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] ভক্ত নয়।"

এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম শ্রীমতী নিভাননী, শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল) এবং আরও অনেকের কণ্ঠে।

বিশেষ করে মেয়েরা সকলেই কেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হয়ে উঠেছেন—সে কি তাঁদের স্বাভাবিক নারীসুলভ মানসপ্রবণতার জন্য অথবা অন্য কোনোও গভীরতর কারণে?

যে সমাজে নটের জীবন বিড়ম্বিত—অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করছেন, শুধু এই কারণে সমাজের দৃষ্টিতে পতিত, সেই সমাজে পতিতা অভিনেত্রীর মর্যাদা কী ছিল, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তারা নারী নন—শুধু মোহিনী কামিনী। এ নিয়ে কোনো ক্ষোভের প্রশ্ন তাদের মনেও ওঠে নি, যদি উঠেও থাকে প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবতেও পারেন নি, কিন্তু তাঁদের সমস্ত ধারণাকে একদিন বিপর্যস্ত করে দিল শ্রীরামকৃষ্ণের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিতি।

'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক দেখার দিন গিরিশচন্দ্রের উপদেশে নটীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করতে এসেছেন—কেউ কেউ কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে দূর থেকেই প্রণাম করছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাহসভরে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে ফেললেন। শ্রীম লিখেছেন :

"পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা থাক থাক ; মা থাক থাক।' কথাগুলি করুণা মাখা।" (১৫)

ঠিক সেই মুহূর্তে, অভিনেত্রীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল শ্রী-ম সে-কথা লেখেন নি। কিন্তু যাঁরা পুরুষের মুখে বাসনাতুর সম্বোধনেই অভ্যস্ত, তাঁরা দিব্যজ্যোতি একটি পরমাশ্চর্য মানুষের মুখে শুনেছে 'করুণা-মাখা মা ডাক'—সেই মুহূর্তে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কাকে পেয়েছিলেন? তাঁদের আলোড়িত সত্তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল কোন্ পরমাজননী—তা কি আমাদের পক্ষে কল্পনায় আনা সম্ভব?

সেদিন নটীরা প্রণাম সেরে চলে যাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছেন "সবই তিনি, এক এক রূপে?"

সাধক রামকৃষ্ণের মুখেই শুনি :

"রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাত সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান

বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগলুম।

"কুমারীদের এনে তখন পূজা কত্তুম। দেখতুম, সাক্ষাৎ মা।

"একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীলবসন পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ্যা। দপ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম, কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাত সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য হয়ে সমাধিঅবস্থা হয়ে রইলো।" (১৬)

"কাল মা-কে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নেই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

"আর একদিন মুসলমানের মেয়ে রূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে বেড়াতে লাগলো ও ফছকিমি করতে লাগলো।" (১৭)

কল্পনা করি—তিক্ত বিদ্রূপ নিয়ে, তীব্র লালসা নিয়ে, অফুরন্ত ঘৃণা নিয়ে, শুচিতার অহঙ্কার নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দণ্ডধারী সমাজ—আর সামনে রয়েছেন স্নিগ্ধ করুণা নিয়ে, অকৃত্রিম দাক্ষিণ্য নিয়ে, নির্ভয় আশ্রয় নিয়ে শুচি সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি সর্বস্তরের নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর আরাধ্যা দেবীকে।

বাইরের সমাজের কথা দূরে থাক, থিয়েটারের অভিনেত্রীরা অভিনেতাদের কাছেও কি মানুষের মর্যাদা লাভ করেছিলেন? তাঁদের দৃষ্টিতে অভিনেত্রীরা ছিলেন necessary evil—সে কথা তাঁরা বার বার বলেছেনও। উচ্চ সম্প্রদায় থেকে তখন নারীশিল্পী পাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই এঁরা থিয়েটারে গৃহীত হয়েছিলেন। অথচ শিল্পী হিসাবে মানুষ হিসাবে বিনোদিনী—তিনকড়ি—তারাসুন্দরীরা কম যোগ্য ছিলেন না।

রঙ্গশালায় নারী মর্যাদার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই অভিনেত্রী সম্প্রদায় পরিপূর্ণ অন্তরে প্রণাম জানায়।

॥ ৬ ॥

বাইরে যখন জাতিভেদ ও ধর্মভেদের সমাজ তার নানা গণ্ডি নিয়ে বর্তমান, তখন মঞ্চের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে উঠেছে! সেখানে প্রচলিত জাতিভেদ বহুলাংশে শিথিল। এ ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই রঙ্গজগতে প্রচলিত হয়েছিল। যাত্রার দলের শূদ্র অধিকারী ব্রাহ্মণের প্রণম্য হয়েছেন, মুসলমান হিন্দুর গুরুর আসন পেয়েছেন, হিন্দু মুসলমানের কাছে শিল্পী হিসাবেই প্রণাম পেয়েছেন। মঞ্চজগতেও ব্যক্তিগত

ধর্মবোধের পাশাপাশি শিল্পীর ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে সানন্দে সহাবস্থান করে—হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান। এ যেন মিলবার, মেলাবার একটা জগত।

এই জগতের কেন্দ্রে আসীন হতে পারেন কে?

যাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছে সকল ধারা—যিনি মহাসঙ্গমের তীর্থ—তিনিই নন কি? রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা'। বলেছিলেন, তারই ফলে 'নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।'

সেই নূতন তীর্থধূলির তলে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছে বাংলার শিল্পীসমাজ।

তথ্যপঞ্জী

১। অহীন্দ্র চৌধুরীর জবানবন্দী—১।৭।৭৪

২। জীবেন বসুর জবানবন্দী—৩১।১২।৭৩

৩। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি—২৫।৮।৭৫

৪। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি—১০।৮।৭৫

৫। মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি—২৯।৮।৭৫

৬। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী—২২।৬।৭৪

৭। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জবানবন্দী—২৮।৫।৭৪

৮। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দী—১০।৭।৭৬

৯। মনুসংহিতা অনুযায়ী "যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধনভোগে যজ্ঞফল বিক্রয় করে, **যে নটবৃত্তি করে**, যে বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে" এদের সকলের অন্ন নিষিদ্ধ। মনুর বিধান অনুযায়ী নট ও গায়ক ছাড়াও "যে মঞ্চাবতরণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে" তাদের অন্নও নিষিদ্ধ। (মনুসংহিতা, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ—৯০)

বিষ্ণুসংহিতাতেও নট ও নাট্যপ্রস্তাবকের অন্ন নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই অন্নগ্রহণে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। (বিষ্ণু-সংহিতা, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ—৮৬)

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতানুসারে মাতাল, পাগল, অতিবৃদ্ধ, জড়-বধিরদের সঙ্গে রঙ্গাবতারি-নটের সাক্ষ্যও গ্রহণের অযোগ্য। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, আর্যশাস্ত্র সংস্করণ—৬৯)

একেবারে চরম বিধান ঘোষিত হয়েছে যমসংহিতায় :

"রজকশ্চর্মকারশ্চ **নটো** বরুড় এব চ।
কৈবর্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৪

অর্থাৎ রজক, চর্মকার, **নট**, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্ত জাতি [সম্প্রদায়] অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। (আর্যশাস্ত্র সংস্করণ—৪)

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান স্টেজ' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে অভিনেতার স্থান প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"But the reputation of an actor, generally speaking was rather low in society, actresses often led immoral lives and sometimes even their husbands were parties to many scandalous affairs ;

therefore Manu, the great legislator, imposes only a small penalty in cases of adultery with actor's wives. But surely the position of an Indian actor was never so precarious or dishonourable as it was among the actors in the merry times of Queen Elizabeth. There was a noble side of their profession and people always honoured them."

ডক্টর দাশগুপ্ত এই সম্মানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন "Bharat Muni, the author of the Natya Sastras, though an actor, has always been honoured as a sage…"

কিন্তু ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের জন্যই মুনি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন—নট হিসাবে নয়। শুধু নটরূপে তিনি কতখানি সম্মানের অধিকারী হতেন সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে কারণ সে যুগের অন্য কোনোও নট সম্মান পেয়েছিলেন এমন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

ডক্টর দাশগুপ্ত নটের সম্মানের আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্যে দেখতে পাই (১) বাণভট্টের সঙ্গে কয়েকজন নট-নটীর পরিচয় ছিল একথা বাণভট্ট উল্লেখ করেছেন 'হর্ষচরিতে' (২) ভর্তৃহরি ও ভবভূতিরও নট বন্ধু ছিল।

নাট্যকারদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই অভিনেতাদের বন্ধুত্ব থাকে—কারণ তাঁদের নৈপুণ্যের জন্যেই নাট্যকারদের খ্যাতি বিস্তৃত হয় কিন্তু তার দ্বারা অভিনেতাদের সামাজিক সম্মান বিশেষ বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয় না। মহাভারতে দেখতে পাই যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কালে নট, মল্ল, ঝল্ল, সূত ও বৈতালিকগণ ধর্মপুত্রের উপাসনায় অংশ গ্রহণ করেছেন কিংবা উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহকালে সূত ও বৈকালিকগণের সঙ্গে নটও সম্মানিত অতিথিবর্গের আপ্যায়নে অংশ গ্রহণ করেছেন কিন্তু এর দ্বারা শিল্পীহিসাবে তাঁদের সামাজিক অবস্থা কিছু গৌরবজনক মনে করার সঙ্গত কারণ নেই।

১০। 'যাঁদের দেখেছি'—(১৩৫৭)—হেমেন্দ্রকুমার রায়—২৬-২৭।

১১। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক'—ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ প্রকাশন-১৯৬৪)—২৫১-৫২।

ডক্টর শ্রীমতী নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিহারীলাল মিত্র বৃত্তি লাভ করে নাটক সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। এর পরে দেশ বিভাগ হলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে চলে যান এবং কিছুকাল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের অধীনে গবেষণা কার্য শেষ করেন। শ্রীমতী ইব্রাহিম বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা।

১২। কথামৃত—(৩য় ভাগ)—১০৬।
১৩। 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র'—শ্রীশচন্দ্র মতিলাল।
'উদ্বোধন', জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।
১৪। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক' : ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম —২৫৩।
১৫। কথামৃত (৩য় ভাগ)—১১৪।
১৬। কথামৃত (২য় ভাগ)—৪৯।
১৭। কথামৃত (৪র্থ ভাগ)—২।

পরিশিষ্ট

কিছু অতিরিক্ত সংবাদ

১. শ্রীরামকৃষ্ণের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দেখার দিন লাটু মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন লাটু মহারাজ :

"এর [স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ] পরেও হামাদের নিয়ে তিনি থিয়েটরে গিছিলেন। একদিন 'দশমহাবিদ্যা' (শেষে ইহারই নাম দক্ষযজ্ঞ হয়) পালা হচ্ছিলো। সেখানে গিরিশবাবুকে যেই বলতে শুনলেন 'শিব নাম আর না রাখিব ধরায়' অমনি উনি বললেন—'শালা বলে কি, শিব নাম আর না রাখিব ধরায়! শালা আচ্ছা শিক্ষা দিচ্ছে ত। এ সব আর শুনতে নেই, কি বলো?' গিরিশবাবু শুনলেন ঠাকুর চলে যেতে চান। অমনি সেই পোষাকে এসে গেলেন। বললেন, 'আর একটু শুনুন'। ঠাকুর বললেন 'এ সব কি লিখছো—শিব নাম আর না রাখিব ধরায়! —এসব কি লিখতে আছে?' গিরিশবাবু বললেন 'পেটের দায়ে ও-সব লিখতে হয়।' গিরিশবাবুর কথা শুনে তিনি আরো কিছুক্ষণ থিয়েটার দেখলেন।

"থিয়েটরে আর একটা ব্যেপার শুনেছি। সেদিন থিয়েটর হবার পর গিরিশবাবু ওনাকে সাজঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানকার যত সব মেয়েছেলে ছিলো সবাইকে গিরিশবাবু বললেন 'ওরে বাবাকে পেন্নাম কর, তোমাদের সব পাপ ধুয়ে যাবে।' মেয়েরা সব ওনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায় দেখে উনি বলেছিলেন, 'ওখান থেকে করলেও হবে গো।' তারা কি সব শোনে? কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়েছিলো।"

২. ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কথাতে শ্রীরামকৃষ্ণের বীণা থিয়েটারে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক দেখার উল্লেখ পাওয়া যায় :

"ঠাকুর যখন দাদুর [ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের] কাছে আমাদের বাড়িতে (এখন ১৯ নং কেশব সেন স্ট্রীট) পদধূলি দিতেন তখন আমার বয়স সাত-আট। তাঁকে দেখা দু'বার স্পষ্ট মনে পড়ে।"—

"রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার তখন আমাদের বাড়ির সামনে, রুজু রুজু দক্ষিণে। সেখানে বেটাছেলেরা মেয়েদের পার্ট প্লে করত। ঠাকুর আমাদের দোতলার হলঘরে

বসে 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় দেখছেন। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁকে আহ্বান করে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন।" (স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ—১১৫-১৬।)

৩. অমৃতলাল বসুর "শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা" থেকে কিছু কিছু অংশ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করেছি। এই কাহিনী-কাব্যটির রচনার পটভূমিকা অমৃতলাল কাব্য-মধ্যে বর্ণনা করেছেন। অমৃতলালের ব্যক্তিজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব নির্ণয়ের পক্ষে সেই অংশটি উল্লেখযোগ্য :

"আলস্য পরশ রাত্রে শয্যায় শোয়ার গাত্রে
মন কিন্তু মন দিল ভাবনা পূজায়।
নিদ্রা-ও সাধনা চায় মরাতে ধরাতে পায়
মরণে আরাম আছে প্রত্যহ বুঝায়॥
উঠে বসি বিছানায় স্বপ্নপুষ্প রচনায়
ক্রমে ক্রমে হল গত ত্রিযামা রজনী।
চিনিতে পারিনি আগে নিশীথ চিন্তার যাগে
শ্রীকান্ত মূর্তিতে জাগে চিন্তাচূড়ামণি॥
এদিক ওদিক ঘুরে কামারপুকুর পুরে
কি জানি কিসের ঘ্রাণে প্রাণ গেল লোভে।
কুটীর খড়ের চালা বাটীর সে ঢেঁকিশালা
আঁধারে হেরিল আলো শিশু শশী শোভে॥
আদেশ শুনিল কান রসনায় এল গান
জন্মতিথি ব্রতকথা সূচনার সুরে।
নাহি ছিল নিদ্রাবেশ জাগ্রত এ প্রত্যাদেশ
এমনি সহজ সেই জগতের গুরুরে॥

রসরাজ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছে বলরাম বসুর প্রতিবেশী, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য শৈলেন বসুর একটি বিবৃতি :

"বাগবাজারের নন্দবোসের বাটীতে প্রতীচী প্রত্যাগত স্বামীজীর অভ্যর্থনা।
"রসরাজ অমৃতলাল বসু গলে মাল্যদান করলেন। স্মিতমুখে স্বামীজী বললেন—'এই যে দাদা।' অমৃতলাল উত্তরে বললেন—'আমি ভেবেছি, তুমি বুঝি আমাদের ভুলে গেছো।' স্বামীজী—'সে কি ?"

৪. শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গিরিশের বিশ্বাস এবং তাঁর আচার-আচরণ কেমন ছিল সেই সম্পর্কে বলেছেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত :

"জনার' বিদূষকই গিরিশচরিত্র স্বয়ং। হরিকে গালাগালিও দেন, আবার একবার ডাকিলে মুক্তিলাভ হয় সে বিশ্বাসও আছে। কয়েক বৎসর পরে [১৮৯৩ সালের] গিরিশ একদিন মাকে [সারদাদেবীকে] 'জনা' অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। গিরিশ নিজে হইতেন বিদূষক। বিদূষক দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা হাসছেন যে, কেমন দেখছেন ?' মা উত্তর করিলেন, 'যা দেখছি, তাতো ওরই চরিত্র। আমি তো জানি, ওর ঐরকমই বিশ্বাস—ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। আবার বকেও।' বস্তুত বিদূষকের যেমন প্রচ্ছন্ন অটল বিশ্বাস এবং মুখে হরিকে কটূক্তি, গিরিশেরও ছিল তাই। তিনি বলিতেন, 'ঠাকুর দয়াময়, সব পারেন। ইচ্ছা ক'রে কচ্ছেন না।' বলেই গালাগালি দিতেন। বিদূষক এবং ভীম (পাণ্ডব কৌরবের) চরিত্রে পাঠকের ধারণা হইবে যে কিরূপ কটূক্তি গিরিশঠাকুরের উপর বর্ষণ করিতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর গিরিশচন্দ্র যখন ব-কলমা দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন তখন তিনি স্তুতি-নিন্দা ন্যায়-অন্যায় সব কিছুতেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রেরণাদাতা এবং নিজেকে উপলক্ষ্য বলে মনে করতেন। সুসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই সম্পর্কে কিছু কাহিনী পরিবেশন করেছেন। গজেনবাবু বললেন :

"তাঁর [গিরিশচন্দ্রের] সম্পর্কে সবই আমার শোনা কথা। কিছু অবিনাশবাবুর মুখে [গিরিশ জীবনীকার ও আজীবন সহচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়], কিছু বিনোদিনী বা তারাসুন্দরীর মুখে, কিছু অমৃতলালের মুখে। ব-কলমা দেওয়া প্রসঙ্গে আমি শুনেছি যে উনি যখন গোপাললাল শীলের সঙ্গে বিশ হাজার টাকা বোনাসের বিনিময়ে চুক্তি করলেন যে আর কোথাও নাটক লিখে দেবেন না তখন স্টার থিয়েটারের বন্ধুরা—অমৃত মিত্র, অমৃতলাল বসু ইত্যাদিরা ওঁকে ধরলেন নাটকের জন্যে। উনি ছাড়া নাটক আর কে লিখে দেবেন ? স্টার থিয়েটার তাহলে চলবে কেমন করে ? বন্ধুদের অনুরোধে উনি লিখে দিলেন 'নসীরাম' [নাট্যকার 'সেবক' বলে উল্লেখ করে]। তিনি [গিরিশ] যখন ওঁদের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাবেন বলে গেছেন, তখন শুনেছি, রামকৃষ্ণের ছবির সামনে গিয়ে বলেছেন 'আমি কিছু জানি না—যা করাচ্ছো, তুমিই করাচ্ছো।' কারণ এতে যে গোপাললাল শীলের কাছে সত্যভঙ্গ হচ্ছে, সেটা তিনি বুঝেছেন।

"আবার এটাও একাধিক লোকের মুখে শুনেছি যে 'সিরাজদ্দৌলা' যেদিন প্রথম

অভিনীত হয়, সেদিন বহু মুসলমান দর্শকআসনে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন তাদের অভিপ্রায় ছিল, সিরাজদ্দৌলা চরিত্রকে কোনোভাবে খর্ব করা হলে তারা উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। একরকম মারমুখো হয়েই সেদিন তারা উপস্থিত হয়েছিল। থিয়েটার আরম্ভ হল—গিরিশবাবু করিম-চাচা, দানীবাবু সিরাজ। যখন তিন অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে তখন সব শ্রোতারা (বিশেষ করে মুসলমান শ্রোতারা) ফুলমালা নিয়ে গিরিশ-বাবুকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। তখনও তিনি সেই রামকৃষ্ণেরই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'আমি কিছু করিনি—যা করাচ্ছো, তুমিই করাচ্ছো।'

(জবানবন্দী ১৯।১।৭৮)

৫. প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, পরে সারদা দেবী গিরিশচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রতিহত করেছিলেন—অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও তাঁকে কয়েকবার নিরস্ত করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও গিরিশের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রশমিত করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত :

"এই সময় গিরিশবাবুর সাধনের ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি থিয়েটার ও সংসার একেবারে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে মনস্থ করিলেন। কেহ নিষেধ করিলে মানিতেন না। অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে এসব বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে জানাইয়া তাঁহার মত লওয়া আবশ্যক। নরেন্দ্রনাথ তখন রাজপুতনায় ছিলেন। গিরিশবাবু তখন আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া গিরিশবাবুকে চিঠির উত্তর লিখিলেন যে তাঁহার সন্ন্যাস লইবার কোনো আবশ্যক হইবে না। তিনি সংসারে থাকিয়া তাঁহার কর্ম ও বহু কল্যাণকর কার্য করিতে পারিবেন। গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথের পত্রখানি পাইয়া প্রাণে শান্তি পাইলেন ও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।"

(ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ—৭০)

৬. গিরিশের 'বুদ্ধদেবচরিতে'র একটি গান স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে অভিভূত করেছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত :

"গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেবচরিত' হইতে

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ॥…

"নরেন্দ্র যখন এই গানটি গভীর রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জীর স্ট্রীটস্থ বাড়ীর দালানে আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন তখন তাঁহার মুখ হইতে গানটি এমন শ্রুতিমধুর হইত যে বাড়ীর আশে পাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেন। সুর, তাল, রাগের কথা নহে কিন্তু ভিতরের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্ত ভাবে গানটি গাহিতেন। যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন তাঁহাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না—সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন।…

"নরেন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধদেব চরিতের গান গাহিতেন সেই কয় মাস তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মন হইয়াছিল। তাঁহার বাহ্যিক জ্ঞান অনেক সময় থাকিত না। নিজে যেন শরীরটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনো এক জগতে বসিয়া আছেন।…সদা সর্বদাই প্রায় বিভোর অবস্থায় থাকিতেন।" (ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ—৭৯-৮১)

৫. স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিষ্যাদের কাছে ..রিশের রচনা প্রায়ই মুখে মুখে অনুবাদ করে শোনাতেন। নবেদতার রচনা থেকে এমনি একটি ঘটনার বর্ণনা :

"From one Bengali poet, it was easy to fall to talking of another and he [Swamiji] translated for us bits of the works of G. C. Ghose. Only fragments come back to his hearers now :

The flower says, rocking to and fro,
'Place me on the neck of your beloved:'
"The bee in sorrow is weeping
He could not find his sweet-heart, the flower.
In humming, humming notes he utters the Misery of his heart,
Because he found the lake emptied of its water,
There was no lotus there !"

Or more literally—

"The sorrowful bee is weeping.

His troubled mind drives him to the lake.
And there he pours out the grief of his heart.
In humming, humming notes
For the lake is empty."

"Our friend Girish is really a genius !' said the Master. And from this, and the Bhakt of Sri Ramkrishna, he went on to talk of Chaitanya of Bengal and his friend Nityananda—and to quote a whole dialogue from a play by Mr. Ghose—

Villagers : Who is this beggar ?
Ans. : I am a beggar of love.
Villagers : Who is distributiug love in this city of Nuddea ?
Ans. : I have heard the news in the heart of my heart
And that is why I am come.
I am floating down from country to country.
But here I have stuck fast in Love···
Strike more, Brother, but say Hari !
Villagers : (To each other)
O Madhai, who
raises this war of Hari
On the banks of the Ganges ?
Is it that Nitai, the Distributor
of love, has come ?
Madhai say 'Hari',
We have no refuge save in
these two brothers.
(Complete works of Nivedita, vol I—369-70)

স্বামী বিবেকানন্দের মতো তাঁর গুরু ভ্রাতারাও বিদেশী শিষ্যাদের গিরিশচন্দ্রের নাটকের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে চেয়েছেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে নিয়ে গেছেন স্টার থিয়েটারে 'জনা' নাটক দেখাতে। শ্রীমতী ম্যাকলাউড তাঁর ভাগিনেয়ী—Lady Sandwich-কে পত্রে (১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৫) জানাচ্ছেন :

"Last evening Swami Saradananda took me to see Girish Ghose's

splendid play 'Jana', which only ended at 12.45, but as we sat or half lay in Indian fashion in a box, I found it so easy !"

নিবেদিতার পত্রে (শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯) গিরিশ সংবাদ :

"Girish Babu has been ill and looks gaunt and pulled down. But still, there he is—one of those who 'live to tell' the great things they have seen " **[Letters of Sister Nivedita]**

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ নিবেদিতা শ্রী ও শ্রীমতী র‍্যাটক্লিফের কাছে লেখা একটি পত্রে গিরিশের অসুস্থতার সংবাদ দিয়েছেন—যখন নিবেদিতার চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু তখন নিবেদিতা গভীর বিষাদে যেন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন :

"Girish Babu is very ill and may die ! Everyone dies !" [Ibid]

৮. গিরিশচন্দ্রের নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। সেই সম্পর্কে কিরণচন্দ্র দত্ত লিখেছেন :

"দেশ-বিদেশে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কিরূপ সমাদর হইয়াছে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত বিবরণী হইতে তাহার কিছুটা ধারণা করা যায় :

"১। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের দেবনাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছে।

"২। গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' নাটক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।...

"৩। গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাকি বহুদিন পূর্বে মিণ্টের ভূতপূর্ব দেওয়ান রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং পরলোকগতা ভগিনী নিবেদিতা তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

[গ্রন্থমধ্যে Lucifer পত্রিকার যে বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছি তাতে অনুবাদক হিসাবে 'a distinguished educationist বলা হয়েছে। সন্দেহ নেই, সেই শিক্ষাবিদ্ বৈকুণ্ঠনাথ বসু।]

"৪। গিরিশচন্দ্রের চিত্তচমকপ্রদ নাটক 'বিপদ' নাটক 'দুখিয়া' নামে হিন্দীতে অনূদিত হইয়া এলাহাবাদে অভিনীত হইয়াছে।...'পূর্ণচন্দ্র' নাটকেরও হিন্দী অনুবাদ হইয়াছিল।

"৫। গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পূর্বে গোবিন্দপ্রসাদ নামে জনৈক বিহারবাসী 'শঙ্করাচার্য' নাটকের অনুবাদের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"৬। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত হরিনাথ দে

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের ইংরেজী অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবলমাত্র কয়েকটি কবিতা ও গান তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।"

(গিরিশচন্দ্র : কিরণচন্দ্র দত্ত—১০৯)

৯. গিরিশ-প্রতিভার প্রতি নিবেদিতার অনুরাগ সংক্রান্ত একটি সংবাদ :

"বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার নীলরতন সরকার সি. আই. ই. এবং সিস্টার নিবেদিতা একসঙ্গে দার্জিলিং রেডাইতে যান। গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস, ভক্তি এবং নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতা ইঁহাদের সহিত প্রায়ই নানারূপ কথাবার্তা কহিতেন। নিদারুণ রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি পীড়িত গিরিশচন্দ্র কেমন আছেন জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন। স্যার জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং সিস্টার গিরিশচন্দ্রকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসিতেন, মুগ্ধচিত্তে তাহা বর্ণনা করেন।"

(গিরিশচন্দ্র : অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়—৪০৪)

['তপোবল' নাটক নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন 'শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমার স্মরণ করিয়াছিলে'—জগদীশচন্দ্রই সে-কাহিনী গিরিশকে জানিয়েছিলেন।]

১০. অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের জীবনের শেষ দিন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে রেখাচিত্র এঁকেছেন, তারই কিছু অংশ :

"[গিরিশচন্দ্র] অপরাহ্নকাল হইতে প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিলেন, এই সময় কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারই দু-এক কথায় উত্তর দিতেন মাত্র।··· ক্রমে আচ্ছন্নাবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কখনও 'চলো', কখনও 'নেশা কাটিয়ে দাও', কখনও 'রামকৃষ্ণ' এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

"রাত্রি ৮টার পর ফরিদপুর হইতে দানিবাবু আসিয়া পঁহুছিলেন। দানিবাবু আসিয়া যখন কাতরকণ্ঠে 'বাপি—বাপি' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন পুত্রবৎসল পিতা কম্পিত হস্ত পুত্রশিরে অর্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও জল চাহিলেন।

"সেদিন অপরাহ্ণ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্কট-অবস্থার সংবাদ সকাল

হইতেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১১টায় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্তবাবু অমৃতলাল বসু প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার ইষ্টদেবের নামগান আরম্ভ করিলেন। 'রামকৃষ্ণ হরিবোল' ধ্বনিতে পল্লী পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের (বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ সাল) সময় গিরিশচন্দ্রের অন্তিমশ্বাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে বিলীন হইল।...

"পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ভক্তগণ ও বহুবিধ জনসমাগমে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। মহাকবিকে একবার শেষ দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলের এরূপ আগ্রহ, যে, জনতার সুশৃঙ্খলতাসাধন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। নাট্যসম্রাটকে কিরূপে সাজাইয়া কিরূপ সমারোহে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে গিরিশচন্দ্রের সহোদর অতুলবাবুরই বিভ্রম ঘটিতে লাগিল—গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের না সাধারণের।

"বিচিত্র খট্টায় বিচিত্র পুষ্পলতায় সজ্জিত করিয়া ললাটে 'রামকৃষ্ণ' নাম লিখিয়া দিয়া নাট্যসম্রাটকে বাহিরে আনয়ন করা হইল।...

দেখিতে দেখিতে কাশী মিত্রের শ্মশানঘাটে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশে ৺রাধাকান্ত দেবের মুমূর্ষু-নিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট পর্যন্ত মনুষ্য ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ বসু, 'অমৃতবাজার'—সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, 'সাহিত্যপরিষদ-পত্রিকা' সম্পাদক সুবিখ্যাত অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, দেশপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধুবাবুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. জি. কর, খ্যাতনামা নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তাফী, এতদ্ভিন্ন স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, মহেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় প্রভৃতি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ ইত্যাদি প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"গিরিশচন্দ্রকে চিতা-শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় সহস্রকণ্ঠে 'রামকৃষ্ণ হরিবোল' নাম গীত হইতে লাগিল।...

"দেখিতে-দেখিতে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, ধূনা, কর্পূরে ব্রহ্মণ্যদেব শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া নিমিষ মধ্যে লক্ষ-লক্ষ নাট্যামোদীর প্রিয়দর্শন, বীণাপানি বাগ্‌দেবীর বরপুত্র শ্রীশ্রীরাম-

কৃষ্ণ-শ্রীচরণ-রজঃপূত সেই বিশাল বপু ভস্মে পরিণত হইল। আর এ বিপুল সংসার খুঁজিয়া সে উজ্জ্বল প্রতিভা-মুকুট-মণ্ডিত দেহের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কেবলমাত্র কয়েকটি ভক্ত এবং বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীগণ নববস্ত্র পরিধানে নব তাম্রকুণ্ডে ভস্মাবশিষ্ট চিতা হইতে যত্নসহ অস্থি সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সব শেষ হইল।"

[গিরিশচন্দ্র—৪০৮-১০]

১১. স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের যোগাযোগ সংক্রান্ত একটি সংবাদ :

"পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শ্রীশ্রীমহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] নিকট আসিতেন প্রণাম জানাইতে ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে।

"একদিন ভুবনেশ্বর মঠে প্রণামান্তে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—'মহারাজ, ঠাকুরকে দেখার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস, তা আর হোল না। তখন পড়া-শুনো করি তাঁকে দর্শন করার ইচ্ছা হওয়ায় দক্ষিণেশ্বর যাব বলে বেরিয়ে পড়ি। আলমবাজার পর্যন্ত গেছলুম, তখন মনে হতে লাগলো, তিনি তো মনের কথা সবই জানতে পারেন আবার বলেও দেন। যদি মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেন! তখন মনের মধ্যে নানাভাব চলতো, সেই ভয়ে আলমবাজার থেকে ফিরে গেলুম, তাঁর দর্শন হোল না। আমি বড় হতভাগা, আর দু'পা গেলেই তাঁর দর্শন লাভ হোতো।' মহারাজ বলিলেন, 'আপনি তাঁকে দর্শন করতে আলমবাজার পর্যন্ত গেলেন তো, তাতেই আপনার দর্শন হয়েছে।' ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিলেন, 'না মহারাজ, আমার দর্শন হয় নি, আমি বড় হতভাগা।' তখন ক্ষীরোদবাবু নতমস্তকে অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন। মহারাজ বলিতেছেন, 'ক্ষীরোদবাবু, আমি বলছি আপনার দর্শন হয়েছে।' ক্ষীরোদবাবু বলেন, 'মহারাজের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র মহারাজের দিকে চাহিয়া দেখি, ঠাকুর বসিয়া আছেন।"

[শ্রীব্রহ্ম গোপাল দত্ত মহাশয় জানালেন, কাহিনীটি তিনি শুনেছিলেন স্বামী বরদানন্দের কাছে। স্বামী বরদানন্দকে বলেছিলেন স্বয়ং ক্ষীরোদপ্রসাদ।]

১২. শ্রীমতী তারাসুন্দরী রচিত দুটি কবিতার কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করেছি—একটি কবিতা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশও উদ্ধৃত করেছি। 'সৌরভ' পত্রিকায় বিনোদিনী

ও তারাসুন্দরীর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বিনোদিনীর কবিতাগুলি পরে 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা'য় সঙ্কলিত হয়েছে কিন্তু তারাসুন্দরীর কবিতা এখনো অনাদৃত—সম্ভবত অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত হয় নি। 'সৌরভ' পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য—একমাত্র হরীন্দ্রনাথ দত্তের সংগ্রহেই প্রকাশিত তিনটি খণ্ড এখনও আছে—অন্যত্র আর কোথাও সন্ধান পাই নি। তাই তারাসুন্দরীর সম্পূর্ণ দুটি কবিতাই কৌতূহলী পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি :

প্রবাহের রূপান্তর

শ্মশান জীবন মম নন্দনকানন সম,
পাপস্মৃতি দূরে গেছে, ফুটেছে নয়ন।
জীবনের গুরুভার, কাতর করে না আর
কে আমার ঘুচাইল ভ্রম আচ্ছাদন ?
ক্ষুদ্রমতি নারীপ্রাণ, অর্থ আশা অভিমান,
কালের কুটিল স্রোতে হয়ে দিশেহারা।
অন্ধকার আলিঙ্গন, করিয়াছি আজীবন
প্রলোভনে সঁপি মন, হইয়াছি সারা॥
সরল আশ্রয় করে, প্রাণের আবেগভরে,
ধরিতে গিয়েছি যারে, সে নয় আমার।
হাসি মুখে ঠেলে পায়, অন্ধ মন তারে চায়
পরিণামে ওঠে শুধু শ্রান্ত হাহাকার॥
সহোদর সহোদরা, প্রাণের সঙ্গিনী যারা
স্বার্থের ছলনে ভুলি, করে আত্মবলি।
ভালবাসি যদি কারে, নানা কথা কয় তারে
কাতর হৃদয়ভারে, দিবানিশি জ্বলি॥
একথা বুঝিবে কে-রে ? দুহিতায় ছুরি মেরে
মাতা করে অন্বেষণ, সুখ আপনার।
ছাই এ হৃদয়পুর, যাক ভেঙ্গে, হ'ক চুর
আকিঞ্চন স্বার্থসিদ্ধি, মূল মন্ত্র তার॥
পরমায়ু যত ক্ষয়, সুখ আশা তত হয়
বার্দ্ধক্যের সনে বাড়ে, লালসাজীবনে।

পরকাল চিন্তা হায় ! অসার স্বপন প্রায়,
ছুটে যায় একেবারে, ছায়া সেই সনে ॥
ভবিষ্যৎ বিভীষিকা, প্রেতময়ী মরীচিকা,
প্রতিকৃতি যদি তার, মিলেছে আমার ।
যৌবনে প্রবৃত্তি যত, সৌরভে কররে বত,
পবিমল পবিত্রতা, কব অনুসার ॥

(সৌবভ, শ্রাবণ ১৩০২, প্রথম খণ্ড)

কুসুম ও ভ্রমর

(১)

মিলায়ে কুসুম কায়, প্রকৃতির কোলে
ছানিত মাধুরী হবি, ধবায় কি ভাব ধবি,
অনিল চুমিযা ফুল, মৃদু মৃদু দোলে
কাঁটায় ভবেছ গায়, তবু মন ভোলে ।

(২)

প্রেম আশে, সাথে যায় প্রেমিক ভ্রমব ।
অনাদর নাহি কাবে, সমাদর যারে তাবে
মধু খায়, সুখে বসে—বুকের উপব ।
বোঝা দায, কে তোমাব আপনাব পর ।

(৩)

নারীর যৌবন সম গরব তোমাব ।
যতদিন মধু রবে, আদবেব ধন হবে,
অবহেলে বিলাইলে, মান আপনার ।
না বুঝিলে ছলনা এ কুটিল ধবার ।

(৪)

সুবাস ধরেছ বুকে, কি হেতু ছডাও ?
গুণের গরিমা নাই, অযতনে বুঝি তাই,
সাধের সৌরভ হায় ! অবাধে লুটাও ।
বিকৃতি প্রকৃতি লয়ে কিবা সুখ পাও ?

(৫)

বিচিত্র চরিত্রে মুগ্ধ, অন্তর আমার !
খেলিলে পবন সনে, সুমধুর আবাহনে,
পরাগ ছড়ায়ে মোরে ডেক' নাক আর !
অনুমাত্র পড়ে আছি—ধরে এ সংসার !

(সৌরভ, ভাদ্র ১৩০২—দ্বিতীয় খণ্ড)

একালের থিয়েটারে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের সংবাদ :

"গত শনিবার সন্ধ্যায় 'বিশ্বরূপা' প্রেক্ষালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৩-তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী পুণ্যানন্দ, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

"মঞ্চে খ্যাতনামা শিল্পী অন্নদামুন্সী অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুটি বিরাট তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। শঙ্খধ্বনি, ধূপধুনা ও পুষ্পসম্ভারে রঙ্গমঞ্চে বেশ একটি সুন্দর মন্দিরসুলভ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন এমন দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ৺উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপর ভক্তটি ৺কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের বিধবা পত্নী। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বয়স ১০২, শ্রীযুক্তা পালের ৯৫। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যবহৃত দুটি অমূল্যবস্তু সভায় প্রদর্শিত হয়।

"ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ প্রশস্তি গান দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়। 'বিশ্বরূপা'র পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের চরণস্পর্শে একদা বাঙ্গালার রঙ্গালয় ধন্য হয়েছিল। তাঁর আশীর্বাদ থেকে শিল্পীরা যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, বাঙ্গলাদেশে নাট্যকলার ক্রমবিকাশে তা বিশেষভাবে সহায়ক হয়। শ্রীসরকার বলেন, পরমহংসদেবকে নতুন করে স্মরণ করার জন্য, রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁর দাক্ষিণ্যের কথা সকলকে বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

"ঠাকুর সম্পর্কে ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বলেন। তারপর সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এই বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচনা করেন। পরমহংসদেব ও গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব সম্পর্কের কথা ছোট ছোট দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিবৃত করে শ্রীসেনগুপ্ত বলেন যে, একদা গিরিশচন্দ্রের মনে মঞ্চ সম্বন্ধে বীতরাগ উপস্থিত হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব বুঝেছিলেন,

লোকশিক্ষার জন্য রঙ্গমঞ্চের আয়োজন আছে। তাই তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তকে রঙ্গালয় ছেড়ে আসতে নিষেধ করেন। রঙ্গমঞ্চকে লোকশিক্ষার মাধ্যম করার এই নির্দেশ যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একথা গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেন এবং বলা বাহুল্য তা তিনি নিষ্ঠার সহিত মেনেছিলেন।

"শ্রীসেনগুপ্তের ভাষণের পর প্রধান অতিথি অহীন্দ্র চৌধুরী ও সভাপতি স্বামী পুণ্যানন্দ বক্তৃতা করেন। সবশেষে ঠাকুরের প্রসাদী জিলাপী সভার সকলকে বিতরণ করা হয়।"

('দেশ' ১৭ ফাল্গুন ১৩৬৪, ১ মার্চ ১৯৫৮)

নির্দেশিকা

[এই নির্দেশিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। ব্যক্তিনাম হিসাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ', 'গিরিশচন্দ্র' ও 'শ্রী-ম' (মহেন্দ্র গুপ্ত) এবং গ্রন্থ-নাম 'কথামৃত' প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আছে বলে 'নির্দেশিকা'-তে বাদ দেওয়া হয়েছে : তা' ছাড়া 'পরিশিষ্ট' ও 'তথ্যপঞ্জী' অংশও নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। গ্রন্থ-নাম, প্রবন্ধ-নাম নাটক-পালা-চিত্র-নাম ও পত্রিকা-নাম উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে।]

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী ৯, ৫৩, ৫৬
'অভিনেত্রীর রূপ' ১৭৬-৭৮
'অভিমন্যু বধ' ২৫, ২৬, ২৬০
অভেদানন্দ, স্বামী ৩৯, ৮৯, ৯৩-৯৪, ২০৮
অমর মল্লিক প্রোডাকসন্স ২০০
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৩৭
অমৃতানন্দ, স্বামী ২১০
অম্বাপালি ৬৫, ৬৬
অম্বিকানন্দ, স্বামী ১০২
'অযোধ্যার বেগম' ২০৯
অরবিন্দ আশ্রম (পণ্ডিচেরী) ৭৬
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ২০১
'অশোক' ১৩৪, ২২৪

'আগমনী' ২৪
আচার্য, নির্মাল্য ৭৬, ২০৭
'আত্মাহুতি' ২৩৩
'আদর্শ বন্ধু' ১৫১-৫২
'আনন্দ রহো' ২৫
'আনন্দলোক' ২৪২
'আবু হোসেন' ৩০
'আমার কথা' ৭৬, ১৯৬, ২০৫, ২০৭
আলমবাজার মঠ ২২০

'ইটারন্যাল এনার্জি' ১৬৪
'ইণ্ডিয়ান মিরর' ৩৭
ইবসেন, হেনরিক ৯৫
ইব্রাহিম, নীলিমা ২৫৮-৫৯, ২৬০
ইলিসিয়াম থিয়েটার ২১৯
ইশারউড ক্রিস্টোফার ৭৯
ইসলাম, নজরুল ২৩৮-৩৯

'উদ্বোধন' ৮৯, ৯৫, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ২২১, ২২২
উদ্যানবাটি (কাশীপুর) ৫৬, ১১২
'উলুপী' ১৫৮

'একঘরে' ১৫৯
'এমন ধর্ম নাই' ১৫৯-৬০, ১৬৪-৬৫
এ. ভি. স্কুল ১৪৮
এমকেজি প্রোডাকসন্স ১৯২, ২০০
এম. জি. এণ্টারপ্রাইজ ১৮৮

এম. পি. প্রোডাকসন্স ২০০
এমারেল্ড থিয়েটার ১০০
এলবার্ট হল ৭০

'ওথেলো' ২০৯
ওয়ার্লাক থিয়েটার ৯৪
ওঁমা স্বপন অপেরা ১৯৭

'কঙ্কাবতীর ঘাট' ২৩৩
কর্নওয়ালিশ থিয়েটার ২২৭
'কর্ণার্জুন ১০, ২২০, ২২১
কথক, শ্রীধর ২৯
'কথা কও' ২০১
'কপালকুণ্ডলা' (নাট্যরূপ) ২৪
'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' ২৪১
'কমলে কামিনী' ২৬০
'কর্মফল' ১৮০
'কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ' ১৪৪
'করমেতি বাই' ১২৪
'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর' ১৯৫, ১৯৭
কানন দেবী ২৪২
কাঞ্জিলাল, ডাঃ ২১৯
কাণ্ট ২৪৭
কামারপুকুর ২, ৪, ৫
'কারাগার' ২৩০, ২৩১
'কালাপাহাড়' ১১৪, ১১৮-১৯, ১২৪ ১৩৪, ১৫৬, ১৮৩, ২৬০
কালিকা থিয়েটার ১৮৮
কালিদাস প্রোডাকসন্স ২০০
কীর্তনীয়া, নরোত্তম ১২
কীর্তনীয়া, বৈষ্ণবচরণ ১২

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ২৪
কৃষ্ণভামিনী (শ্রীমতী) ২৪৪
কোহিনুর থিয়েটার ৭৭
ক্লাসিক থিয়েটার ২৭, ৮১, ১৩৫, ১৭৫

খান্না, প্রতিভা দেবী ২০৭, ২১১-১২, ২২২
'খাস দখল' ১৪৮
খাঁ, আফতাবুদ্দিন ২১৭
খাঁ, আলাউদ্দিন ২১৭-১৮, ২১৯
খাঁ, আলি আকবর ২১৮
খাঁ, কমলকৃষ্ণ ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২৪৩
খাঁ, জমিরুদ্দিন ২১৭
খ্রীস্ট (ইশা, যীশু) ৬০, ৬৫, ৬৬
গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ ৪৯, ৫১, ৫৪, ৭৭, ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৪, ১৮৮
„ কৃষ্ণকুমার (নাটুবাবু) ৩৯, ২২৪, ২২৫
„ জহর ২৪৪
„ হীরেন্দ্রনাথ (হীরুবাবু) ২১৭-১৮
„ শেখর ১৯৬, ১৯৭
'গদাধর' ১৮৮
গম্ভীরানন্দ, স্বামী ৩, ৪৮, ৯০
গয়াবিষ্ণু ১
'গিরিশচন্দ্র' ৪৯, ৫৪, ১০৯, ১১২
'গিরিশচন্দ্র-মন ও শিল্প' ১০৮-৯
'গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ২২, ৩৪, ৩৫
গুপ্ত, দেবনারায়ণ ১৯৩
„ পরমানন্দ ৭০
„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ ২১৯
„ মহেন্দ্র ১২৩, ২৩০, ২৪৪

গুপ্ত, সমীরণ ২৪১
গুপ্তা, অনুভা ২০১
গুপ্তা, শান্তি ২৪১-৪২
গুরুমহারাজ' ৭৯
গুহ, প্রবোধচন্দ্র ৩৩
'গৈরিক পতাকা' ২২৭, ২২৮
গোষ্ঠবিহারী ৩৩
গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী) ৩৩
গোবিন্দ অধিকারী ১০, ১৫
গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ১৫, ৬৩, ১৬৪
গোস্বামী মনোমোহন ৭৯, ১৭৯-৮৪, ১৮৫
গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার ২৪, ২৬
গ্র্যাণ্ড থিয়েটার ১৮০
গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ৯৯

ঘোষ অজিতকুমার ১১০
„ অতুল ২৫, ১৩৩
„ কালীপদ ১৬, ৯৯, ২০৬
„ কালীপ্রসাদ ২০০, ২০১
„ দুর্গাপদ ১৯৯, ২১৯
„ চিত্তরঞ্জন ১৯৪, ১৯৬
„ নীলকমল ৩৫
„ প্রমোদিনী ৩৫-৩৬
„ বসন্তকুমার ৭৫-৭৬
„ শিশিরকুমার ৩৭
„ সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) ৪৯, ৯৩, ৯৪, ১০৩, ১৩০, ১৩১, ১৮৭, ১৮৮ ২০৯, ২২০, ২২২-২২৫, ২৩২
ঘোষাল প্রভাত ২০০
ঘোষাল বিভূতি ভূষণ ১৬৮

চক্রবর্তী, নীলমাধব ৮০, ২২৩
„ প্রফুল্ল ২০০, ২৩৫
চট্টোপাধ্যায়, অজিতপ্রকাশ ২০০
„ অনিল ২৫৪
„ জলধর ২৩৩
„ তরুণকুমার ৭৭
„ দীপেন ১৯৭
„ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ২০০
„ বঙ্কিমচন্দ্র ৭০, ১২৩-২৪
„ ভবনাথ ৪৩
„ মুরলীধর ২০০
„ রামলাল ১২, ১১২
„ রামানন্দ ৩২
„ ললিতমোহন ১০, ৮০, ৮১, ১০১
„ সতীকুমার ৯
„ সাবিত্রী (শ্রীমতী) ৭৬, ২৪৩
„ সৌমিত্র ৭৬, ২০৭, ২৩৭, ২৫৬
চন্দ্রমণি ৫
চন্দ্রলোক অপেরা ১৯৫, ১৯৬, ২৪৩
'চন্দ্রশেখর' ২০৮, ২০৯, ২২৭
চণ্ডীদাস ২২
চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ২০০
'চলতে চলতে' ১৯২
চারুশীলা (শ্রীমতী) ২৪৪
চিকাগো ধর্মসভা ১৪৩
চেতনানন্দ, স্বামী ৯
'চৈতন্যলীলা' ৮, ১৩, ১৬, ৩৮, ৪১, ৪৯, ৬০, ৬৩, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৮০, ৯৩, ৯৪, ১০০, ১৬৭, ১০৪, ২০৭, ২৫৪, ২৬০

চৌধুরী, অহীন্দ্র ৩৩, ২২৪, ২৫৪
চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ ১৭৯
চৌধুরী, রাম ১৮৮-১৯১, ২০০
চৌরঙ্গী অপেরা ১৯৭
'ছত্রপতি শিবাজী' ৪৭

জগদীশ্বরানন্দ' স্বামী ১৩৫
জনতা অপেরা ১৯৭
'জনা' ৪৭, ৯১, ১২৪, ২০৯, ২১৯, ২৬০

জহুরী প্রতাপচাঁদ ২৫
জয়রামবাটি ২৪৩
জেনারেল য়্যাসেমব্লিজ ইনসটিটিউশন ১৪৮, ১৫৪

জ্ঞানাত্মানন্দ' স্বামী ৯৩, ৯৪, ১০৩, ১৪৮, ২৩৪

'ঝড়ের রাতে' ২২৮

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ২৬
„ দেবেন্দ্রনাথ ৩৪
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ২৬
„ রবীন্দ্রনাথ ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৪, ২২০, ২৬৩
তর্কচূড়ামণি শশধর ১২০,
'তপোবল' ১২৯-৩০
তলাপাত্র, তৃষিতকুমার ৭৩,
'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা ৩৪
„ পাঠশালা ৩৪
'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকা ৬৭-৬৯, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১৪২, ১৪৩, ১৮৪, ২৪৪,
তরুণ অপেরা ১৯৭
তারাসুন্দরী ৭৩, ৭৭, ৮৯-৯০, ১০১-২ ১০৩, ১০৪, ২০৭, ২০৮-১৩, ২২৩, ২৩৭, ২৬২
তিনকড়ি ২০, ৭৩, ৯০, ২০৯, ২১০, ২২৩, ২৬২
তীর্থভারতী ২০১
'থিয়েটার' পত্রিকা ১৭৮
দত্ত অমরেন্দ্রনাথ ২০, ২৭, ৭৫, ৭৯, ৮০ ৮১, ১৭৫-৭৯, ১৮০, ১৮৪, ২২০, ২২৩
„ অমৃতলাল (হাবু) ৮০, ২১৪-১৫, ২১৭
„ অশ্বিনীকুমার ৬৩
„ অক্ষয়কুমার ৩৪
„ দ্বারকানাথ ১৭৫
„ মহেন্দ্রনাথ ৯, ৯৩, ১০৮
„ যতীন্দ্রকৃষ্ণ ২১৯
„ রমাপতি—দত্ত, হরীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য
„ রামচন্দ্র ১২, ৪২, ৫০, ৫৩, ৬৪, ৬৭, ৮০, ৯৫-১০০, ১১৫
„ হরিদাস ৮০
„ হরীন্দ্রনাথ ১৭৮, ১৮০, ২২৩
„ সত্যেন্দ্রনাথ ২১০
„ সুরেন্দ্রনাথ ২১৫
„ সূর্য ১৯৫
'দক্ষযজ্ঞ' ২০৪, ২৬০
দক্ষিণেশ্বর ৭, ১২, ১১২, ১১৩, ১৬২, ২১৭, ২১৮-১৯, ২২০, ২৪২
দাশ অমরেশ ২০১

দাশ চিত্তরঞ্জন ২১, ৭২
দাশগুপ্ত মানদাশঙ্কর ৯০
দাশগুপ্ত হেমেন্দ্রনাথ ৬৩, ২২০,
„ সতীশ ২৩৪
'দি ইণ্ডিয়ান স্টেজ' ১৮০
'দি লাইফ এ্যাণ্ড সেইংস অব রামকৃষ্ণ' ৬৫
দিলীপকুমার ২৪৫-৪৬
দে, নিরঞ্জন ২০১
দে, ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯৫, ১৯৬, ২৪৩
দেব, দ্বারকানাথ ২৫
দেব, রাধাকান্ত ২৪
'দেশ' ১৪৪, ১৯১-৯২, ২৪১, ২৪৫
'দুর্গেশনন্দিনী' (নাট্যরূপ) ২২৩
ধনী (বীণাবাদিকা) ১৩
'ধর্মবিপ্লব' ১৮২-৮৩
'ধাত্রীপান্না' ২৩১
'ধ্রুবচরিত্র' ১১৭, ২৬০
'নট-নটী' ২৩৯
'নটনাথ' ৮০
'নটরাজ' ৮০
'নটী বিনোদিনী' ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০৭
'নটীর পূজা' ৩৩
নট্ট কোম্পানী ১২৩, ১৯৫, ১৯৭, ২৩৯
নট্ট মাখনলাল ১২৩
'নন্দদুলাল' ১২৪
'নন্দ বিদায়' ১৬৭
নব অম্বিকা নট্ট কোম্পানী ১৯৭
নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৭, ৮, ৯,
'নববৃন্দাবন' নাটক ৭, ৯, ১০
'নরনারায়ণ' ১৫৪-৫৭
নরীসুন্দরী ২১
নরোত্তমানন্দ, স্বামী ২১৬
'নলদময়ন্তী' ১১৭, ২৬০
'নসীরাম' ১১৭, ১২৪, ১৫১, ১৫৬, ১৭৫
নাগ, দুর্গাচরণ ১২৮
'নাচঘর' ৮০, ২০৮-৯
নাট্যনিকেতন ২৩০
'নাট্যমন্দির' ৭৫, ৮০, ৮১, ১৭৬
নান্দীকার ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৭
নারায়ণ ফিল্ম কর্পোরেশন ২০১
নিউ আর্য অপেরা ১৯৬
„ গণেশ অপেরা ১৯৭
„ 'ডিস্‌পেন্‌সেসান পত্রিকা' ৭
„ প্রভাস অপেরা ১৯৭, ১৯৮
„ রয়েল বীণাপানি অপেরা ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮
'নিত্যানন্দ বিলাস' ৯৯, ১৩০-১৩১
নিধুবাবু ২৮
নিবেদিতা, সিস্টার ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১২৯, ১৭৮
নিভাননী ২৩৭, ২৬১
'নিমাই সন্ন্যাস' ৪৯, ৫০-৫১, ৫৪, ৬০, ৯৩, ১১৭, ২০৪,
নিয়োগী নবীন ১০, ২১
নিয়োগী ভুবনমোহন ২৪
নীরদাসুন্দরী ৮৮, ৯০
নীহারবালা ৩৩, ৭৩-৭৪,
'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' ৭৯
ন্যাশান্যাল থিয়েটার ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ১৮০

পটলডাঙ্গা নামকীর্তন সমিতি ৯৮
'পথের পাঁচালি' ২৩৫
'পরপারে' ১৬৪, ১৬৭, ১৬৯-৭০
'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' ২৪১
'পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ' ১৯৩
পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী ২৪৩
পরিব্রাজক, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ৭০
'পলাশীর যুদ্ধ' (নাট্যরূপ) ২৫
পাইন, দুর্গাদাস ৫
„ সীতানাথ ১
পার্কার কোম্পানী ২৫
'পাগল ঠাকুর' ১৯৫, ১৯৮, ২০১
পাঠক, অঘোরনাথ ২১৬
'পানিপথ' ১৮৭, ১৮৮
পানিহাটীর উৎসব ১০৮
'পাণ্ডব গৌরব' ৯০, ২৬০
'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ২৬০
পাল বিপিনচন্দ্র ২১, ২১০
পাঁড়ে মনোমোহন ২১৯
'পুণ্যস্মৃতি' ৯৩
'পূর্ণচন্দ্র' ১১৬-১৭
'পৃথ্বীরাজ' ১৮০
'পোষ্যপুত্র' (নাট্যরূপ) ২২০
প্যাণ্ডোরা থিয়েটার ২১৯
প্রদীপ অপেরা ১৯৭, ১৯৮
'প্রফুল্ল' ৪৭, ৯৪, ১১৭, ১৬৭
'প্রবাহের রূপান্তর' ২১২-১৩
'প্রবাসী' ৭১
প্রভানন্দ, স্বামী ৩, ৪, ৭
'প্রভাস যজ্ঞ' ৬৮, ১০৮
প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ৩৯, ১৫৬,২১৭,২১৮
'প্রহ্লাদ চরিত্র' ১৪, ৪০, ৪৯, ৫৪, ৯৩, ১৬৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ১৪০-৪১
'প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ২০১
প্রেমানন্দ, স্বামী (বাবুরাম) ১২
'প্লাবন' ২৩৩
'বঙ্গনারী' ১৬৪, ১৬৭, ১৭০-৭১
'বঙ্গনারী ও রঙ্গভূমি' ৭৫
'বঙ্গবাণী' ৭১
'বঙ্গেবর্গী' ২২৭
'বঙ্গে রাঠোর' ১৫৭
'বঙ্গের শেষ বীর বা প্রতাপাদিত্য' ১৮৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ ১৯৫
„ কানু ১৯৮, ২০০, ২৩৫-৩৬, ২৫৫, ২৫৭
„ কৃষ্ণ ২৫৫
„ গুণময় ২০০
„ গুরুদাস ১৯০, ১৯১, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২৩৬
„ দুর্গাদাস ২৪৪
„ পূর্ণেন্দু ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২৪৩-৪৪
„ বিনোদবিহারী ১১৯
„ রাম ২১৭
„ সন্তোষ ২১৭
„ সুরেন্দ্রনাথ ২২৪
বরাহনগর মঠ ৯৩
'বলিদান' ৪৭, ১৬৭
বসু, অমৃতলাল ২০, ২৩, ২৪, ৭৪, ৭৭-৭৮, ৮৮-৮৯, ১০০, ১০১, ১০৪-৫, ১৪৮-৫৩, ১৫৪, ১৬২, ১৭২, ১৭৯,

১৮০, ২২০
বসু কৈলাসচন্দ্র ১৪৮
বসু, গৌরী (শ্রীমতী) ৩৩
„ জীবেন ২২৯, ২৫৪
„ দীননাথ ৩৭
„ দেবেন্দ্রনাথ ৩৪
„ নন্দলাল ৩৩
„ নৃপেন্দ্রনাথ ১৩২, ১৩৩
„ বলরাম ১২, ১৬, ৩৭, ৩৯
„ বিজয় ২০১
„ মধু ২০০, ২২১
„ মনোজ ২৩৩
„ রাজকৃষ্ণ ২১৯
„ শঙ্করীপ্রসাদ ৯
'বসুমতী' পত্রিকা ৮০, ৯৮-৯৯
বসুরায়, জ্যোতির্ময় ২৪১, ২৪৭, ২৪৮
বড়াল, জলু ১৯০
বাগচি, অনিল ২০০, ২০১, ২৩৯
„ দেবেশ ২০১
বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার ২৩, ৩৬
'বালক গদাধর' ২০১
'বাল্যবিবাহ' ৯৫
বাসুদেবানন্দ, স্বামী ১৫৪
'বাংলা নাটকের ইতিহাস' ১১০
বিদ্যাবিনোদ ক্ষীরোদ প্রসাদ ৭৯, ১০৪, ১০৫, ১৫৩-৫৯, ১৭২, ১৮০, ২২৪, ২২৭
বিদ্যাভূষণ উপেন্দ্রনাথ ২০৯
বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র ৩৪, ৭৬, ১২১-২২
'বিদ্যাসাগর' পালা ১২৩, ২৩৯
'বিদ্যাসাগর' ছায়াচিত্র ২০০
'বিদ্যাসুন্দর' ২২
'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী' ১৯৭
'বিধির বিধান' ১৮৩-৮৪
বিনোদিনী ৩৮, ৩৯, ৫৪, ৬০, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৯০, ১৯৬, ২০৪-২০৮, ২০৯, ২১২, ২১৩, ২৪২, ২৬২
বিপুলমতী ৬৭
'বিবাহ বিভ্রাট' ১৪৮, ২০৪
বিবেকানন্দ, স্বামী ৮, ৯, ১২, ৬৩, ৬৫, ৬৯, ৯২-৯৩, ৯৪, ১২০, ১২৬,১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭,১৩৮ ১৩৯, ১৪০, ১৪১,১৪৩, ১৪৪,১৬৬, ১৮১, ১৮৮, ১৯৮, ২০৫, ২১৪-১৫, ২১৯, ২২০, ২৩৫,২৩৭, ২৩৯, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮
বিরজানন্দ, স্বামী ২৩২,
'বিল্বমঙ্গল' ৪৭, ৭১, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ১০৮-১৪, ১১৮, ১৬৭, ২৬০
'বিশ্ববাণী' ৭
বিশ্বরূপা থিয়েটার ২৪১
বিশ্বাস, ত্রৈলোক্য ৭
„ প্রসন্নকুমার ২১৭
বিশ্বাস, মথুরামোহন ৬, ৭
বীণা থিয়েটার ৮০, ২১৯
'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ২০১, ২৩৯
বুদ্ধদেব ৬০, ৬৫, ৬৬, ২৫৮
'বুদ্ধদেব চরিত' ১৬, ৪৭, ৬৮, ৭১, ৯৩, ১০৮, ২৬০
'বৃষকেতু' ৫১, ৫২, ৫৪, ২০৪, ২৬০
বেঙ্গল থিয়েটার ২৬
'বেঙ্গলী' পত্রিকা ২২৪

বেলুড় মঠ ৮১-৮২,৯১, ১৬২, ১৮৮, ১৮৯, ২০৮, ২১৩, ২১৬, ২২৭, ২৪২, ২৪৩, ২৪৮
ব্যানার্জী জি. সি. ৯
ব্রহ্মানন্দ স্বামী ৮, ৪৮, ১০১-১৫, ১২৬, ১২৯, ২২০-১১, ২১৫, ২১৬, ২২১-২২, ২২৫
'ভক্তমাল' ১০৮, ১০৯, ১১৮
'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ২০০, ২৩৫
'ভগিনী নিবেদিতা' ২০১
ভট্টাচার্য গুরুচরণ ১৫৩
" তারা ১৯৬
" দেবীপদ ১৬০
" ধনঞ্জয় ২৩৯-৪০
" পান্নালাল ২৪০
" বিধায়ক ১৯৩, ১৯৬, ২০০ ২৩৭, ২৪৪
" বেনীমাধব (কাব্যতীর্থ) ১৯৫, ১৯৬
" মনোরঞ্জন ১৯৯, ২০০, ২৩৩-৩৫
" শঙ্কর ৪৯
" শঙ্করনারায়ণ ১৯৯, ২৩৩-৩৫
ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ২৩৭, ২৫৫
ভঞ্জ, মনুজেন্দ্র ১৯২
ভাদুড়ী, শিশিরকুমার ১৬০, ১৯৯, ২০৯, ২১২, ২২০, ২২১, ২২৮, ২৩৭-৩৮ ২৫৫, ২৫৬,
ভারত কথাচিত্রম ২০০
'ভারতবর্ষ' ১৬৫
'ভারতী' ২৫, ২৬
ভারতী অপেরা ১৯৭
'ভীষ্ম' ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬
ভুবনানন্দ, স্বামী ২৩১, ২৩৩
ভুবনেশ্বর মঠ ২১১
'ভ্রান্তি' ১৩৫-৩৭, ১৩৯, ১৭১, ১৮২
মঙ্গেশকর, লতা ২৪৭-৪৮
'মজলিশ' ৭০
মজুমদার, বিজয়নাথ ১০০
" দেবেন্দ্রনাথ ৪০
" প্রতাপ ৬৪
" সুরেন্দ্রনাথ ২৫
" স্বপন ২২০
মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র ৫৩, ২২১
'মন' ১৭৮
মণিমালা ২১৩-১৪
'মনের মতন' ১২৫-২৬
মনোমোহন থিয়েটার ১৮৭
'মন্ত্রশক্তি' (নাট্যরূপ) ২২৯
মলিনা দেবী ১৯০, ১৯২-৯৩, ২৩৩
মল্লিক, অমর ১৯৯, ২৩৪
মল্লিক, যদু ১১, ১২
'মহাউদ্বোধন' ১৯৪
'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' ১৯১, ১৯৬, ২০০, ২৩৯, ২৪১
'মহাভারত' ২৬০
'মহীরাবণ' পালা ৩,
মহেন্দ্রনারায়ণ ১৫৫
মাণিক রাজার বাগান ৪
'মায়াবসান' ১৩৪
'মা সারদামণি' ১৯৭, ১৮৯
মিউনিসিপ্যাল আইন ২৯, ৩০
'মিডিয়া' ১৫৮

মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ১৮০
মিত্র, অমৃত ২৭, ২২০
„ আশুতোষ ৯০
„ গজেন্দ্রকুমার ২৩৮, ২৪৪
„ নবগোপাল ২৩
„ নরেশ ২৩৩
„ পুলিন ১০১, ২১৫-১৬
„ বিমল ১৯২
মিত্র, মনোমোহন ৭৮
„ যতীন্দ্রনাথ ১০০
„ রাজ্যেশ্বর ২৮, ২৯, ৪৯
„ সলিল ১৯৩
„ সুরেন্দ্রনাথ ১১৩
মিনার্ভা থিয়েটার ২৭, ৩০, ৭৩, ৮০, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৩, ১০০, ১২৯, ১৩০, ১৬০, ১৭৫, ১৮০, ২১০, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২২৩
'মিলন-কানন' ১৩১-৩২
মীনা অপেরা ১৯৭
'মীরকাশিম' ৪৭, ১০২
মুখোপাধ্যায়, অপরেশ ২০, ৪০, ৪৮, ৭৪-৭৫, ৮০, ৮৮, ৯০, ৯৪, ১০২-৩, ১০৪, ১৭৯, ১৬০, ১৭৫, ১৮০, ২১০, ২১৩, ২১৯-২২২, ২২৬, ২৩২
„ অমৃতলাল (বেলবাবু) ২২৩
„ অরুন্ধতী ২১০
„ ঈশানচন্দ্র ১২৭
„ উপেন্দ্রনাথ ৮০, ৮১
„ কালীশ ২২৭
„ জ্ঞানেশ ৭৬
„ তারকনাথ ১৮৮
মুখোপাধ্যায়, নীতীশ ১৯০, ২৪৪
„ নীলকণ্ঠ (যাত্রাওয়ালা) ১০, ১১, ৪৮
„ বিপ্রদাস ২১৯
„ মহেন্দ্র ৩৮
„ মৃণাল ২৫৫
„ লক্ষ্মীকান্ত ২১৩-১৪
„ হেমন্তকুমার ২৪৫, ২৪৮
„ শ্যামাপ্রসাদ ১৮০
মুশা ৬৫
মুস্তাফি অর্ধেন্দু ২০৮, ২২০, ২২৩
'মৃণালিনী' (নাট্যরূপ) ২৫
'ম্যাকবেথ' ৩০
ম্যাকলাউড, জোসেফাইন (মিস) ৭৩, ৯৫
ম্যাক্সমূলার, ফ্রেডরিখ ৬৪, ৬৫, ৩৩০, ২৫৭
ম্যাডিসন স্কোয়ার কনসার্ট হল ৯৪

'যুগদেবতা' ১৮৮-৯৩, ১৯৯, ১০০, ২০১
যোগানন্দ, স্বামী ২২২
যোগোদ্যান (কাঁকুড়গাছি) ৭২, ৯৮, ৯৯, ১০০
'য্যায়সা কা ত্যায়সা' ২২৩

'রক্তকমল' ২২৮
'রঙ্গদর্শন' ৭১
রঙ্গনা ২৩৯
'রঙ্গবাণী' ১৯৭
'রঙ্গমঞ্চ' ৪৩
'রঙ্গালয়' ৭২, ১৭৬
'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' ১৭৮
'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' ২২০

রঙ্গাচার্য, এস্ ২০০
'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র' ১৯৭, ১৯৮
'রত্নেশ্বরের মন্দির' ২২৭
রবিশঙ্কর ২১৮-১৯
রহমান, এ. এস্ ২৪৭
রক্ষিত হারাণচন্দ্র ১৮৪-৮৫
রাখাল—ব্রহ্মানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য
'রাখালকুঞ্জ' (ভুবনেশ্বর) ২১১, ২১২, ৩২২
রাজনারায়ণ ১২
'রাজা বাহাদুর' ১৪৮
রাজা মহারাজ—ব্রহ্মানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য
'রাণা প্রতাপ' ১৬০-৬১
'রাণীভবানী' ১৮৪
'রাণী রাসমণি' ১৯০, ২০০, ২৩৯
'রাবণ বধ' ২৬০
রামকৃষ্ণ ইন্‌স্‌টিটিউট্ ১৯৭
রামকৃষ্ণ মিশন ১৮০, ১৮১, ২২২
'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বা ঠাকুরের নামামৃত' ৯৯, ১৭৯
'রামকৃষ্ণ-সারদামণি' ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭
রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ১২, ৬৯, ১৪৩, ২১৫-১৬, ২২১
রামদয়ালবাবু ৬৯
রামপ্রসাদ ১১
রাম বসু ২৮
'রামানুজ' (শ্রীরামানুজ) ৮৮, ৯০, ৯১, ১০২-৩, ২২০, ২২১-২২
'রামায়ণ' ২৬০
'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ' ৯১
'রামের বনবাস' ২৬০
রাসেল, এডমণ্ড ৯৪
রায় অতুলানন্দ ১৮৭-৮৮
„ অমরেন্দ্রনাথ ২৬
„ কার্তিকেয় চন্দ্র ১৫৯, ২২৬
„ কিরণশঙ্কর ১৮৯
রায়, জগদিন্দ্রনাথ ২২১
„ দাশরথী ২৮
„ দিলীপকুমার ১৬০-৬৬, ১৬৮, ১৭২, ২২৬-২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১
„ দ্বিজেন্দ্রলাল ৩১, ১৫৯-৭২, ১৮০, ২২৬, ২২৭
„ প্রফুল্লচন্দ্র (আচার্য) ৭২
„ বিমল ২৪৫
„ ভারতচন্দ্র ২১
„ ভূমেন ২৪৪
„ মন্মথ ১৯৪, ২৩০
„ রবি ২৪৪
„ রাজকৃষ্ণ ১৮০
„ হেমেন্দ্রকুমার ২০৯, ২১৩, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৮, ২৩০-৩১, ২৫৮
রায়চৌধুরী দেবকুমার ১৬০, ১৬৪, ১৬৭, ১৭৮
„ নন্দগোপাল ১৯৫, ১৯৭
রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৪৪, ২১৯
রুদ্র, সুহৃদ ১৯৭
'রূপমঞ্চ' ২২৭
'রূপসনাতন' ১১৪, ১১৫, ১১৬
রোলাঁ, রোমাঁ ১
'লক্ষ্মণ বর্জন' ২৬০
লাটু মহারাজ—অদ্ভুতানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য।
লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র ২২৫

লাহিড়ী চিন্ময় ২০০
„ নিকুঞ্জ মোহন ২২৫, ২২৬
„ নির্মলেন্দু ১৬১-৬২, ১৬৩, ১৭২, ১৯০, ২২৫-৩৩
„ রামতনু ২২৫
লিলি কটেজ ৮
'লীলাপ্রসঙ্গ' ১৩৩, ২০৬
'লীলামৃত' ৯৫-৯৯
লোকনাট্য ১৯৭
'হরিরাজ' ১৭৯
'হরিশচন্দ্র পালা' ৩
হাজরা, নীরদ ২৩৮
'হামির' ২৫
হিন্দু ন্যাশান্যাল থিয়েটার ২৬
হেগেল, ফ্রেডরিখ ২৪৭
'হে মহামানব' ১৯১, ২০০
হ্যালক, গ্রে (শ্রীমতী) ২২-২৩
'শকুন্তলা' ৯৪
'শঙ্করাচার্য' ১০২, ১২৬-২৯, ১৬৪, ২২৫
শরৎ মহারাজ—সারদানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য
শান্তিগোপাল (পাল) ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮
শাস্ত্রী, শিবনাথ ৬৩
শিল্পীতীর্থ ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮
শিবানন্দ, স্বামী ১০৫, ১৫৬, ২১১,২১৪, ২৩১, ২৩৩
শেফালিকা (পুতুল) ২৪১, ২৪৪, ২৬১
শুভলক্ষ্মী (শ্রীমতী) ২৪৮
শ্যামপুকুর ১৬
'শ্যামলী' ২৪৩
শ্রীঅরবিন্দ ৭৩, ২২৯
শ্রীগদাধর পিকচার্স লিমিটেড ২০০
'শ্রীদুর্গা' ২২৭
'শ্রীবৎস-চিন্তা' ২৬০
শ্রী-মা অপেরা ১৯৭
শ্রী-মা নাট্যকোম্পানী ১৯৭
শ্রীরঙ্গম্ ২২৮
'শ্রীরামকৃষ্ণ' ১৮৮
শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম (বারাণসী) ১০৩
শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম (বোম্বাই) ২৪৫
'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ২০৪-৫
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (কলকাতা) ২০৮, ২১৭, ২১৮
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কাশী) ৭৩, ২৩৪
'শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা' ৭৮
শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা ৩
'শ্রীশ্রীমা' ২০১, ২৩৯
সত্যম্বর অপেরা ১৯৭
সত্যানন্দ, স্বামী ২৩৪
'সধবার একাদশী' ৩৬
সর্বাধিকারী মুনীন্দ্রনাথ ৭৯
'সমন্বয় মার্গ' ৯
'সমাজ' ১৮০-৮২
সমাজপতি, সুরেশ ২১
সরকার, নবীন ২০, ৩৫
সরকার, নলিনীকান্ত ৭৪
সরকার, শরচ্চন্দ্র ২১৯
সরকার, সরলাবালা ১৪৪
সরযূবালা দেবী ২২৮, ২২৯, ২৩১-৩২
'সরলা' ২২৩
'সৎনাম বা বৈষ্ণবী' ১৩৯-৪০

'সংসার' ১৮০
'সাজাহান' ১০২, ২২৪, ২৩১
'সাধক রামকৃষ্ণ' ১৮৮
'সাধনা' ১৮০
'সান্-ডে' পত্রিকা ২৪৭
সান্যাল, ত্রৈলোক্য ৮
„ পাহাড়ী ২০০, ২৪১
সান্যাল বাড়ী ২৪
সান্যাল রামতারণ ২১৫
„ সুধীরেন্দ্র ২২৭,
'সাবিত্রী' ২৩০
সারদাদেবী ৩, ৮৭-৯১,১৪১,১৪৩, ১৯৯, ২০৫, ২১৭, ২১৮
সারদানন্দ, স্বামী ১, ৩, ৫, ৬, ৮৭-৮৮, ১০০, ১০২, ১০৪-৫, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৭, ১৫৫, ২০৬, ২১৫, ২২১, ২২২, ২৩১
'সাহিত্য' পত্রিকা ২১
সাহু মোদক ২৪৬-২৪৭, ২৪৮
সাহু মোদক (শ্রীমতী) ২৪৬
সাঁই মনোহর ১২
সিটি থিয়েটার ৮০, ১০০
সিমলা নারী সমিতি ৭২
'সিরাজদ্দৌলা' ৪৭, ১০২,২২৭-২৮,২৩১
সিংহ, সন্তোষ ২২৫, ২৩২-৩৩
'সীতার বনবাস' ২৫, ২৬, ২৬০
'সীতা হরণ' ২৬০
'সুবাহুর পালা' ৩
সুবোধানন্দ, স্বামী ২১১-১৯
'সুলভ সমাচার' ৩২
সুর, ধর্মদাস ৮২
সুরধাম ১৬২
সুশীলা সুন্দরী ২১, ১৬৮
সেন, অধর ১২
সেন, অক্ষয়কুমার ২০৪, ২০৫
সেন, কুমুদবন্ধু ৬০, ৭১
সেন, কেশবচন্দ্র ৭, ৮, ৯, ১০, ১৫, ৩২, ৩৭, ৬৩, ৬৪
সেন, নবীনচন্দ্র ২৫, ২৭, ৩১
সেন, নির্মল ২৭
সেন, পঞ্চু ১৯৬
„ রজনীকান্ত ৭৩
„ হিরন্ময় ২০১
„ শোভা ২০০
„ সন্তোষ ২৩৫
„ সুচিত্রা ২৪২
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার ১৯৩, ২৪১
„ শচীন্দ্রনাথ ৮০, ২২৫, ২২৭-২৮
সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান ২০১
সেবাদাস ১৪৩
সোম, বিনোদবিহারী ৮৭-৮৮
'সৌরভ' পত্রিকা ১৭৬
স্ক্রাইন (মিঃ) ২৩
স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রীট) ৮, ৩৮, ৪০ ৫০, ৫১, ৫২, ৬৮, ৭১, ১১৫, ১৪৯, ২০৮
স্টার থিয়েটার (কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট) ২০, ২৭, ৯৮, ৯৯, ১৭৫,১৭৬,১৮০, ১৮৪, ১৯৩, ১৯৪, ২০৯, ২২০,২৩৯
স্পেন্সার, হার্বার্ট ১৬৪, ২৪৭
স্বপনকুমার ২০১
'স্বামীজী' ১৯৯, ২০০, ২৩৪, ২৩৯
'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' ৯৩
'স্বামী বিবেকানন্দ' ১৯৬, ১৯৮
'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' ১৪৩
'স্মৃতিচারণ' ১৬০